ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত
ও
তত্ত্বোপদেশ

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সোল এজেন্ট—
শ্রীযোগে[illegible] ধ্যায়
১১০ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জীবন্মুক্ত মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

মহাত্মা

তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত
ও
তত্ত্বোপদেশ

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক :—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১১০ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২৫ সাল।

 মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা
৬৬নং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট্, "বী প্রেসে"
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উৎসর্গ

যাঁহার অপরিসীম দয়া ও অসীম স্নেহের গুণে
হৃদয়ের আবিলতা দূর হইয়া ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত
হইয়াছে, যিনি অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করিয়া
হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র জ্ঞানালোক সঞ্চারিত
করিয়া দিয়াছেন, যিনি সংসার সমুদ্রের
অগাধ সলিল রাশির ভীষণ আবর্ত্তে
একমাত্র কর্ণধার হইয়া পথ নির্দ্দেশন
করিয়া দিতেছেন, যিনি কৃপা
করিয়া নিজ করুণাকল্পতরুর
সুশীতল চরণ ছায়ায়
এ অধমকে আশ্রয় দান
করিয়া চিরশ্রান্তি বিদূরিত
করিয়া দিয়াছেন, যিনি আমার
মেঘাচ্ছাদিত ঘোরান্ধকারময় হৃদয়
আকাশে ধ্রুবতারা রূপে সর্ব্বক্ষণ
বিরাজিত, যাঁহার পবিত্র করস্পর্শে
আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত; সেই
পরমারাধ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন শ্রীমৎ
গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে এই অমূল্যরত্ন
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইল।

দাসানুদাস উমাচরণ।

ভূমিকা

ভগবান্ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম, তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন ও অলৌকিক কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু অবগত আছেন। স্বামীজীর জীবন চরিত এই প্রথম প্রকাশিত না হইলেও তাঁহার ধারাবাহিক জীবনী এতাবৎ কেহই প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। কেহ কেহ যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ স্থল ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ, অথচ এরূপ একজন মহাপুরুষের পবিত্র জীবনী যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জনসাধারণের উপকারার্থ ইহা প্রকাশিত হইল। স্বামীজীর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলি আমি অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও বাকী সমস্তই আমি স্বয়ং বহু আয়াস ও অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করিয়া সুচারুরূপে যথাযথ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্বামীজী একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন, তাঁহার লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, ক্রোধ বা অভিমান ছিল না। লোক শিক্ষার জন্য ভারতে যে সকল মহাত্মা সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি কামিনী কাঞ্চনের প্রভাবের অতীত ছিলেন। তিনি শীতাতপে ক্লিষ্ট হইতেন না। ভাল মন্দ আহারে তাঁহার কোন দ্বিধা জ্ঞান

ছিল না ; ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল, তিনি সংযতবাক্ ছিলেন, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন এবং ঋষিগণের ন্যায় তিনিও বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। এ হেন মহাপুরুষের মধুময় জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলেও পুণ্য আছে এবং এতদ্বারা পবিত্র হইয়া লোকে কর্ম্ম জীবনের গন্তব্য পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। মনুষ্য মাত্রই ইচ্ছা করিলে যে জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে তাহা তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে বাসনা ত্যাগই মুক্তি লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ত্যাগই ধর্ম্ম, তিনিও ত্যাগী, তাই তিনি ধর্ম্মবীর। নির্ব্বাণ বা মুক্তি লাভই হিন্দু ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ, সেই নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব পিপাসু ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ইহা মহাগৌরবের বিষয় ও পরম প্রয়োজনীয়। তাঁহার মতে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই পরমার্থ লাভের সমান অধিকারী। তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ়তা এবং অনুরাগের সহিত যে কেহ "তাঁহার" শরণ লয় সেই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারে, ইহাতে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই, কেন না পরম পিতা পরমেশ্বর পাপী পুণ্যবান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার সৃষ্ট জীব সকলেই সমান, তবে অজ্ঞানান্ধকার বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তাই পাপ পুণ্যে প্রভেদ; কিন্তু তাহা বলিয়া পাপীর পরিত্রাণ নাই, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মহাপাপীরও যদি

স্বকৃত অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ জন্মে, মহাপাপী যদি একান্ত মনে "তাঁহার" শরণ লয়, তাহা হইলে সেও ভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভে কখনই বঞ্চিত হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। এই পুস্তকে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

স্বামীর জীবনী ও তত্ত্বোপদেশ প্রচার জন সাধারণের পক্ষে কল্যাণপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করি। এই গ্রন্থ আর্য্য ভাণ্ডারের অমূল্য ধন, ইহা ভারত উদ্যানের কল্পবৃক্ষ।

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী গত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা নিঃশেষ হওয়াতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণের ত্রুটীতে সহৃদয় পাঠকের করুণা কটাক্ষপাত যাচ্ঞা করি। বাঙ্গলা পাঠকবৃন্দের নিকট আমি চির ঋণী। সাহিত্যের উপন্যাস ও কবিতাবহুল যুগে সাধু সন্ন্যাসীর জীবনী ও উপদেশ যে আদৃত হইয়াছে ইহা শ্লাঘার বিষয়। ভগবান্ স্বামীজীর কৃপায় আমাদের মতি গতি আর্য্যধর্ম্মের অভিমুখী হইবে। তাঁহার অমূল্য জীবনী ও উপদেশের নূতন সংস্করণ দেশে ধর্ম্মসংস্থানে সাহায্য করিলে শ্রম সার্থক হইবে। ইতি ভাদ্র ১৩২৫।

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

মহাত্মা

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত।

মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগিনমীশ্বরম্ ।
মহাপাপহরং দেব মকারায় নমো নমঃ ॥

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন এক বিশিষ্ট ধর্ম্মভাব যখন ম্লান হইয়া আসিতে থাকে, জনসমাজে এক প্রকার বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া মানবমণ্ডলী যখন হীনতার সোপান অবলম্বন করতঃ নিম্নগামী হইতে থাকে, তখন আপামর সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে উন্নতির মঞ্চে উঠাইবার জন্য আবশ্যকমত মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবীরগণ আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের অথবা ইহার যথাযথ দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য আমাদিগের বিশেষরূপ কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইবে না। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতেই আমাদের এই কথাগুলি বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস, নানক, সাধু তুকারাম, মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ স্বামী, বামা ক্ষেপা, বিশে পাগলা প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের নাম ভারতবাসী হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। পরমপিতা পরমেশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য ইঁহারা আজন্ম কিরূপ স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাও অনেকের অবিদিত নাই। তাঁহাদের অমানুষিক কার্য্যকলাপ দর্শন করিলে তাঁহারা যে ভগবানের অংশস্বরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপন আপন জীবনতরী কিরূপে চালিত করিয়া পরিশেষে তাঁহারা ঐরূপ ঐশী শক্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কোন্ বিশিষ্ট গুণে তাঁহারা জনসাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন অথবা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পরিশেষে পরমপদ লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা সম্যক্ রূপে কেহই অবগত নহেন। ইহার কারণ এই মহাপুরুষগণ নিজ নিজ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কেহ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তবে কাহারও কাহারও শিষ্যাবলীর মধ্যে কেহ কেহ যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সমাজচরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুধর্ম্ম যেন হীন, হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-রবি যেন

অস্তাচলগামী। কিন্তু হিন্দুর আকাঙ্খা আছে, উৎসাহ আছে, অধ্যবসায় আছে। আধুনিক পরিমার্জ্জিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসন্তানগণ তাঁহাদের স্ব স্ব আকাঙ্খা ও উদ্যম উপলক্ষ করিয়াই যেন ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক। বাস্তবিক, তীব্র আকাঙ্খা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইলে হিন্দু মাত্রেই যে পরিশেষে পরমার্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর কেবল হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিগণই বা কেন, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই স্ব স্ব ধর্ম্মে আস্থাস্থাপনপূর্ব্বক, লক্ষ্য স্থির করিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইলেই সময়ে অভীষ্ট লাভে সফলকাম হইতে পারেন। ধর্ম্মগত কোন প্রকার বিভিন্নতা অসম্ভব, কেন না সকল ধর্ম্মেরই গন্তব্যস্থান এক। তবে ধর্ম্মভেদে প্রণালী ও কার্য্য কলাপ মাত্র বিভিন্ন। নতুবা পরমার্থ লাভ সকল ধর্ম্মেরই চরম ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

সম্প্রদায় বিশেষে হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন! কিন্তু তাঁহারা প্রতিমা পূজার প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। পরমব্রহ্ম মানব ইন্দ্রিয়ের, বাক্য ও মনের অতীত। তাঁহাকে কেবল তাঁহারই শক্তি দ্বারা ধারণা করা যায়। হিন্দুরা এক একটী শক্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিয়া সেই শক্তির পূজা করে, তাহারা প্রতিমার পূজা করে না। অদ্ভুত জ্ঞান ও কবিত্বপূর্ণ এই প্রতিমামাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুরূহ। এক একটী প্রতিমা এক একটী শক্তি ও সত্যের

নিদর্শন মাত্র। অগ্নি যেমন তাহার দাহিকা শক্তি হইতে অভিন্ন, পুষ্প যেমন তাহার সৌরভ হইতে অভিন্ন, চিনি যেমন তাহার মিষ্টতা শক্তি হইতে অভিন্ন, এই শক্তিও সেইরূপ ভগবৎশক্তি হইতে অভিন্ন। যে কোন বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তাহার অক্ষর চাই, গ্রন্থ চাই, শ্রেণী চাই, প্রণালী চাই, পরিশ্রম চাই, অধ্যবসায় চাই। কিন্তু যে বিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে বিদ্যার নিকট অপর সকল বিদ্যাই পরাভূত, যে বিদ্যা লাভ করিলে অপর কোন বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার জন্য কি কিছুরই আবশ্যক নাই? হিন্দুদের প্রতিমাগুলি সেই পরম বিদ্যার অক্ষর, ধর্ম্ম শাস্ত্র তাহার গ্রন্থ, বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহার শ্রেণী, পূজা বা সাধনা তাহার প্রণালী, সময়ব্যাপিনী ক্রিয়া তাহার পরিশ্রম,একাগ্রচিত্ততা তাহার অধ্যবসায়। স্থূল ধারণা মতে এইস্থানে হিন্দুধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের একটু পার্থক্য ও বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। অন্য ধর্ম্মের পন্থা বা প্রণালী বালক, যুবক, বৃদ্ধ, মূর্খ, জ্ঞানী প্রভৃতি অভেদে এক, কিন্তু ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা ও অনুর্ব্বরতা ভেদে যেমন বীজ বিশেষের প্রয়োজন হয়, হিন্দু ধর্ম্মেও সেইরূপ অধিকারিতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও ভিন্ন ভিন্ন সোপান নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহার যেরূপ ক্ষেত্র, যাহার যেরূপ শিক্ষা, যাহার যেরূপ বিশ্বাস ও যাহার যেরূপ মানসিক শক্তি সে সেইরূপ সোপান ও পন্থা অবলম্বন করিবে। হিন্দু ধর্ম্মের সোপানগুলি এরূপভাবে গঠিত যে ইহার সকল সোপানেই এমন

কি অতি নিম্নতম সোপান হইতেই মানুষ সামান্য মাত্র চেষ্টা করিলে কর্ম্মনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র হইতে পারে। এই সকল সোপানাবলী অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে এবং প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। আন্তরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠাসহ অধ্যাত্মমার্গ অবলম্বন করতঃ প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া বা প্রণালী অনুসারে সাধনা করিলে যে সহজেই ভগবৎ লাভ করা যায় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের এই পুস্তকের অধিনায়ক মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁহার হৃদয়সরোবরে যে এক প্রফুল্ল-কমল-কোরক প্রকাশিত হইয়াছিল ভগবৎভক্তি সহযোগে উহা প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তঃকরণে সাধুবৃত্তি সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইরূপ করুণাময় ভগবান্ নর নারীর হৃদয়ে যে প্রেমবীজ রোপণ করিয়াছেন উপযুক্তরূপ কর্ষণ হইলে উহা অবশ্যই অঙ্কুরিত হয়।

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব ও অমানুষিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও অনেকেই কিছু কিছু শুনিয়া থাকিবেন। ঐশী শক্তি সম্পন্ন এই মহাত্মা অত্যদ্ভুত স্বার্থত্যাগ, অমানুষিক অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সহকারে কিরূপে আপনার কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, একমাত্র ধ্রুবলক্ষ্য করিয়া পরিশেষে কিরূপে জরা মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এই পুস্তকখানিতে যথাসম্ভব তাহা বিবৃত হইয়াছে।

বিগত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্তর্গত বিজনা নামক জনপদস্থিত হোলিয়া নগরে নৃসিংহধর নামক এক জন সঙ্গতিশালী বিখ্যাত জমিদার বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দয়া, সৌজন্য ও পরোপকার নৃসিংহধরের অঙ্গের আভরণ ছিল এবং তিনি এক জন উদার-হৃদয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও পরম নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। তিনি দুইটি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জকে লইয়া নৃসিংহধর মহা আনন্দে কালাতিপাত করিতেন। অনন্তর ১৫২৯ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্গীয় ১০১৪ সালের পৌষ মাসে তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র লাভ করেন। তখন কে জানিত যে কালে এই শিশু ভারতের একটী সমুজ্জ্বল রত্ন হইবে। তখন কে জানিত যে এই শিশু ধর্ম্মজগতকে জ্ঞানা-লোকে সমুদ্ভাসিত করিয়া ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ তাঁহারই অংশ সম্ভূত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই শিশুই আমাদের “তৈলঙ্গ স্বামী”।

নবজাত পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া নৃসিংহধরের আনন্দের সীমা রহিল না। এই উপলক্ষে তিনি দীন দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করিলেন। অনন্তর যথোচিত কৌলিক ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ নৃসিংহধর পুত্রের নামকরণ করিলেন “তৈলঙ্গধর”। তৈলঙ্গধর বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও শান্তস্বভাব ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখর ছিল। তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন অনায়াসেই তাহা কণ্ঠস্থ

করিতে পারিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে কাতর হইত এবং সময়ে সময়ে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া একাকী কি যেন চিন্তা করিতেন। কিছুদিন পরে নৃসিংহধরের দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী এক পুত্র লাভ করেন। তাহার নাম রাখিলেন শ্রীধর।

তৈলঙ্গধর ক্রমশঃ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যৌবন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাকে সমধিক অন্যমনস্ক দেখা যাইত। তৈলঙ্গধরের এইরূপ অন্যমনস্কতা ও বিমর্ষভাব দেখিয়া নৃসিংহধর বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং পুত্রের প্রফুল্লতা আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তৈলঙ্গধর তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। নৃসিংহধর তাঁহাকে বার বার বিশেষরূপে অনুরোধ করাতে তিনি এক দিবস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবনেরই যখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই তখন অনর্থক ইহাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? যাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী তাহারই অনুসন্ধান প্রয়োজন, আমি তাহারই অনুসন্ধান করিব।" নৃসিংহধর বহু চেষ্টা করিয়াও পুত্রের মত পরিবর্ত্তনে কৃতকার্য্য না হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন কিন্তু তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণী বিদ্যাবতী (তৈলঙ্গধরের মাতা) বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও পরম ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তাঁহার সরলতায়, তাঁহার মৃদু মধুর ভাবে, তাঁহার স্নেহমাখা কথাবার্ত্তায় সংসারের

সকলেই মুগ্ধ ছিল। বিদ্যাবতীর সংসারে দাস দাসীর অভাব ছিল না; কিন্তু সংসারের অধিকাংশ কার্য্যই তিনি নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। দাসদাসীগণের প্রতি তিনি কখনও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাহাদিগকে তিনি নিজ পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহারাও বিনিময়ে তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত। সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাবতী যথারীতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। পতিভক্তি তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহার শারীরিক লাবণ্য ও মাধুর্য্য সন্দর্শনে তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার দৃষ্টি যেন স্বর্গীয় তেজের সঞ্চার করিত। বিদ্যাবতীর অন্তঃকরণে কি যেন এক সুধাময় সুধাকর অস্ফুট আবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন সেই পূর্ণেন্দুর দিব্য মৃদু কিরণরাশি ফুটিয়া বাহির হইত। বিদ্যাবতী প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কৃতাঞ্জলিপুটে তদ্গতচিত্তে যখন তিনি পূজা ও স্তব করিতেন তখন তাহার হৃদয়ের নির্ঝরিণী হইতে যেন ভক্তি উচ্ছ্বলিত হইয়া দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রুরূপে প্রকাশিত হইত। সে নয়ন জলে বিদ্যাবতীর গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত। পূজা কালে তাহার মুখপ্রভা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এই সরলতা মাখা জ্যোতির্ম্ময়ী মাধুরী প্রতিমা যখন ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন তখন তাহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত এবং সমুদয় গৃহ যেন আলোকিত হইয়া উঠিত। সে সময় তৈলঙ্গধর ব্যতীত আর

কেহ তাঁহার সন্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। এই পতিভক্তি-পরায়ণা রমণী-কুলোজ্জ্বলা সাধ্বী যে স্বর্গীয় কোন দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিদ্যাবতী রূপে ধরাতলে প্রকাশিত হইয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিদ্যাবতী বহু পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের মানসিক ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে তৈলঙ্গধর ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে চলিয়াছে। সে বৃথা সাংসারিক মায়ামোহে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নহে। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিতা হওয়া দূরে থাকুক বিদ্যাবতী বরং সমধিক আনন্দিতা ছিলেন। সুতরাং তৈলঙ্গধর বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিতা বা দুঃখিতা হইলেন না। কিন্তু স্বামীকে তজ্জন্য বিমর্ষ দেখিয়া এক দিবস তিনি তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "তৈলঙ্গধর বিবাহ করিবে না বলিয়া তোমার এত দুঃখিত ও হতাশ হইবার কারণ কি? প্রকৃত পক্ষে বিবাহের উদ্দেশ্য কি? যদি বংশ রক্ষাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয় তবে শ্রীধরের বিবাহ দিলেই ত সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বিবাহ করিতে যখন তৈলঙ্গধরের একান্ত অনিচ্ছা তখন জোর করিয়া বিবাহ দিলে কি তাহার মানসিক প্রফুল্লতা আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে?—কখনই না। বরং তাহাতে আরও বিষময় ফল উৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ সে যে পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ভবিষ্যতে বংশের, কেবল বংশের কেন সমগ্র ভারতের

একটী সমুজ্জ্বল রত্ন হইয়া উঠিবে। জনক জননীর ইহা কি কম গৌরবের কথা? সুতরাং তাহার সে কার্য্যে বাধা দেওয়া বা বিন্দুমাত্র বিঘ্ন উৎপাদন করা আমাদের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে সে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া পরিশেষে সফলকাম হইতে পারে তাহারই যথোচিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" গুণবতী স্ত্রী এইরূপে স্বামীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তৈলঙ্গধরের বিবাহ বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। নৃসিংহধর ও সহধর্ম্মিণীর এতাদৃশ প্রবোধ বাক্যে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া এইরূপ গুণবান পুত্রের পিতা বলিয়া নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করিলেন। অনন্তর কিছু দিন পরে নৃসিংহধর তাঁহার দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে শ্রীধরের বিবাহ দিলেন। শ্রীধরের বিবাহে বিদ্যাবতী ও তৈলঙ্গধর উভয়েই পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈলঙ্গধরের হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা বলবতী হইতে লাগিল। তিনি যেন অন্তরে অন্তরে কোন অমূল্য রত্নের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। তখন আহার বিহার শয়ন অধ্যয়ন প্রভৃতি কিছুতেই যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতেন না। যখন বিদ্যাবতী দেখিলেন যে তৈলঙ্গধরের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৈলঙ্গধরও যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। বিদ্যাবতীর উপদেশ বাক্য সমূহ যেন তাঁহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। মাতার উপদেশ বাক্য শ্রবণকালে

তৈলঙ্গধর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। এতদিনে যেন তাঁহার হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা ভেদ করিয়া বিদ্যুন্মালা চমকিয়া উঠিল। মাতার উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই যেন তাহার হৃদয়ে নূতন আলোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনোবৃত্তি সমূহ ও সঙ্গে সঙ্গে যেন স্বর্গীয় উচ্চ মঞ্চে উন্নীত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভগবৎ- প্রেম হিল্লোলে তৈলঙ্গধরের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ভগবৎ প্রেমামৃত পানে তাঁহার ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল।

তৈলঙ্গধরের এই সুখের দিনে হঠাৎ দুঃখের ছায়াপাত হইল। তাঁহার ভগবৎ প্রেমলিপ্সু হৃদয়াকাশে হঠাৎ একটী ঝঞ্ঝা উঠিল। নৃসিংহধর হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। যথোপযুক্ত চিকিৎসা চলিতে লাগিল কিন্তু পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাকুক বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যত্ন বা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইল না কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। পীড়ার পঞ্চম দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৃসিংহধর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির মায়াপাশ ছিন্ন করতঃ এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। তৈলঙ্গধরের বয়ঃক্রম তখন ৪০ বৎসর। নৃসিংহধরের মৃত্যুতে হোলিয়া নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকে মুহ্যমান হইল। আপামর সাধারণ সকলের মুখেই গভীর শোক চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। পতিভক্তিপরায়ণা বিদ্যাবতী স্বামীর মৃত্যুর পর

হইতে এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। এই সময় হইতে তিনি কেবল এক ভগবৎচিন্তা ব্যতীত সংসারের অপর কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন না।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে তৈলঙ্গধরও মাতার সহিত একাগ্র চিত্তে ভগবৎচিন্তায় রত হইলেন। এইরূপে আরও দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ভক্তিমতী দেবীপ্রতিমা বিদ্যাবতীও ভবধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত ধামে গমন করিলেন। মাতার মৃত্যুতে তৈলঙ্গধর যেন জগৎ শূন্যময় দেখিলেন, পৃথিবী যেন তাঁহার চক্ষে ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হইল। সংসার যেন তখন তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ মন জগতের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধাকাশে উড্ডীয়মান হইল। মাতার যে স্থানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেই স্থান তখন তৈলঙ্গধরের পরম পবিত্র ও অতি মনোরম স্থান বলিয়া বোধ হইল। সেই দিন হইতেই সংসার সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ চিতার ভস্মরাশি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক নৃসিংহধরের বিপুল ধন সম্পত্তির অধীশ্বর তৈলঙ্গধর শ্মশানে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধর বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা শ্রীধর শোকসন্তপ্তহৃদয়ে হতাশ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনরায় সকলে মিলিত ভাবে তৈলঙ্গধরের

নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভগবৎপ্রেমরূপ প্রফুল্ল কমলের মধুপান করিবার জন্য যাঁহার মন মধুকর উন্মত্ত, ভগবৎ ধ্যানরূপ সুধাসিন্ধুতে যিনি নিমজ্জিত, ভগবৎ নামরূপ কল্পতরু হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তাহার প্রেমামৃতময় ফলাস্বাদনে যিনি মোহিত, বহির্জগৎ পরিত্যাগ করতঃ যিনি অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে অগ্রসর, যিনি ভগবৎভাণ্ডারের অমূল্য রত্নের অধিকারী হইতে চলিয়াছেন, পৃথিবীর সামান্য ধন রত্নে কি তাহার তৃপ্তিসুখ সম্ভব? নশ্বর পার্থিব পদার্থ সমূহে কি তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়? সংসারের প্রলোভন তাহাকে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। তিনি প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন দিগকে যথাবিহিতসম্মানপূর্ব্বক উপস্থিত বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া সসম্ভ্রমে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধরকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই আর কেন এখানে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাও গৃহে গমন করিয়া যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাহা তুমিই ভোগ দখল কর, আমার ঐ সকল বিষয়ে বা ধন সম্পত্তিতে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি আর গৃহে ফিরিব না, এ পাপ সংসারে আর থাকিব না। মায়াময় সংসার আমার নিকট কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে, এই ক্ষণ ভঙ্গুর দেহ লইয়া সংসারে আর অনিত্য সুখে বৃথা মজিব না। যাহা নিত্য ও অবিনশ্বর এবং যে সুখের

আদি অন্ত নাই, যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার আশা থাকে না, অশান্তি যাঁহার নিকটস্থ হইতে অক্ষম, আমি তাঁহারই শরণ লইয়াছি। আমাকে আর বাটী ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিও না।”

অগত্যা শ্রীধর বহু চেষ্টাতেও তৈলঙ্গধরের মত পরিবর্ত্তনে কৃতকার্য্য না হইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে বাটী ফিরিতে বাধ্য হইলেন এবং তথায় তৈলঙ্গধরের বাস করিবার উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি তৈলঙ্গধর সেই স্থানে মাতার উপদিষ্ট যোগ সাধন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইলে পর কোন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হয়। সেই সময় পশ্চিম প্রদেশে পাতিয়ালা রাজ্যে বাস্তুর গ্রামে ভগীরথ স্বামী নামক এক অতি সুপ্রসিদ্ধ যোগী অবস্থিতি করিতেন। ১০৮৬ সালে হঠাৎ একদিন উক্ত ভগীরথ স্বামী তৈলঙ্গধরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় উভয়ে নানা প্রকার বাক্যালাপে পরম প্রীত হইয়া একত্র কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তাহার পর উক্ত ভগীরথ স্বামী তৈলঙ্গধরকে সঙ্গে লইয়া পুষ্কর তীর্থে গমন করতঃ তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানেই ভগীরথ স্বামীর নিকট ১০৯২ সালে তৈলঙ্গধর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গণপতি স্বামী নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর ১১০২ সালে ভগীরথ স্বামী ঐ পুষ্কর তীর্থেই দেহ ত্যাগ করেন। মহাত্মা ভগীরথস্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) তীর্থ ভ্রমণ মানসে তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

কিছু দিন নানা স্থান ভ্রমণ করতঃ ১১০৪ সালে গণপতি স্বামী (ত্রৈলঙ্গধর) সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে * * * পূজা ও মহাসমারোহে একটি মেলা হয়। তদুপলক্ষে নানা দেশ হইতে তথায় বহুলোক ও অনেক সাধুপুরুষের সমাগম হইয়া থাকে। তীর্থ ভ্রমণ মানসে তিনি সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। মেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে ত্রৈলঙ্গধরের স্বদেশবাসী কয়েকজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্বদেশবাসী ব্যক্তিগণ বহু দিন পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অবশেষে ক্ষান্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মেলার দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া ঐ মেলার মধ্যস্থলে পতিত হন। কিছুক্ষণ মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। তদ্দর্শনে ঐ মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরা বড়ই শোকাকুল হইলেন এবং মেলায় বড়ই গোলমাল উপস্থিত হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে একটু গোলমাল কমিলে ঐ মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরা তাহার সৎকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় গণপতি স্বামী (ত্রৈলঙ্গধর) তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা এই ব্যক্তির সৎকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন কেন?" এই কথা বলিয়া নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া ঐ মৃত ব্যক্তির মুখে ও মস্তকে ৪।৫ বার ছিটা দিলেন। ক্রমে ঐ মৃত ব্যক্তির

সংজ্ঞা হইল দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীগণকে একটু দুগ্ধ পান করাইতে অনুমতি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১১০৬ সালে গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণে স্থদামা পুরীতে গমন করেন। তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। (এই ব্রাহ্মণ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে স্বামীজীর অলৌকিক কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন) স্বামীজী এখানে আসিলে তিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে তাহার সেবা 'করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবাদিতে সন্তুষ্ট হইয়া গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) তাহার কি অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন ও পুত্র লাভের কামনা করেন, তিনিও ঐ ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পুরণের বর দান করিলেন। বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ঐ ব্রাহ্মণ বেশ সঙ্গতিপন্ন হইলেন এবং এক পুত্র লাভ করিলেন। এই কথা প্রচার হওয়ায় তথাকার লোকেরা প্রত্যহ গণপতি স্বামীর (তৈলঙ্গধরের) সমীপস্থ হইয়া নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। দিন দিন লোক সমাগম বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার পারমার্থিক কার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন।

১১০৮ সালে গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) স্থদামা পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং তথায়

নিভৃত স্থানে যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ও অমানুষিক কার্য্য কলাপ শীঘ্রই জন সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। একদা নেপালের মহারাজা সসৈন্যে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া বনমধ্যে গমন করতঃ সকলে নিজ নিজ শীকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ অন্বেষণের পর মহারাজের প্রধান সেনাপতি একটী ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ঐ গুলি ব্যাঘ্রের গায়ে লাগিল না। ব্যাঘ্র প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। সৈনিক পুরুষ ও তদ্দর্শনে তাহার অনুসরণে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। এইরূপে ব্যাঘ্রের পশ্চাদনুসরণ করাতে তিনি নিজ অনুচরবর্গকে পশ্চাতে রাখিয়া একাকী বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ঐ ব্যাঘ্র যথায় স্বামীজী (তৈলঙ্গধর) ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্বামীজীর পদতলে বিড়ালের ন্যায় শয়ন করিল। ব্যাঘ্রের বিকট আর্ত্তনাদে স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করায় ব্যাঘ্রের উপর দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র সমস্ত ব্যাপার সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন এবং ব্যাঘ্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। ব্যাঘ্রের পশ্চাদনুসরণকারী ঐ সৈনিক পুরুষও ইত্যবসরে স্বামীজীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অদ্ভুত ও অমানুষিক ব্যাপার দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া

কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সৈনিক পুরুষের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে করুণাময় স্বামীজী তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিলেন। তিনি অতি ভীতবিহ্বলচিত্তে ধীরপদ বিক্ষেপে স্বামীজীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন স্বামীজী মৃদু হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন "বাবা! এত আশ্চর্য্য বা ভীত হইবার কারণ কি? তুমি নিজে যদি হিংসা প্রবৃত্তি ত্যাগ কর তবে কোন হিংস্র প্রাণীই তোমার প্রতি হিংসা করিবে না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দেখ—ব্যাঘ্র কেমন শান্ত ভাবে আমার কাছে শুইয়া আছে। এতক্ষণ তুমি এই ব্যাঘ্রের প্রাণ বধ করিতে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলে, কিন্তু এখন তোমার এই অবস্থাতে ব্যাঘ্র অনায়াসে তোমারই প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। নিজেও এখন সেই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছ। কাহাকেও কাহারও হত্যা করিবার ক্ষমতা নাই, যদি তাহা থাকিত তবে অনেক পূর্ব্বেই তুমি এই ব্যাঘ্রের প্রাণ বধ করিতে পারিতে। এই বিশ্বসংসারে সকল প্রাণীই সমান, কেহ কাহারও হিংসা করা উচিত নহে। এক্ষণে তোমার আর কোন ভয় নাই তুমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার অনুচরবর্গের নিকট গমন কর এবং আজ হইতে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিও।" স্বামীজীর এবম্প্রকার আশ্বাস বাক্যে সৈনিক পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি যাহা জীবনে কখন দেখেন নাই, বা শুনেন নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। তাঁহার আর বাঙ-নিষ্পত্তি হইল না। স্বামীজীর আদেশ মত

তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাঘ্রও নিজ ইচ্ছামত গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মনে মনে এই ঘটনা চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে সমস্ত বিষয় রাজার নিকট জ্ঞাপন করিলেন। রাজা ও উপস্থিত পারিষদবর্গ এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। নেপালরাজ বড় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন তিনি স্বামীজীর এতাদৃশ অমানুষিক ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বড়ই উৎসুক হইলেন এবং সেই সৈনিক পুরুষকে ও প্রধান পারিষদাদি সমভিব্যাহারে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন ও নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিয়া স্বামীজীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজী নয়ন উন্মীলন করতঃ রাজা ও সৈনিক পুরুষকে দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন কিন্তু রাজপ্রদত্ত ঐ সকল উপঢৌকন দ্রব্য স্পর্শও করিলেন না। বিশ্বপতির রত্নভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাশি উপভোগ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর পার্থিব দ্রব্যের কোন আকর্ষণ থাকিতে পারে না। স্বামীজী রাজাকে যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক নানা প্রকার সদুপদেশ দানে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন।

স্বামীজীর এবম্প্রকার আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকলাপ ক্রমে ক্রমে

রাজ্য মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাঁহার নিকট ক্রমশঃ লোক সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহাতে তাঁহার পারমার্থিক কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ১১১৪ সালে নেপাল রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিব্বতে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিন অবস্থান করিবার পর ১১১৭ সালে মানসসরোবরে গমন করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল যোগসাধন করেন।

মানসসরোবরে অবস্থিতি কালে একদা এক বিধবা স্ত্রীলোক একটী সপ্তম বর্ষীয় মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সৎকারার্থ শ্মশানের দিকে গমন করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটী শোকে আত্মহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন কারণ ঐ মৃত বালকই তাহার অন্ধের যষ্টি স্বরূপ একমাত্র পুত্র ছিল কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় পূর্ব্বরাত্রে সর্পাঘাতে বালক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এ জগতে ঐ স্ত্রীলোকটীর আর কেহ ছিল না। ঐ বালকের অতি শৈশব অবস্থাতে তিনি বিধবা হন, ঐ বালকই পৃথিবীতে তাঁহার একমাত্র আশা ভরসা ছিল। তাঁহাব এই বিপদে গ্রামবাসী সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া যখন সকলে বালকের সৎকারের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ স্বামীজী (তৈলঙ্গধর) কোথা হইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রাণে অকস্মাৎ যেন আশায় সঞ্চার হইল। তিনি

যেন ক্ষণিকের জন্য শোক তাপ ভুলিয়া গিয়া নির্নিমেষ নয়নে ঐ দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। কে যেন তাঁহার প্রাণের ভিতর বলিয়া দিল যে এই মহাত্মাই তোমার পুত্রের জীবন দান করিবেন। তিনি তখন যেন এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তুই চক্ষু দিয়া অবিরত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। এমন নিদারুণ পুত্র শোক তিনি ক্ষণেকের জন্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটী তাঁহার সেই মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীজীর পদতলে রাখিয়া দিয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তাহার এতাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া করুণাময় স্বামীজী তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নিজে ঐ বালকের গাত্র স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শ মাত্রেই মৃত বালক সংজ্ঞা লাভ করিল। ইহা দর্শনে ঐ স্ত্রীলোকটী একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং স্বামীজীর পদতলে পড়িয়া দরবিগলিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার পদতল সিক্ত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। স্বামীজী সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বিধবাকে পুনর্জ্জীবিত পুত্র লইয়া গৃহে ফিরিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন। তদবধি মানসসরোবরে আর কেহই তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই।

অনন্তর ১১৩৩ সালে স্বামীজী নর্ম্মদা নদী তীরে মার্কণ্ডেয়

ঋষির আশ্রমে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তথায় তাঁহার অনেক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হওয়াতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহাত্মারাও সকলে স্বামীজীকে পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। এই আশ্রমে খাকীবাবা নামক এক মহাপুরুষ অনেক দিন হইতে অবস্থিতি করিতেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রি নর্মদা নদী তীরে গমন করিয়া যোগাভ্যাস করিতেন। একদিন তিনি নদী তীরে যাইয়া দেখিতে পান যে নদী দুগ্ধরূপ ধারণ করিয়া প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে আর গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) অঞ্জলি করিয়া সেই দুগ্ধ প্রফুল্ল অন্তঃকরণে পান করিতেছেন। তদ্দর্শনে খাকীবাবা একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন এবং ঐ দুগ্ধ আস্বাদন করিবার মানসে যেমন স্পর্শ করিলেন তৎক্ষণাৎ নদী দুগ্ধরূপ ত্যাগ করিয়া নিজ পূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দর্শন করিয়া খাকীবাবা নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল ভাবে কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে আশ্রমে গমন করিয়া আশ্রমবাসী অন্যান্য মহাত্মগণকে যাহা দেখিয়াছিলেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। এই অমানুষিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া আশ্রমবাসী সকলেই স্বামীজীর উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি করিতে লাগিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১১৪০ সালে প্রয়াগধামে গমন করিয়া নির্জ্জনে যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। একদা

স্বামীজী প্রয়াগ ঘাটে বসিয়া আছেন এমন সময় অদূরে একখানি নৌকা আরোহী সহ অপর পার হইতে প্রয়াগ ঘাটে আসিতেছিল। নৌকাখানি প্রায় গঙ্গার মধ্যস্থলে আসিয়াছে এমন সময় অকস্মাৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে ঝড় উঠিল সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। স্বামীজী তখনও গঙ্গাতীরে এক ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। ঘাটের অন্যান্য লোক প্রাণ ভয়ে একে একে সকলেই চলিয়া যাইতে লাগিল, তন্মধ্যে রামতারণ ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীকে চিনিতেন; তিনি যাইবার সময় তাঁহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং স্বামীজীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহার অনর্থক এরূপভাবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাঁহার সহিত উঠিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহাতে স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন "বাবা আমার জন্য তুমি এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? আমি বিশেষ কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিতেছি না। বিশেষতঃ আমি এখন এখান হইতে যাইতে পারিব না, কারণ ঐ যে অদূরে একখানি নৌকা আসিতেছে দেখিতেছ উহা এখনই জলমগ্ন হইবে উহার আরোহিগণকে বাঁচাইতে হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই কথা বলিতে বলিতেই উক্ত নৌকাখানি জলমগ্ন হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্বামীজীও অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ ইহাতে হতবুদ্ধি হইয়া নিস্পন্দভাবে তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া

শেষ ফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাহ্মণ দেখিলেন সেই জলমগ্ন নৌকাখানি পুনরায় ভাসিয়া উঠিল ও ক্রমশঃ তীরে আসিয়া লাগিল। তন্মধ্য হইতে আরোহিগণ সহ স্বয়ং স্বামীজীকেও অবতরণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তাঁহার আর বাঙ্‌নিস্পত্তি হইল না। আরোহিগণও একজন অপরিচিত উলঙ্গ ব্যক্তিকে তাঁহাদের সহিত দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন এবং তিনি কখন্ কোথা হইতে কি ভাবে তাঁহাদের নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন সকলে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীজীর পদতলে পতিত হইয়া চরণ ধূলি গ্রহণ করতঃ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া করযোড়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন মনস্থ করিতেছেন এমন সময় স্বামীজী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং বলিতে লাগিলেন "বাবা এই ঘটনা দেখিয়া তুমি বড় আশ্চর্য্য হইয়াছ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই এরূপ ক্ষমতা সকল মানবেরই আছে। তবে মানুষ মাত্রেই অনিত্য সংসার সুখে মজিয়া থাকে নিজ উন্নতির দিকে একবারও লক্ষ্য করে না। ভগবান্ এই মনুষ্য দেহ সৃষ্টি করিয়া নিজে তাহার ভিতর বিরাজ করিতেছেন। প্রত্যেক মানুষেই ঐশী শক্তি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে অনিত্য সংসারের জন্য মনুষ্য মাত্রেই যেরূপ পরিশ্রম করিয়া

থাকে তাহার শতাংশের একাংশও ভগবানের জন্য খাটিলে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, তখন এ বিশ্ব জগতে কিছুই তাহার পক্ষে অসাধ্য থাকে না। ইহাতে কিছু মাত্র আশ্চর্য্য হইবার নাই। তুমি জলে আর কেন কষ্ট পাও এখন গৃহে গমন কর।" এই কথা বলিয়াই স্বামীজী তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর ১১৪৪ সালের মাঘ মাসে গণপতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) প্রয়াগধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৺কাশীধামে গমন করিলেন এবং তথায় অশী ঘাটে তুলসী দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উক্ত বাগানে অবস্থিতিকালে তিনি মধ্যে মধ্যে লোলার্ক কুণ্ডে গমন করিতেন। একদিন উক্ত লোলার্ক কুণ্ডে আজমীর নিবাসী ব্রহ্মসিংহ নামক এক বধির ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিদ্রিতাবস্থাতে দেখিতে পান এবং তাহার গাত্র স্পর্শ করেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও সম্মুখে স্বামীজীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকে। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি উহাকে একটি বিল্বপত্র প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন যে এই লোলার্ক কুণ্ডে স্নান করিয়া এই বিল্বপত্রটী ধারণ করিলে তুমি এই কঠিন পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিবে। স্বামীজীর আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার কিছুদিন পরেই তাহার বধিরত্ব দূর হইল এবং সেই ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কমনীয় আকার ধারণ করিল। সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মসিংহ তাঁহার অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতে থাকিল।

ইহার পর স্বামীজী তুলসী দাসের বাগান ত্যাগ করিয়া বেদব্যাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। সীতানাথ বন্দোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া বহুদিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই রোগের উপশম না হওয়াতে তিনি অবশেষে জীবনে হতাশ হইয়া পড়েন। একদিন ঐ ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নান করিবার নিমিত্ত যেমন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন অমনি তাঁহার কাশ আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ একেই পথশ্রমে বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ করিতেছিলেন তাহার উপর হঠাৎ এরূপ সময়ে পীড়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি গঙ্গাতীরে শয়ন করিয়া সেই কঠিন ব্যাধির ভীষণ যন্ত্রণায় অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ব্রাহ্মণ প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাতীরস্থ প্রায় সকল লোকেই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল এবং অনেকেই তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের যথোচিত শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মণের চৈতন্য আনয়ন করিতে সমর্থ না হওয়াতে ব্রাহ্মণের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। যখন সকলেই ব্রাহ্মণের জীবনে হতাশ হইয়া বিলাপ করিতেছে এমন সময় স্বামীজী গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সেই করুণ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। স্বামীজী

তৎক্ষণাৎ অপরাপর সকলকে একটু সরিতে বলিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন। ব্রাহ্মণও পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং সম্মুখে সেই দেবমুর্ত্তি দর্শন মাত্র ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট নিজ ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক রোগের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। করুণাময় স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তত্রস্থ একটু গঙ্গা মৃত্তিকা প্রদান পূর্ব্বক গঙ্গা স্নান করতঃ উহা খাইতে আদেশ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। ব্রাহ্মণও স্নান করতঃ ভক্তিভাবে স্বামীজীর আদেশ পালন করিলেন। বলা বাহুল্য অল্পদিন মধ্যেই ব্রাহ্মণ সেই দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় দিব্যকান্তি লাভ করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্মণ স্বামীজীকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন ও যথাসাধ্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণ ধুলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পদসেবা করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন।

কিছুদিন পরে স্বামীজী বেদব্যাসের আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হনুমান ঘাটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তত্রত্য কোন এক মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে যাইত। সে একদিন স্বামীজীকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পায়

ও তাহাতে অতিশয় লজ্জিতা হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে থাকে। স্বামীজী তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। স্ত্রীলোকটি ৺বিশ্বেশ্বরের পূজা সমাপন পূর্ব্বক বাটী প্রত্যাগতা হইয়া সেই রাত্রিই স্বপ্ন দেখিল যেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহাকে বলিতেছেন "তুই তোর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির জন্য আমায় পূজা করিতে আসিয়াছিলি আমার দ্বারা তাহা হইবে না ঐ যে উলঙ্গ স্বামীজীকে তুই আজ তিরস্কার করিয়াছিস্ তাঁহার দ্বারাই তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া তাহার অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। সে মনে মনে বলিতে লাগিল যে চিনিতে না পারিয়া উলঙ্গ থাকার জন্য স্বামীজীকে অনর্থক ভর্ৎসনা করিয়া কি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরক্ষণেই ভাবিল স্বামীজী যখন আমার কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই তখন নিশ্চয়ই আমার প্রতি দয়া করিবেন এবং আমার কার্য্য সিদ্ধিও হইবে। এই প্রকার নানা চিন্তাতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে হনুমান ঘাটে স্বামীজীর সন্নিধানে যাইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিল যে তাহার স্বামীর উদরে প্রকাণ্ড এক ক্ষত হইয়াছে ঐ ক্ষত আরোগ্য হইবার মানসে সে প্রত্যহই বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে যাইত। এই প্রকারে স্বীয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করাতে স্বামীজী উহাকে একটু ভস্ম প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে "এই ভস্মটুকু তোমার স্বামীর উদরের ক্ষতস্থানে লেপন করিলেই

তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ করিবে।” স্ত্রীলোকটী ভক্তিভরে স্বামীজীকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার প্রদত্ত সেই ভস্মটুকু লইয়া গৃহে গমন করিল এবং উহা ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দেওয়ায় তাহার পতি অচিরে আরোগ্য লাভ করিল।

অনন্তর স্বামীজী হনুমান ঘাট হইতে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময় রামাপুরা নিবাসী সিউপ্রসাদ মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের এক পুত্র পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন হইতে শয্যাগত ছিল। নানাপ্রকার চেষ্টা ও চিকিৎসা করিয়াও কোন প্রকারে আরোগ্য না হওয়াতে একদিন তিনি তাহাকে লইয়া স্বামীজীর নিকট উপনীত হইলেন ও তাঁহার পদতলে পুত্রকে রাখিয়া করজোড়ে স্বামীজীর নিকট পুত্রের কঠোর ব্যাধির বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কাতর ভাবে তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। করুণাময় স্বামীজী সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া ঐ বালকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক একবার মাত্র তাহাকে স্পর্শ করিলেন এবং বালককে লইয়া তাহার পিতাকে বাটী যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্তি সহকারে স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আনন্দ-মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে বালক অল্পদিন মধ্যেই সেই কঠোর দুরারোগ্য পক্ষাঘাত ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিল। স্বামীজীর এই প্রকার অসাধারণ শক্তির কথা ক্রমে ক্রমে লোক পরম্পরায় চারিদিকে প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার নিকট দিন দিন লোক সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সকলেই নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূরণের জন্য আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার পারমার্থিক কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি ক্রমশঃ কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি সকলের সহিত কথা কহিতেন না, কোন কোন লোকের সহিত বিশেষ আবশ্যক হইলে দুই একটী কথা কহিতেন যে যাহা দিত তিনি তাহা খাইতেন, কোন প্রকার জাতি বা পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না। একদা কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে এককালীন অর্দ্ধমণ খাদ্য খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার পরক্ষণেই আবার যে যাহা দিতে লাগিল তিনি অবাধে তাহা খাইতে লাগিলেন। কাশীবাসী ও বিদেশীয় যাত্রীগণ যেমন ভক্তি সহকারে অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও মণিকর্ণিকাদি দর্শন করিতেন এই মহাত্মাকেও সকলে সেইরূপ ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। এই সময় হইতে কাশীবাসী আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে "গণপতি স্বামী" না বলিয়া তৈলঙ্গ দেশের লোক জানিয়া এবং তাঁহার গুরুদত্ত প্রকৃত নাম না জানাতে "তৈলঙ্গ স্বামী" বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার প্রথম নাম তৈলঙ্গধর এবং তাঁহার গুরুদত্ত নাম "গণপতি স্বামী" কেহ অবগত ছিল না।

যে যাহা দিত তিনি তাহাই খাইতেন বলিয়া কোন সময়ে এক দুষ্ট লোক তাঁহাকে খানিকটা চূণ গুলিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিল। তিনি অবাধে তাহা খাইয়া তাহার সাক্ষাতেই প্রস্রাব

করিয়া পৃথক ভাবে জল ও চূর্ণ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। কোন সময় এক ধনবান্ ব্যক্তি দুই গাছি বিশ ভরি ওজনের স্বর্ণের বালা প্রস্তুত করাইয়া স্বামীজীর হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তথাকার কতকগুলি দুষ্ট লোক তাহা আত্মসাৎ করিবার মানসে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়াইয়া দেয়। তাহাতে অজ্ঞান অথবা ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বালা দুইগাছি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে প্রদান করেন। কাশীধামে অনেক ধনবান্ উদার স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ লোকের শুভাগমন হইয়া থাকে, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে তৈলঙ্গ স্বামীকে স্বেচ্ছামত বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া যাইতেন কিন্তু অর্থলোলুপ দুরাচার লোকে তৎসমুদয় অনায়াসে খুলিয়া লইত স্বামীজী তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিতেন না।

তৈলঙ্গ স্বামী উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া একদা কোন পুলিসের কর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যায় তাহাতে সাহেব তাঁহাকে উলঙ্গ থাকিতে নিষেধ করিয়া কাপড় পরিতে আদেশ করেন, কিন্তু স্বামীজী তাহাতে কর্ণপাত করেন না। তাহাতে সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে স্বামীজীকে হাতকড়ী লাগাইয়া হাজতে রাখিতে অনুমতি করিলেন। সাহেবের হুকুম পালনার্থ তৎক্ষণাৎ পুলিস কর্ম্মচারী হাতকড়ী আনিয়া স্বামীজীকে ধরিতে গেল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহাকে আর কেহই সে স্থানে দেখিতে পাইল না। চারিদিকে অনুসন্ধান পড়িয়া

গেল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। উপস্থিত সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা এই ভাবে কাটিয়া গেল কেহই তাঁহার কোন সন্ধান করিতে পারিল না, এমন সময় অকস্মাৎ স্বামীজী স্বয়ং একেবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কোথা হইতে ও কেমন করিয়া আসিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখিয়া উপস্থিত সকলে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। স্বামীজীর অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া সাহেবেরও চৈতন্য হইল এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পুলিসে একজন উগ্র প্রকৃতির সাহেব আসিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন স্বামীজীকে উলঙ্গ দেখিয়া মহারাগান্বিত হন এবং তাঁহাকে ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া ধৃত করাইয়া হাজতে চাবি বন্ধ করাইয়া রাখেন। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলেন স্বামীজী প্রস্রাব করিয়া হাজত ঘরের মেজে ভাসাইয়া দিয়াছেন এবং সহাস্য বদনে চাবি বন্ধ হাজতঘরের বাহিরে বেড়াইতেছেন। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কি প্রকারে তুমি বাহিরে আসিলে এবং হাজত ঘরের মেজেতে এত জলই বা কোথা হইতে আসিল?" তাহাতে স্বামীজী উত্তর দেন "রাত্রে অতিশয় প্রস্রাবের বেগ হইয়াছিল ঘরে চাবি বন্ধ থাকাতে আমাকে বাধ্য হইয়া ঘরের মধ্যেই প্রস্রাব করিতে হইয়াছে। তাহার পর প্রাতঃকালে

যখন বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হইল দেখিলাম দরজা খোলাই আছে কোন প্রকার বাধা না পাইয়া আমি বাহিরে আসিয়াছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন চাবি বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহা হইলে মৃত্যুকালে হাজত দিলেই ত আর কেহ মরিত না। আপনার সে ক্ষমতা নাই তথাপি এত রাগ কেন ?" এই আশ্চর্য্য ঘটনা সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহাকে যথেচ্ছা বেড়াইতে অনুমতি দিলেন এবং হুকুম দিলেন যেন কেহ কখনও তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট না করে।

একদা খালিসপুর নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ বাচস্পতি মহাশয় আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামীজীকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। আহারান্তে তাঁহার পানীয় জল আবশ্যক হওয়ায় জল আনিবার জন্য বাচস্পতি মহাশয় গৃহান্তরে গমন করেন। তাহার আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। তিনি জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে স্বামীজী জল পান করিতেছেন, কোথা হইতে ও কেমন করিয়া জল পাইলেন এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং জল আনিতে বিলম্ব হওয়াতে অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

১১৯৫ সালে কোন এক হিন্দু স্বাধীন রাজা সপরিবারে ৺কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাহার গঙ্গার প্রতি অতিশয় ভক্তি থাকায় সস্ত্রীক পদব্রজে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে

ইচ্ছা করেন। রাণী কাহারও সম্মুখে বাহির হইবে না বলিয়া এবং তাহার বাসস্থান গঙ্গার নিকটবর্ত্তী থাকায় অন্তঃপুর হইতে স্নানের ঘাট পর্য্যন্ত বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করাইলেন। উক্ত বস্ত্রাবাস এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইল যে জলে জলচর স্থলে স্থলচর প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রবেশ করা ত দূরের কথা কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালনের ক্ষমতাও রহিল না। তাহার উপর বস্ত্রাবাসের দুই পার্শ্বে শান্তি-রক্ষক থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। যথা সময়ে একদিন রাজাও রাণী উভয়ে স্নান করিতে বাহির হইলে, দাসীবৃন্দ সঙ্গে চলিল। স্নান করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও লোক দৃষ্টিগোচর হয় নাই কিন্তু তাহারা যেমন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন অমনি দেখিলেন সম্মুখে এক দীর্ঘকায় উলঙ্গ পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে রাজার চক্ষু রক্তিমবর্ণ হইল, অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। রাণীও সম্মুখে এক উলঙ্গ পুরুষ দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইয়া দাসীগণের সহিত অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

মহারাজ তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন ভাবিয়া শান্তিরক্ষকগণকে ডাকাইলেন। আজ্ঞা মাত্র সকলেই তথায় উপস্থিত হইল বটে কিন্তু মহারাজ তাঁহার দিব্য উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কোন প্রকার দণ্ডেরই বিধান করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাওয়াতে তিনি তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা মাত্র শান্তিরক্ষকেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে

লইয়া গেল। তথায় মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কারণে ও কি প্রকারে তুমি এখানে আসিয়াছ ?" তাহার ও কোন উত্তর পাইলেন না। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া অনেকেই কৌতূহল বশতঃ তাঁহার পরিণাম দেখিতে আসিল, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ঐ অপরাধী উলঙ্গ ব্যক্তিকে চিনিত ও ভক্তি করিত তাহারা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার দণ্ড না হয় সেই প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজ সমীপে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। তাহাদের নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় ক্রমে ঐ উলঙ্গ মহাপুরুষটির পরিচয় মহারাজের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ তৈলঙ্গ স্বামীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন তৎক্ষণাৎ ২।৩ জন রাজ অনুচর স্বামীজীকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

এদিকে মহারাজ সমস্ত দিন সুখে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক জটাজুট-ধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, ত্রিশূলধারী, ভীষণ মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ পুরুষ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "ওরে দুরাচার, পামর ! তুই তৈলঙ্গ স্বামীর প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াও দিবাভাগে তাঁহার অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়া আমার হৃদয়ে যে ব্যথা দিয়াছিস তাহার সমুচিত দণ্ড

তোকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। ওরে মূর্খ! তুই কিছুতেই এ পবিত্র স্থানের যোগ্য নহিস্। শীঘ্র স্থানান্তরে প্রস্থান কর, নতুবা আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই।” মহারাজ এই ভীষণ স্বপ্ন দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে করিতে হতজ্ঞান হইলেন। তাহার ভয়ানক চিৎকারধ্বনিতে পারিষদ্গণ তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া দেখিল মহারাজ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শুইয়া আছেন এবং তাহার চক্ষু দুটী কপোলে উত্থিত হইয়া ঘুরিতেছে। আকস্মিক এই ব্যাপার দর্শনে কেহ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজের গৃহে অতিশয় গোলমাল করিতে লাগিল। দাসীগণ আসিয়া এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইল। বহুক্ষণের পর মহারাজ চৈতন্য লাভ করিলেন। পারিষদ্গণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে রাত্রে তিনি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বিশ্বস্ত চর দ্বারা স্বামীজীর সন্ধান লইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্ব-দিনের স্বীয় অপরাধ জন্য পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই নির্ব্বিকার সদানন্দ পুরুষ রাজার উপর কোন প্রকার রোষ প্রকাশ না করিয়া ক্ষমা করতঃ সান্ত্বনা পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

অনন্তর ১২০৭ সালে তৈলঙ্গ স্বামী দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে পঞ্চগঙ্গার ঘাটের উপর বিন্দুমাধবের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি আর কাহারও সহিত

কথা কহিতেন না এবং কোথাও যাইতেন না। তখন হইতে সকলেই তাঁহাকে মৌনী বলিয়া জানিতেন এবং তিনিও ইঙ্গিতে সকল কার্য্য করিতেন। বিশেষ আবশ্যক হইলে গোপনে দুই একজন ধর্ম্মপিপাসু লোকের সহিত ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেন অথবা কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি তাহা কথা কহিয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। তিনি সকলেরই মনের সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন, কখনও কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই যিনি তাঁহাকে চিনিতেন তিনিই তাঁহার নিজ বাসনা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। যে বাটীতে তিনি অবস্থিতি করিতেন সেই বাটীতে মঙ্গলদাস ঠাকুর, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর ও তাহাদের মাতা অম্বা দেবী (ইহারা মহারাষ্ট্র দেশের লোক) বাস করিতেন। মঙ্গলদাস ঠাকুর তাঁহার সেবক এবং অম্বা দেবী তাঁহার সেবিকা ছিলেন। অম্বা দেবী তাঁহার খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তিনি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ও তাঁহার মাতা অম্বা দেবীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি একটী গাভী রাখিয়াছিলেন। মঙ্গলদাস ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ গাভীর সেবা করিত।

মঙ্গলদাস ঠাকুরের সহিত স্বামীজীর ইঙ্গিতে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইত। মঙ্গলদাস ঠাকুরও সদা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকাতে স্বামীজীর ইঙ্গিতের কথাবার্ত্তা বেশ বুঝিতে পারিতেন। তিনি যে বেদীতে শয়ন করিতেন তাহার নিকট দেওয়ালে দেবনাগরী অক্ষরে অনেক শ্লোক লেখা ছিল, যখন কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা অথবা মীমাংসা করিতে আসিতেন তখন

স্বামীজী মঙ্গলদাস ঠাকুরকে নিকটে ডাকিয়া সেই সরু শ্লোকের মধ্যে এক একটী অক্ষরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে লিখিতে সঙ্কেত করিতেন, লেখা শেষ হইলে মঙ্গলদাস ঠাকুর সেই আগন্তুক ব্যক্তিকে তাহা শুনাইয়া দিতেন। কখন কখন দুই একজন ব্রহ্মচারী বিশেষ বিশেষ কঠিন বিষয় মীমাংসা করিতে আসিতেন। স্বামীজীর ২৫।৩০ খানি হাতে লেখা পুঁথি ছিল তাহা হইতে আবশ্যক মত পুঁথিখানি আনাইয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি কখনও কথা কহিবার বিশেষ আবশ্যক হইত তবে রাত্রিকালে তাহা কথা কহিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার আহারের কোন নিয়ম ছিল না, এক সের হইতে এক মণ পর্য্যন্ত খাইতে পারিতেন। কখনও কিছুই খাইতেন না, কখনও অন্ন আহার করিতেন, কখনও দুগ্ধ, আবার কখনও যিনি যাহা মুখে দিতেন তাহাই খাইতেন।

১২১৭ সালে একবার উজ্জয়িনীর মহারাজ ৺কাশীধামে আগমন করেন। তিনি একদিবস কাশীর রাজবাটী রামনগর হইতে নৌকাযোগে পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে মণিকর্ণিকায় আসিতেছিলেন। কিছুদূর আসিবার পর তিনি তৈলঙ্গ স্বামীকে জলের উপর ভাসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, নৌকাস্থিত স্বামীজীর এক ভক্ত বলেন "উঁনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী পুরুষ। জলে স্থলে উঁহার সমান অধিকার। এইরূপ যোগপরায়ণ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বর্ত্তমান সময়ে আর কেহই নাই।", মহারাজ এই

কথা শুনিয়া কৌতূহল পরবশ হইয়া বলিলেন "যিনি নিজের শরীর মধ্যস্থ শত্রুগণকে দমন করিয়া নিজ বশে আনিয়াছেন বাহিরের সামান্য শত্রুগণ তাঁহার কি করিতে পারে। উঁহাকে নৌকায় উঠাইবার বাসনা করি, দয়া করিয়া আসিবেন কি?" এই কথাতে ঐ স্বামিভক্ত লোকটী নৌকা স্বামীজীর নিকটস্থ করিতে আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নৌকা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র, মহারাজের মনোভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই স্বামীজী নিজেই নৌকায় উঠিলেন। মহারাজ তাহাতে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই যে তিনি তাঁহার মনোভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন তজ্জন্য মনে মনে যথেষ্ট বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহারাজের হস্তে বহুমূল্য একখানি তরবারি ছিল। কোন সময়ে কোন অসমসাহসিক কার্য্যে ইনি বীরত্ব প্রকাশ করায় কোম্পানী বাহাদুর তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঐ তরবারিখানি পারিতোষিক দিয়াছিলেন। স্বামীজী নৌকায় উঠিয়া উক্ত তরবারিখানি একবার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহারাজ বিনা আপত্তিতে তরবারিখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন ও মনে মনে যথেষ্ট সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তরবারিখানি হস্তে লইয়া উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া উহা গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া মহারাজ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া গম্ভীর স্বরে সেই স্বামীর ভক্তকে বলিতে লাগিলেন "এ আবার কি প্রকার সাধু? যিনি

পরের দ্রব্য দেখিতে লইয়া তাহার গুণাগুণ না জানিয়া অনায়াসে তাহা নষ্ট করিতে পারেন, ধন্য তাঁহার সাধুতা, জানি না কোন গুণে আপনি ইঁহাকে একজন প্রসিদ্ধ সাধু ও মহাপুরুষ বলিয়া কিছুপূর্ব্বে প্রশংসা করিতেছিলেন। ইনি একজন কপট ভণ্ডতপস্বী মাত্র। যোগ বলে জলে ভাসিতে পারেন বলিয়াই কি ইনি বিখ্যাত?" মহারাজের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্বামি-ভক্ত লোকটী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে মহারাজকে বলিতে লাগিলেন "আপনি রাগ করিবেন না, আমি এই ক্ষণেই ডুবুরি দ্বারায় আপনার তরবারি উঠাইয়া দিতেছি।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে নৌকা খানি মণিকর্ণিকা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং স্বামীজী নৌকা হইতে নামিতে চাহিলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে নামিতে দিলেন না। তরবারির ক্ষোভ মিটাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ রূপে শাস্তি দিবেন মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। মহারাজ রাগে, ক্ষোভে অধীর হইতেছেন ও মনের কষ্টে দগ্ধ হইতেছেন জানিতে পারিয়া স্বামীজী গঙ্গাজল মধ্যে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ একই রকমের দুই খানি তরবারি উঠাইলেন এবং মহারাজের হস্তে সেই দুই খানি তরবারিই প্রদান করিয়া যে খানি তাহার নিজের সেই খানি তাহাকে লইতে বলিলেন। তরবারি দুই খানির সৌসাদৃশ্য দর্শনে মহারাজ তাহার নিজের তরবারি কোন মতেই চিনিয়া লইতে পারিলেন না, তাহাতে স্বামীজী বলিলেন "তোমার নিজের জিনিস যখন তুমি চিনিয়া

লইতে পারিলে না, তবে তোমার জিনিস বলিতেছ কেন? তোমার জিনিস হইলে তুমি নিশ্চয়ই চিনিয়া লইতে পারিতে। যাহা তোমার নিজের নহে তাহার জন্য এত রোষ প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার মত অহঙ্কারী ও মুর্খ এ জগতে আর কেহই নাই।" এই কথা বলিয়া এক খানি তরবারি তাহার হস্তে দিয়া অপর খানি জলে নিক্ষেপ করিলেন।

স্বামীজীর এই সকল কথা শুনিয়া ও এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ় হইয়া রহিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন এই সামান্য তরবারির জন্য ইঁহাকে একজন মহাপুরুষ জানিয়াও কতই তিরস্কার করিয়াছি। ইঁহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিবার জন্য মনে মনে কত প্রকার কল্পনা করিতেছিলাম। আমি কি নরাধম, সামান্য পদার্থের মমতায় মোহিত হইয়া কি ঘৃণিত কার্য্যই করিয়াছি। এই প্রকার চিন্তায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। যদিও তিনি তাহার আদরের বহুমূল্য তরবারিখানি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তখন সেই তরবারি তাহার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় তেমন প্রীতিকর বোধ হইল না। এই অসামান্য মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা সন্দর্শনে মোহিত হইলেন, তাহার হৃদয়ে তখন যেন এক অভিনব আনন্দের উদয় হইল ও মন ভক্তিরসে গলিয়া গেল। তখন তিনি মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন যে আমার এই অপরাধের জন্য কেবল মাত্র ইঁহার পদে ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, জানিনা তাহাতেও

আমার স্বকৃত পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি না? মহারাজ মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া স্বামীজীর পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। স্বামীজী মহারাজের অনুনয় বিনয় ও কাতরতা দেখিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন। এই অদ্ভুত কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে মহারাজ ও আর আর সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন "ইনি কি মানুষ না দেবতা? এই সকল অসম্ভব কার্য্য মানুষে কখনই সম্ভবে না।" স্বামিভক্ত পুরুষটী তখন যে কি আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন সকলেই একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং মহারাজও যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মোহিত হইয়া সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

১২৭৬ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ৺কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আসিয়া হিন্দু দেব দেবীর উপাসনার অসারত্বপ্রমাণ ও নিন্দাবাদ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে নিজ ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা করেন। এক ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা তাঁহার কোন আকার নাই তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সীমা বিশিষ্ট দেব দেবীতে তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। এইরূপ নানা প্রকার উপদেশ

ও নিজের যুক্তি দেখাইয়া জন সাধারণকে এমনই মোহিত করিয়াছিলেন যে অনেকেই নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তৈলঙ্গ স্বামীর দুইজন শিষ্য দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যবহারের কথা স্বামীজীকে নিবেদন করিলেন। স্বামীজী সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া মঙ্গলদাস ঠাকুরের দ্বারায় তাহা দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন; দয়ানন্দ সরস্বতী তাহা পাঠ করিয়া ৺কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। তৈলঙ্গ স্বামী সেই কাগজে যে কি লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বয়ং ও দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই।

১২৮১ সালে পৃথ্বীগিরির শিষ্য বিশুদ্ধানন্দ স্বামী রাজঘাটে আসিয়া অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ তাহাকে ৺কাশীধাম দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে কাশীধামে দেখিবার জিনিস কিছুই নাই, তবে একমাত্র তৈলঙ্গ স্বামী আছেন তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ইহার কয়েক দিবস পরে একদিন প্রাতঃকালে তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট কয়েক জন ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন ও আরও কয়েক জন অপর লোক দাঁড়াইয়া ও বসিয়া ছিলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র স্বামীজী তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়েই সেই ভাবে যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন তাহা কেহই

জানিতে পারিলেন না। এই ঘটনায় সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্বামীজীকে পুনরায় সেই স্থানে দেখা গেল কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। পরে জানিতে পারা যায় যে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই রাজঘাটে গমন করিয়াছিলেন। কারণ তখন অনেকে আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে রাজঘাটে দেখিতে গিয়াছিলেন।

একদা কাশীস্থ সোণারপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালক সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাওয়ায় পাঁজরের একখানি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। পুত্রের চিকিৎসার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে ভেলুপুর হাঁসপাতালে রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন চিকিৎসার পর বালকটী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল বটে, কিন্তু তাহার পাঁজরের বেদনা কোন মতে গেল না এবং সে বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। তাহাতে সেখানকার ডাক্তারগণ পরামর্শ দেন যে এই বালককে একবার কলিকাতায় লইয়া গিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণকে দেখান উচিত। এই কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালকটীকে লইয়া কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে ডাক্তারগণ বালকটীকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে হইলে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন কিন্তু তাহাতে বালকের প্রাণের আশঙ্কা আছে। এই কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভীত হইলেন এবং বালকের জীবনে হতাশ হইয়া তাহাকে লইয়া

ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি সকল কথা পত্নীকে বলায় উভয়েই বালকটীর জন্য ভাবিয়া ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এইরূপে আরও কিছুদিন গত হইলে এক দিন উভয়ে পরামর্শ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সস্ত্রীক বালকটীকে লইয়া মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট গমন করিলেন এবং পুত্রকে লইয়া তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। যতক্ষণ না স্বামীজী তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন ততক্ষণ একাগ্রমনে কেবল তাঁহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে করিতে এক মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন স্বামীজী বালকের মাতাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন "তোমাদের প্রত্যহ এখানে আসিবার কারণ কি?" তাহাতে বালকের মাতা অতি কাতর ভাবে তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতঃ তাঁহার পদতলে পতিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীজী বালকটিকে দেখিয়া সেই স্থানের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া বালকের বেদনার স্থানে লাগাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। আরও বলিয়া দিলেন "এক্ষণে তোমরা বালককে লইয়া বাটী যাও কিছুক্ষণ পরে ইহার অতিশয় জ্বর আসিবে তাহা দেখিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অতি অল্প সময় মধ্যেই জ্বর বিরাম হইবে তখন বালক ক্ষুধায় অস্থির হইবে এবং সেই সময় তোমার গৃহে যাহা থাকিবে তাহাই বালককে খাইতে দিবে। ইহাতেই তোমার বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।" অনন্তর

তাহারা উভয়ে বাটি আসিয়া স্বামীজীর আদেশ মত কার্য্য করিলেন এবং বালকও অচিরাৎ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

এক সময় খালিসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বাচস্পতি মহাশয় জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে জীবনে হতাশ হইয়া ও শেষ দশা উপস্থিত ভাবিয়া তৈলঙ্গ স্বামীর স্মরণ লইতে মনস্থ করিয়া স্বামীজীর আশ্রমে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে থাকেন। কিছু দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে তিনি আসিবামাত্র স্বামীজী তাহার যাতায়াতের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সকাতরে তাঁহার নিকট নিজের অবস্থা নিবেদন করিলেন। স্বামীজী সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাহাকে কিছু সিদ্ধি বাটিতে দিলেন বাটা হইলে স্বামীজী তাহা হইতে মটর পরিমাণ একটি বটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি প্রাণের মমতায় সহর্ষে উহা খাইলেন। তাহার পর স্বামীজী তাঁহাকে প্রত্যহ আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় প্রায় এক মাস নিয়মপূর্ব্বক গমনাগমন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আদেশ মত সিদ্ধি বাটিয়া এক মটর পরিমাণ একটি করিয়া বটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে লাগিলেন। একদিন স্বামীজী অধিক পরিমাণে বমন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং

বাচস্পতি মহাশয় আসিবা মাত্র উহা পরিষ্কার করিতে ইঙ্গিত করিলেন তিনি বিরক্ত না হইয়া অবিলম্বে উহা দুই হস্তে পরিষ্কার করিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। তাহার পর স্বামীজী তাঁহাকে পুর্ব্বের ন্যায় সিদ্ধি বাটিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং বাটা হইলে তাহা হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মত একটি বটিকা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে বাচস্পতি মহাশয় আসিয়া দেখিলেন যে এক স্থানে রাশীকৃত বিষ্ঠা জড় করা রহিয়াছে। স্বামীজী পূর্ব্বদিনের ন্যায় তাহাকে উহা পরিষ্কার করিতে সঙ্কেত করিলেন। তিনি কিছুমাত্র ঘৃণা না করিয়া উহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করতঃ স্নান করিয়া আসিলে স্বামীজী তাঁহাকে সিদ্ধি বাটিতে আদেশ করিলেন এবং বাটা হইলে তাহা হইতে পূর্ব্ব পরিমিত একটি বটিকা খাইতে দিয়া বলিলেন যে "তোমাকে আর এখানে আসিতে হইবে না। তুমি শীঘ্রই পীড়া হইতে মুক্ত হইবে জীবনে হতাশ হইও না।" অল্প দিন মধ্যেই বাচস্পতি মহাশয় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। সুস্থ ও সবল হইলে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাইতেন ও তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তথায় বসিয়া বিমল পবিত্র সুখ অনুভব করিতেন।

১২৯১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল জল বায়ু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ৺কাশীধামে আগমন করেন। তিনি হিন্দু হইয়াও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা করা তাহার নিতান্ত ঘৃণিত

কার্য্য বলিয়া ধারণা ছিল। ৺কাশীধামে আসিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকাদি দর্শন করেন কিন্তু কোন স্থানে পূজা দেন নাই বা কোন দেবতাকে প্রণামও করেন নাই। ৺কাশীধামে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর সমীপে অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে একদিন দর্শন করিতে গমন করেন। স্বামীজীর সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কত লোক তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা বসিয়া রহিয়াছে। দর্শকগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কেহ বসিতেছে, কেহ দাঁড়াইতেছে কেহ বা অল্প সময় মধ্যেই চলিয়া যাইতেছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এই সকল ঘটনা এবং তৈলঙ্গ স্বামীর লাবণ্যময় মূর্ত্তিখানি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতেছেন এমন সময় সহসা কে যেন তাহার গলদেশে ধাক্কা দিয়া কর্ণের নিকট বলিল "ওরে নরাধম দুরাচার! তুই দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া নিজ ধর্ম্ম একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছিস্। ইঁহাকে প্রণাম কর।" সেই ধাক্কার বেগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর চরণ তলে পতিত হইলেন। এই সকল কথা শুনিয়া ও ধাক্কা খাইয়া তাহার মোহ নিদ্রাভঙ্গ হইল, হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া গেল। পাশবিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া তাহার হৃদয়ে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি তামাসা দেখিতে আসিয়া মহারত্ন লাভ করিলেন। স্বামীজীর চরণ

স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়ের মলিনত্ব দূর হইল। তাহার মন সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত হইল। স্বামীজীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তথা হইতে বাসায় আসিলে তাহার মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে তিনি সেই দিন হইতেই ধর্ম্ম পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন ও হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তদবধি তিনি স্বামীজীর সেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু দিবার ইচ্ছা করেন। মঙ্গলদাস ঠাকুর তাহা স্বামীজীর নিকট প্রকাশ করায় তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া অস্বীকার করেন। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পর হইতে তিনি আশ্রমের খরচ চালাইবার জন্য মঙ্গলদাস ঠাকুরকে মাসিক দশ টাকা করিয়া দিতে থাকেন।

তৈলঙ্গ স্বামী কখন দুঃসহ শীতে জলে অবস্থিতি করিতেন আবার কখনও প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন কোন লোক বাহিরে যাইতে সাহসী হয় না তখন তিনি অনায়াসে উত্তপ্ত বালুকার উপর আরামে শয়ন করিয়া থাকিতেন ও কখন স্নান করিতে যাইয়া তিন চারি ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিতেন। আবার কখনও নিস্তব্ধ ভাবে জলে ভাসিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করিতেন। জল স্থল, শীত গ্রীষ্ম তাঁহার সকলই সমান জ্ঞান ছিল। বার মাস তিনি একখানি কম্বল পাতিয়া শয়ন করিতেন ও অপর একখানি কম্বল গায়ে দিতেন।

যাহারা স্বচক্ষে স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য কলাপ দর্শন

করিয়াছেন তাহারা তাহাদের জীবন সার্থক ও ধন্য বলিয়া মনে করেন এবং জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পরিণামে যে এই প্রকার সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়া যায় ইহা বেশ বুঝিতে পারেন। আর যাহারা দর্শন করিতে পারেন নাই তাহারা মনে মনে অতিশয় আক্ষেপ করিবেন যে এমন মহাপুরুষের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না। যাহার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে তিনিই দেখিয়াছেন। যিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন অথবা তাঁহার ক্ষমতার বিষয় অবগত নহেন তাহারই ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই।

এক্ষণে তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে তাঁহার একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে সকল যাত্রীই তাহা দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন। মঙ্গলদাস ঠাকুর এখনও সেই বাটীতে সেবায়েৎ আছেন।

অনন্তর বিস্তর কষ্ট সহ্য ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকার পর আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহার কিছু প্রকাশ করিব। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে হইলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায় সেই জন্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বলিব। যাহা একবার পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে তৈলঙ্গ স্বামী নির্ব্বিকার, ত্রিকালজ্ঞ, সদানন্দ, দয়ার সাগর, জীবনমুক্ত, এবং জীবন্ত ঈশ্বর ছিলেন।

নানা প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া ও ধর্ম্মালোচনা

করিয়া পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে জন্মজন্মান্তরের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধু, মহাত্মা ও জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে লোকে স্বর্গ, নরক ও নানা যোনি ভ্রমণ করতঃ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, এই সকল বিষয় জানিয়াও এবং পুনর্জ্জন্মবাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও সিদ্ধ মহাপুরুষ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট তাঁহার কি অভিমত তাহা জানিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা হইল। একবার তীর্থে যাইয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিব এবং সেই সময় প্রথমে ৺কাশীধামে যাইয়া মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট মনের সন্দেহ দূর করিয়া লইব স্থির করিলাম। কোন পণ্ডিতের দ্বারা ইহার ঠিক মীমাংসা হইবে না কারণ যিনি যত বড় পণ্ডিত তিনি তত যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বামীজী ব্যতীত আর কেহই দিতে পারিবে না। যে কোন প্রকারে হউক একবার স্বামীজীর নিকট যাইতেই হইবে এবং যত দিন না মীমাংসা হয় তত দিন ফিরিব না ইহাই মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি মুঙ্গেরে কোন এক বড় ডাক্তার-খানাতে চাকরী করিতাম। পরের চাকরী, ছুটী না পাইলে যাওয়া ঘটে না। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মন চঞ্চল হইতে লাগিল এবং ছুটী লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পরে ১২৮৭ সালে তিন মাসের ছুটী লইয়া

অগ্রহায়ণ মাসের ২রা তারিখে আমি তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলাম। মুঙ্গের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ৺কাশীধামে নারদঘাটে তাহার নিজ বাটীতে থাকিবার জন্য তাহার বাটীর তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র দিলেন, ঐ পত্র খানিতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল, থাকিবার জন্য কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হয় নাই। উক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন তাহাকে পাইয়া আমার আরও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন ইত্যাদি তাহার দ্বারায় সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, অবশেষে তাহারই সহিত সাত দিন দুই বেলা স্থানীয় সমস্ত তীর্থ দর্শন করিলাম। তিনি অতি আনন্দের সহিত আমাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেব দেবী দর্শন করাইতে লাগিলেন এবং যে তীর্থের যে মাহাত্ম্য তাহা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে শেষে একদিন পঞ্চগঙ্গার ঘাটের উপর বিন্দুমাধব, এবং মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রম দেখাইলেন। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর দেবমূর্ত্তিখানি দেখিয়া আমার অতিশয় ভক্তি হইল। অল্পক্ষণ তথায় থাকিয়া আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার মনের ভাব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কিছুই প্রকাশ করিলাম না। বাসায় আসিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তৈলঙ্গ স্বামীর গুণাগুণ

ও ক্ষমতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না কেবলমাত্র বলিলেন "উহার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর উহার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, একটা পাগল মাত্র, জাতি বিচার নাই, যার পায় তারই খায়, দোকানের জিনিস লুটাইয়া দেয়, কাহারও সহিত কথা কহে না, উলঙ্গ থাকে, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে উত্তপ্ত বালিতে শয়ন করিয়া থাকে, শীতকালে ভয়ানক শীতে জলে বসিয়া থাকে। কখন কখন দুই তিন ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকে। আবার কখন কখন জলে ভাসিতে থাকে সকলে বলে কুম্ভক যোগী। উহার বয়ঃক্রম সাত আট শত বৎসর হইবে এই প্রকার এক ভাবেই আছে।"

পরদিবস প্রাতঃকালে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া পূজ্যপাদ মৌনাবলম্বী মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক একটী থামের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তিখানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, স্বামীজীকে পুনর্জন্ম তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ সংশয় দূর করিব। নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিব সে প্রকার সাহসও হইতেছে না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই স্বামীজী অঙ্গুলী সঙ্কেতে আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। আমি কিয়ৎক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে স্বামীজীর সেবক মঙ্গলদাস ঠাকুর আমাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে

বলিলেন। আমি মুগ্ধচিত্তে ও দুঃখিত অন্তঃকরণে নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পুনরায় বৈকালে আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবার অভিলাষে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই থামের পার্শ্বে দাঁড়াইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, এইবার মনের কথা প্রকাশ করিব। বলিব বলিব মনে করিতেছি এমন সময় আমার মুখের কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী প্রাতঃকালের ন্যায় হাত নাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন, তদ্দর্শনে মঙ্গলদাস ঠাকুরও আমাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমি অনন্যগতি হইয়া মনের কথা মনে রাখিয়া ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্নচিত্তে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করতঃ আশ্রমে যাইয়া স্বামীজীকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ব দিনের মত সেই থামের নিকট দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি নড়িলাম না, তাহাতে মঙ্গলদাস ঠাকুর আমাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলিলেন, তাহাতেও আমি নড়িলাম না, তাহা দেখিয়া স্বামীজী ব্যগ্রভাবে তাঁহার গোসেবককে ইঙ্গিত করিলেন, "ইহাকে বাহির করিয়া দাও", সে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলপূর্ব্বক বাটীর বাহির করিয়া দিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বড় লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বাসায় আসিলাম। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া বড়ই হতাশ হইলাম। অবশেষে স্থির করিলাম কপালে যাহাই থাকুক,

আমি কোন মতে ছাড়িব না। অতি ভয়ে ভয়ে পুনরায় বৈকালে আশ্রমে যাইয়া স্বামীজীকে প্রণামান্তে যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইলাম কিন্তু অল্প সময় পরেই প্রাতঃকালের ন্যায় বিদায় করিয়া দিলেন। কি উপায় করিলে একটু বসিবার স্থান পাই তাহাই আমার প্রধান চিন্তা হইল। অবশেষে স্থির করিলাম যে, কিছু অর্থের দ্বারা স্বামীজীর সেবক দুইজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহারা আর আমাকে তাড়াইয়া দিবে না। স্বামীজী যাইতে সঙ্কেত করিলেও আমি দাঁড়াইয়া থাকিব, এবং সংশয় দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতে ফিরিব না। ইহাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম।

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে মণিকর্ণিকায় স্নানাদি করিয়া আশ্রমে গমন করিলাম, স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলদাস ঠাকুরের নিকট বসিলাম। প্রথমে তাহাকে চারি টাকা দিলাম ও সেই গোসেবককে দুই টাকা দিয়া উভয়কে করজোড়ে বলিলাম যে আপনারা আমাকে আর তাড়াইয়া দিবেন না, উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, কিন্তু মঙ্গলদাস ঠাকুর বলিলেন বাবা অনুমতি না দিলে এখানে থাকা বড় শক্ত, আমরা কি করিব? বাবার আদেশ পালন করিতেই হইবে। গোসেবক বলিল আমি আর সম্মুখে হাজির থাকিব না। আমি ভয়ে ভয়ে করজোড়ে স্বামীজীর সম্মুখে থামের পার্শ্বে দাড়াইয়া রহিলাম। কিছু অগ্রসর হইয়া আমার মনের কথা প্রকাশ করিব, এই প্রকার কল্পনা করিতেছি কিন্তু সাহস

হইতেছে না, অদ্য আর তাড়াইয়া দিবার ভয় নাই নিশ্চয়ই বলিব স্থির করিলাম।

যখন আমার মনের কথা বলিব স্থির করিয়া একটু অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় কলিকাতা হইতে দুইটি বাবু আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী তাহাদিগকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বড় নম্র স্বভাবের লোক তিনি বাহিরে যাইতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অপর বাবুটি ঠিক তাহার বিপরীত, তিনি অতিশয় রাগ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে "এক্ষণে আমি কোন মতে যাইব না। সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি, আমি এখানে থাকিতে আসি নাই, কিছুক্ষণ পরে চলিয়া যাইব ইহার জন্য এত রাগ কেন?" তাহাতে স্বামীজী রাগান্বিত হইয়া মঙ্গল দাস ঠাকুরকে ইঙ্গিত করিলেন যে, "গোসেবক দ্বারা ইহাকে "শীঘ্র বিদায় করিয়া দাও।" মঙ্গল-দাস ঠাকুর গোসেবককে এই কথা বলায় সে আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, শীঘ্র বাহিরে যাও, বাবাকে দর্শন করা হইয়াছে আর এখানে বৃথা জনতা করিবার আবশ্যক নাই।" বাবুটী তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন "তুমি বাহিরে যাও, আমি এখন কোনমতে যাইব না।" এই প্রকারে দুইজনে ঝগড়া লাগিয়া গেল। তাহা দেখিয়া স্বামীজী উক্ত বাবুটীকে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং মঙ্গলদাস ঠাকুরকে

কাগজ কলম লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে সঙ্কেত করিলেন। মঙ্গলদাস ঠাকুর নিকটে আসিলে তাঁহার বেদীর সংলগ্ন দেওয়ালে দেবনাগরী অক্ষরে যে সমস্ত শ্লোক লেখা ছিল তাহার মধ্য হইতে এক একটি অক্ষর স্বামীজী অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন এবং মঙ্গল দাস ঠাকুর তাহা লিখিতে লাগিলেন, লেখা শেষ হইলে স্বামীজী মঙ্গলদাস ঠাকুরকে তাহা পাঠ করিয়া উক্ত বাবুটীকে শুনাইয়া দিতে সঙ্কেত করিলেন।

মঙ্গলদাস ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া সেই বাবুকে নিম্নলিখিত কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন, "তোমার ১৮৲ টাকার মূল্যের জুতা জোড়াটি বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ যদি কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে খালি পায়ে বাসায় যাইতে মহা কষ্ট হইবে আর নূতন জুতা জোড়াটিও যাইবে, তাহাই ভাবিতেছ। অতএব তুমি আমাকে দেখিতেছ কি তোমার সেই বহুমূল্যের জুতা দেখিতেছ? কি ভাবিতেছ সত্য করিয়া বল। তোমার এই বৃথা দুর্ভাবনার আবশ্যক নাই, তোমার জুতা লইয়া শীঘ্র চলিয়া যাও কেহ চুরি করে নাই।" এই ঘটনায় সেই স্থানে যাহারা ছিলেন সকলেই নিস্তব্ধ ও অবাক্ হইয়া রহিলেন। আমি সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! সত্য সত্যই কি আপনি জুতার কথা ভাবিতেছিলেন?" তিনি বলিলেন "হাঁ মহাশয় যথার্থই আমার জুতার ভাবনা হইতেছিল।" আমি এই প্রকার

আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনও দেখি নাই, স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া আমার বিশ্বাস ভয়ানক বাড়িল, ভক্তিরসে মন গলিয়া গেল। মনে মনে স্থির করিলাম যতই কষ্ট পাইতে হউক আমি কিছুতেই ছাড়িব না। সেই বাবুটিরও রাগ রঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল, তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাহার পর স্বামীজী তাহাকে যাইতে ইঙ্গিত করায়, আর কোন কথা না কহিয়া তাহারা উভয়ে চলিয়া গেলেন।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া হস্ত সঙ্কেতে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ভাবিলাম না যাইয়া একটু জোর করিয়া দেখি কিন্তু সাহস হইল না, অগত্যা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বড় আশা করিয়া আবার বৈকালে গেলাম তখন ও তাহাই ঘটিল, এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে ১২ দিবস দুই বেলা যাতায়াত করিয়া একটু বসিবার স্থান ও না পাওয়াতে বড়ই হতাশ হইলাম, জীবন তুচ্ছ জ্ঞান হইল, মনে হইতে লাগিল যে আমার ন্যায় হতভাগ্য জীব এ জগতে আর কেহই নাই। আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে একজন সাধু ব্যক্তির নিকট একটু বসিতে স্থান পাই না, দেখিবামাত্র তাড়াইয়া দেন। না জানি কত পাপ করিয়াছি সেই জন্য স্বামীজী আমাকে নিকটে বসিতে দিতেছেন না। এই দুর্ভোগ্য দুঃখ দুই চারি নিমেষের মধ্যে আমার হৃদয়কে অতিশয় ব্যথিত করিয়া ফেলিল। ত্রয়োদশ দিবস প্রাতঃকালে আশ্রমে যাইয়া আমি হৃদয়ের দুঃখাবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া মর্ম্মাহত

চিত্তে কাঁদিয়া ফেলিলাম দু'নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। তখন স্বামীজী আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নিজেই বসিতে অনুমতি করিলেন এবং দুঃখাবেগ সম্বরণ করিতে সঙ্কেত করিলেন। স্বামীজীর সকরুণদৃষ্টিযুক্ত সঙ্কেতে আমার হৃদয়ের দুঃখাবেগ আরও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল এবং স্বামীজীর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পরিতাপে প্রাণ পুড়িতে লাগিল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া সঙ্কেতে বলিলেন "আজ ইহাকে যাইতে বল কাল প্রাতঃকালে আসিতে বলিয়া দাও।" মঙ্গলদাস ঠাকুর স্বামীজীর আদেশবাণী আমাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে আসিতে বলিলেন। তখন আমার ক্ষুব্ধ চিত্ত আশ্বস্ত হইল, অনুতপ্ত প্রাণ শীতল হইল। বিষণ্ন হৃদয় প্রফুল্ল হইল, আমার আশা পূর্ণ হইবে ভরসা হইল। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে বাসায় আসিলাম। আশার সঞ্চার হইয়াছে ভাবিতে লাগিলাম এবং পরদিন প্রাতঃকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরদিন চতুর্দ্দশ দিবস প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া পূর্ণোৎসাহে আশ্রমে গমন করতঃ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিলাম, এবং চরণ ধূলা সর্ব্বশরীরে উত্তমরূপে মাখিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। সাধুর সমীপে বসিয়া সাধু সঙ্গের পবিত্রগুণে আমার হৃদয়ের আবরণ কাটিল। আমার দেহ তখন পবিত্র হইয়াছে বলিয়া মনে

হইল। তখন এক প্রকার নূতন রকমের আনন্দ হইল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ইঙ্গিত করিলেন। যাহাতে একখানি পাথর একখানি গেরিমাটি এবং এক লোটা জল আমার নিকটে দিয়া মঙ্গলদাস ঠাকুর বলিলেন বাবা আপনাকে গেরিমাটি ঘসিতে বলিতেছেন। আমি গেরিমাটি ঘসিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা আন্দাজ দ্বিপ্রহরের সময় স্বামীজী নিজেই আমাকে সেই ঘসা গেরি একটি পাথর বাটিতে রাখিয়া আহার করিতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। আজ্ঞামত আমি তাহাই করিলাম এবং বাসায় যাইয়া আহারাদি শেষ করতঃ পুনরায় আশ্রমে আসিলাম। আসিবামাত্র আমাকে পুনরায় গেরি ঘসিবার সঙ্কেত করিলেন, আমিও তাঁহার আদেশ মত তাহাই করিতে লাগিলাম। বৈকালে একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন, স্বামীজী নিজেই তাঁহাকে সেই গেরির বাটি এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি কাগজ দিলেন এবং উঠানের দেওয়ালে ঐ গেরির দ্বারা তাহা লিখিতে আদেশ দিলেন। তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আমাকে পুনরায় ঐ ঘসা গেরি সেই বাটিতে রাখিয়া বাসায় যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমিও অবনত মস্তকে আজ্ঞাপালন করিয়া বাসায় আসিলাম।

পরদিন পঞ্চদশ দিবস প্রাতঃকালে যথারীতি পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ আশ্রমে গমন করতঃ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনিও আমাকে পূর্ব্ববৎ

গেরি ঘ্‌সিতে সঙ্কেত করিলেন। গেরি ঘসিতে ঘসিতে যখন হাত বেদনা যুক্ত হয় ও একটু আস্তে আস্তে ঘসিতে থাকি তখন স্বামীজী মুখ গম্ভীর করিয়া হাত ঘুরাইয়া খুব জোর করিয়া ঘসিতে সঙ্কেত করেন। তাঁহার সেই গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে সমধিক ভীত হইয়া আবার যথাসাধ্য জোর করিয়া ঘসিতে থাকি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় দ্বিপ্রহরের সময় ঘসা গেরি বাটিতে রাখিয়া আমাকে আহার করিতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। আমিও বাসায় আসিয়া আহারাদির পর পুনরায় আশ্রমে আসিলাম। আবার সেই গেরি ঘসিবার হুকুম হইল সন্ধ্যাকালে বাসায় যাইতে অনুমতি করিলেন।

এইরূপে ১৫ দিন ক্রমাগত দুই বেলা গেরি ঘসিয়া আমার দুই হাত অবশ হইয়া গেল। দুই হাতের জোর একেবারে কমিয়া গেল। এমন কি আহারের সময় হাত মুখে তুলিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সর্ব্বদা ভাবিতাম আমার যেমন অদৃষ্ট তেমনই কার্য্য পাইয়াছি। মনের কথা মনেই থাকিল তাহা আর প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি দুই বেলা গেরি ঘসিতে থাকিলাম এবং সেই ব্রহ্মচারী ও প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া সেই ঘসা গেরি লইয়া উঠানের দেওয়ালে শ্লোক লিখিতে লাগিলেন। প্রত্যহ যাহা ঘসা হইত প্রত্যহ তাহা খরচ হইত। ব্রহ্মচারীর কোন প্রকার বিরক্তি নাই কিন্তু আমি ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া পড়িলাম।

এই প্রকারে ২৮ দিন কাটিল। ঊনত্রিংশৎ দিবস

প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া আশ্রমে গমন করতঃ স্বামীজীকে ভক্তিভরে প্রণামান্তর তাঁহার পদতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আজ যদি আমার উপর গেরি ঘসিবার হুকুম হয় তবে আমি নাচার, আজ আমার দুই হাত অচল, আমার গেরি ঘসিবার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নাই। হায়! আজ আমার কি হইবে ? গেরি ঘসিতে না পারিলে যদি স্বামীজী তাড়াইয়া দেন তাহা হইলে আমার আশা ভরসা সব ফুরাইল, এত পরিশ্রম এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও আজ বুঝি আমার সকল আশা জলাঞ্জলি দিয়া ফিরিতে হয়। এই প্রকার অনন্ত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়া আমার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল এবং দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিতেলাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ সঙ্কেতে মঙ্গলদাস ঠাকুরের দ্বারা আমি দেবনাগরী পড়িতে পারি কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম "দেবনাগরী পড়িতে পারি।" তাহা শুনিয়া স্বামীজী স্বয়ং তাঁহার বেদীর কম্বলের ভিতর হইতে একটি বড় বাঁশের চোঙ্গা বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং মঙ্গলদাস ঠাকুরের দ্বারায় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে "ইহার ভিতর যে শ্লোকগুলি আছে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তোমাকে লিখিতে হইবে।" আমি হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম, আমাকে যে আজ আর গেরি ঘসিতে হইবে না জানিয়া, স্বামীজীর দয়ার বিষয় ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং কাগজ কলম ও দোয়াত

আনিয়া শ্লোকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেক কাগজের তলায় আমার নাম স্বাক্ষর করা আছে। পাঁচ দিবস দুই বেলা পরিশ্রম করিয়া চোঙ্গার শ্লোকগুলি লেখা শেষ করিলাম। স্বামীজীকে তাহা বলায় তিনি একবার সমস্তগুলি পাঠ করিতে সঙ্কেত করিলেন। পাঠ শেষ হইলে বাঁশের চোঙ্গায় পুরিয়া কম্বলের ভিতর রাখিলেন এবং পূর্ব্বের মত কম্বলের ভিতর হইতে পুনরায় অপর একটি চোঙ্গা বাহির করিলেন ও তন্মধ্যস্থিত শ্লোকগুলি সেই প্রকার বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে আদেশ করিলেন। এই চোঙ্গাটী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ছোট ছিল ইহার শ্লোকগুলি লেখা শেষ করিতে তিন দিবস লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় একবার পাঠ করিতে বলিলেন, পাঠ শেষ হইলে সমস্তগুলি চোঙ্গায় পুরিয়া কম্বলের মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং আমাকে বাসায় আহার করিতে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

আমি বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া পুনরায় আশ্রমে আসিলাম। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শয়ন করিলেন তাহাতে আমার মনে হইল আজ আর আমার কোন কাজ নাই। তাঁহার চরণ ধূলা, মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দেহটা পবিত্র করিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলাম। তাহাতে তিনি কিছু না বলাতে মনে মনে বড় সাহস হইল এবং স্থির করিলাম স্বামীজী উঠিলেই অদ্য মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব। সাধু সেবা করাতে সাধুর দয়া হইল। তিনি সন্ধ্যার সময় উঠিয়া বসিলেন।

বসিয়াই মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ইঙ্গিতে বলিলেন যে "ইহাকে বলিয়া দাও আগামী কল্য দিবা ভাগে না আসিয়া সন্ধ্যার সময় যেন আমার নিকট আইসে।" মঙ্গলদাস ঠাকুর আমাকে বাসায় যাইতে বলিয়া বাবার আদেশবাণী শুনাইয়া দিলেন। আমি মহাআনন্দের সহিত বাসায় আসিলাম। অদ্য আমার সকল কষ্ট দূর হইল। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে এবং সমস্ত দিবাভাগ কাটিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইবে তাহাই একান্ত মনে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরদিবস সন্ধ্যা সমাগত হইলে আমি মনের আবেগে দ্রুতবেগে সাধু দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ করিবার মানসে আশ্রমে চলিলাম। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে যে বৃহদাকার মহাদেব ও কালীমূর্ত্তি ইত্যাদি বিদ্যমান আছেন তাঁহাদের আরতি দর্শন করিয়া স্বামীজীর নিকট প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাকে সঙ্গে লইয়া একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেখানে আর কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ঐ ঘরে কেবলমাত্র একখানি আসন পাতা ছিল ও একটী দীপ জ্বলিতেছিল। স্বামীজী সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন আমিও তাঁহার নিকটে বসিলাম। সাধু, ভক্তবৎসল, শরণাগত ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন। তিনি ধীর বচনে বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ তাহাতে তোমার এত সংশয় কেন?

অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা। ত্রিকালদর্শী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ. মহর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধ, শুদ্ধ মহাত্মগণ তপোবলে জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কি সংশয় করিতে আছে? তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের স্বকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। মনুষ্যমাত্রেই যদি একটু চিন্তা ও চেষ্টা করে তবে পূর্ব্বজন্ম, বর্ত্ত-মান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্মের সংবাদ সহজে অবগত হইতে পারে এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারে। দুঃখের বিষয় আসল তত্ত্ব জানিবার বা বুঝিবার কাহারও চেষ্টা নাই। আমি তোমাকে যাহা বলিব বা বুঝাইব তাহাই যে সত্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? এবং তাহাই তোমার বিশ্বাস হইবার কারণ কি? তুমি যখন আমার নিকট আসিয়াছ এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তখন আমি তোমাকে পুনর্জন্ম ভাল রূপ বুঝাইয়া দিব্য চক্ষে দেখাইয়া দিব। প্রথমে তোমার পূর্ব্ব ঘটনা কতকগুলি আমি বলিব, যাহা তুমি ভিন্ন এখানে আর কেহই জানে না, যদি তাহা তোমার প্রত্যয় হয় ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় তবে আমি পরে যাহা বলিব, যাহা তুমি জান না, যাহা জানিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া প্রত্যয় হইবে। দেখ লোকের যখন পুনর্জন্ম হয় তখন ইহ জীবনের মালমসলা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাণুর সমষ্টি লইয়া গঠন হয়। সে জন্য ইহ

৫—

জীবনে যে বিদ্বান্, পরজন্মে সে নিশ্চয় বিদ্বান্ হইবে। ইহ জীবনে যে ভাল বাজাইতে পারে পরজন্মে সে নিশ্চয় ভাল বাজাইতে পারিবে। ইহ জীবনে যিনি ধার্ম্মিক, পরজন্মে তিনি নিশ্চয় ধার্ম্মিক হইবেন। ইহ জীবনে যে চোর পরজন্মে সে কখনই সাধু হইতে পারে না। যদি একটু ভাবিয়া দেখ তবে বেশ বুঝিতে পারিবে যে যদি পরকাল না থাকিত তবে ভগবানকে দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারিত না। সকলকেই বলিতে হইত যে ঈশ্বর যত অবিচার করেন এত অবিচার কোন পাপিষ্ঠ মনুষ্যের দ্বারাও সম্ভবে না।

যদি কেবল মাত্র এক জীবন অর্থাৎ ইহ জীবনই শেষ জীবন হইত তাহা হইলে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ বেহারা কেহ মেথর ; তাহা ব্যতীত, কেহ রোগী, কেহ নীরোগ এবং কেহ মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, কেহ অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, জীবনের এত প্রভেদ কেন ? কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করিলে কোন প্রকার দণ্ড কখনই ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের কি তবে কোন প্রকার ভাল মন্দ বিচার নাই ? যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন ? কখনই না। এমন সুবিচার করিবার কাহারও সাধ্য নাই, এই সকল বিষয় কাহারও বোধগম্য নহে বলিয়া তাঁহারই উপযুক্ত। কর্ম্মফল অনুসারে জীবনের এত প্রভেদ হইয়া থাকে। ইহ জীবনের আকৃতি, বর্ণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব এবং কর্ম্মফল ইত্যাদির পরমাণু সমষ্টি আত্মা ও জীবাত্মা

লইয়া পরজন্মের গঠন হইয়া থাকে সেই জন্যই লোকে নানা প্রকার আকৃতি, নানা প্রকার অবস্থা এবং নানাপ্রকার কর্ম্ম-ফলের অধীন হইয়া নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য ও সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ব প্রশান্তভাবে দেখিলে প্রশান্তমূর্ত্তি দেখায়, বিকটভঙ্গী করিয়া দেখিলে বিকটাকার দেখা যায় সেই প্রকার লোকে সোজা পথে থাকিয়া কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করিলে এখন যে অবস্থা আছে পরেও ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর বিকটাকার অর্থাৎ অন্যায় বা অসৎ কার্য্য করিলে নীচগামী হইতে হয় আর সৎকর্ম্ম ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিলে আত্মার উন্নতি হইয়া উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাতে আর সন্দেহ কি? তুমি যদি চুরি কর তবে রাজ-দ্বারে অবশ্য তোমার শাস্তি হইবে। যদি কখন চুরি বা কোন প্রকার অসৎকর্ম্ম না কর তবে তোমার জীবনের মধ্যে কাহার সাধ্য তোমাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়? যেমন পীড়া হইলে ডাক্তার এবং ঔষধ প্রয়োজন হয় তেমনই পীড়া না হইলে ডাক্তার বা ঔষধ কিছু মাত্র প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি কি প্রকার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তোমার আকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি কি প্রকার পাইয়াছ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে পূর্ব্বজন্মে তুমি কি প্রকার অবস্থার ও কেমন স্বভাবের লোক ছিলে। বর্ত্তমান জীবন বেশ দেখিতে পাইতেছ ইহ জীবনে ভাল মন্দ কার্য্য যাহা কিছু করিয়াছ তাহা তুমি বেশ জান। ভাল কার্য্য করিলে

ভাল হয় মন্দ কার্য্য করিলে মন্দ হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে এ জন্মে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ব্রাহ্মণোচিত সৎকার্য্য করিয়া যাও ও সৎপথে থাক তবে আত্মোন্নতি করিতে পারিবে আর যদি সেরূপ না করিয়া পাপাচারী হও এবং অন্যায় কাজ কর তবে চণ্ডালের ঘরেও জন্ম হইতে পারে। আর ভাল মন্দ কিছুই না করিলে যেমন অবস্থা তেমনই থাকে; পর জন্মে কি প্রকার জন্ম হইবে এক্ষণে তুমি নিজেই তাহা স্থির করিতে পারিবে। অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হইবে না। এ বিষয় পরে ভালরূপে বুঝাইব এক্ষণে তোমার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য কিছু বলিব।

আমি একবারও মুখ ফুটিয়া স্বামীজীকে এই কথা বলিবার সুযোগ পাই নাই। আমার মনের কথা স্বামীজী কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহাই ভাবিয়া অবাক্ হইলাম। আত্মজ্ঞ যোগী যে সর্ব্বান্তর্য্যামী ইহা আমার প্রতীতি হইল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিশ্বাস দৃঢ় হইল। স্বামীজী যাহা বলিতেছেন এবং যাহা বলিবেন তাহা নিশ্চয়ই অবিসম্বাদী সত্য। আমার আনন্দের সীমা নাই। তিনি যে আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবেন তাহা একবারও মনে হয় নাই।

স্বামীজী বলিলেন তোমার নাম অমুক, তোমার পিতার নাম অমুক, তোমার নিবাস অমুক গ্রামে, তোমার বাসগৃহে এতগুলি ঘর আছে, বাটীর অমুক দিকে একটী পুকুর আছে,

তাহার নিকট অমুক অমুক বৃক্ষ আছে, এবং বাটীতে অমুক অমুক বাস করিয়া থাকেন। স্বামীজীকে অতি সুপরিচিতের ন্যায় এই সকল কথা বলিতে শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। পুনরায় যখন স্বামীজী বলিলেন তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলে, অমুক গ্রামে অমুক নামে একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলে। তুমি বড় শিষ্টাচারী ছিলে, দ্বিতলের উপর দক্ষিণদ্বারি তোমার শয়ন ঘরের ভিতর দরজার উপর তোমার নিজের হাতের লিখা তিনটী সংস্কৃত শ্লোক এখনও আছে সুবিধা মত যাইয়া দেখিয়া আসিও (উক্ত শ্লোক তিনটী ১৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

স্বামীজী তাহার পর বলিলেন দেখ অমুক গ্রামে অমুক নামে যে লোকটী বাস করেন তিনি তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন তুমিও তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাস এবং স্নেহ কর, ইহার কারণ কি জান? তিনি তোমার পূর্ব্বজন্মে পিতা ছিলেন। তুমি পুত্র তিনি পিতা বলিয়া পূর্ব্বের যেমন স্নেহ তেমনই আছে, কেবল মাত্র দেহ পরিবর্ত্তন হেতু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না। আর তোমার খুল্লতাত অমুক নাম ধারণপূর্ব্বক মুঙ্গেরেই আছেন তিনি তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তোমার নিকট আসিয়া রাত্র ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত থাকেন তোমাকে একবার না দেখিলে তাঁহার মনে শান্তি হয় না। তুমিও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাক ইহার কারণ কেবল পূর্ব্বজন্মের

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, স্নেহ যেমন সেইরূপই আছে দেহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। শেষে বলিলেন এ সকল কথা বলিবার বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না, কেবল আমি পরে যাহা বলিব তাহা যে নিশ্চয় সত্য তাহা তোমার বিশ্বাসের জন্য বলিতে হইল। তোমার যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে সেই প্রকারে বুঝাইয়া দিব।

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "উমাচরণ! তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিগুণে অবকাশ লইয়া ৺কাশীধামে আসিয়াছ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিজোচিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, যেন জন্মজন্মান্তরে আর কোন প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। তুমি যদি ভালরূপে এবার জীবন অতিবাহিত কর তবে পুনর্জন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। বাসনা ত্যাগই মুক্তির সোপান। বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তির আশা নাই।"

স্বামীজীর এই প্রকার অলৌকিক কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি নিস্তব্ধ ও চমৎকৃত হইলাম। আমার জন্মজন্মান্তরের কথা শাস্ত্রানুরূপ বিশ্বাস হইল, আর কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম স্বামীজীর অসীম দয়া তথাপি আমাকে প্রথমে এত কষ্ট দিবার কারণ কি? কষ্ট না করিলেও সুখ হয় না।

নানা প্রকার কথায় রাত্রি শেষ হইল, স্বামীজী আমাকে বলিলেন "তুমি বাসায় যাও এবং শৌচক্রিয়াদি শেষ করিয়া শীঘ্র আসিবে অদ্য আমরা উভয়ে একত্র স্নান করিতে যাইব।"

আমি তাহাই করিলাম। আমি আসিলে উভয়ে একত্র স্নান করিতে গমন করিলাম। পঞ্চগঙ্গার ঘাটে নামিয়া আমাকে বলিলেন "দেখ উমাচরণ! অদ্য রাত্রি যখন আসিবে একখানা খাতা সঙ্গে আনিও, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিব, সেইগুলি তুমি লিখিয়া লইবে তাহাতে তোমার বিশেষ উপকার হইবে, কেবল শুনিয়া গেলে মনে রাখিতে পারিবে না। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িবার আবশ্যক হইবে না। যাহা আমি লিখাইয়া দিব তাহা পাঠ করিয়া মনে রাখিতে পারিলে যথেষ্ট জ্ঞান হইবে। জীবের মুক্তি অপেক্ষা সার বস্তু আর কিছুই নাই, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা আর জ্ঞান নাই, সেই মুক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, কেবল আসল কথাগুলি জানিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। মুক্তি ভিন্ন মানবের গতি নাই। সর্ব্বদা মুক্তি কামনা করিবে, যতদিন না জ্ঞানের উদয় হয় ততদিন কেবল যাতায়াত ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতেছ বা করিতেছ সমস্তই ভূল। সংসারের রাজা অথবা প্রজা কাহারও কোন প্রকার নির্ম্মল সুখভোগ করিবার ক্ষমতা নাই।"

স্বামীজীর এই সকল উপদেশপূর্ণ দয়ার কথাগুলি শুনিয়া আমি মহা আনন্দিত হইলাম। তাহার পর উভয়ে স্নান করিবার জন্য জলে নামিলাম। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ জলের উপর চিৎ হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর

কোন অঙ্গ সঞ্চালন না করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন ; এইভাবে কিছুদূর যাইয়া জলে মগ্ন হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন আর দেখিতে পাইলাম না, প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমার নিকটেই ভাসিয়া উঠিলেন। পরে জল হইতে উঠিয়া সিঁড়ির উপর উপবেশন করিলে, আমি তাঁহার অঙ্গ মুছাইয়া দিয়া উভয়ে আশ্রমে গমন করিলাম। তিনি তাঁহার বেদীর উপর বসিলেন এবং আমি তাঁহার নিকট মেজেতে বসিলাম। দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে আহার করিবার জন্য যাইতে অনুমতি করায় আমি বাসায় চলিয়া গেলাম এবং আহারাদির পর একখানি খাতা সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা সমাগতা হইলে একখানি খাতা লইয়া আশ্রমে আসিলাম। আরতির পর পূর্ব্বদিনের ন্যায় স্বামীজী সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে আমি নিকটে বসিলাম। স্বামীজী ধীর বচনে বলিতে লাগিলেন, দেখ গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাউক। অদ্য হইতে আমি তোমাকে দ্বাদশটী বিষয় বুঝাইব, তুমি তাহা লিখিয়া লইবে। পৃথিবীর আদিতে এক "ঈশ্বর" ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। প্রথমে তাঁহারই বিষয় বলিব। দ্বিতীয় "সৃষ্টি", তৃতীয় "সংসার", চতুর্থ "গুরু ও শিষ্য", পঞ্চম "চিত্তশুদ্ধি", ষষ্ঠ "ধর্ম্ম", সপ্তম "উপাসনা", অষ্টম "পুনর্জন্ম", নবম "আত্মবোধ", দশম "তন্ময়ত্ত", একাদশ "কয়েকটী সারকথা", দ্বাদশ "তত্ত্বজ্ঞান।" উপরোক্ত

বিষয় কয়টী বুঝিতে পারিলেই প্রচুর জ্ঞানলাভ হইবে। এই বলিয়া তিনি "ঈশ্বর" বিষয় বলিতে লাগিলেন এবং আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপ পর পর ১৩ রাত্রি বারটী বিষয় লিখাইয়া দিলেন। লেখা শেষ হইলে বলিলেন তোমার আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িবার আবশ্যক নাই। অনেক পড়িলে মনের ঠিক থাকে না এবং নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়।

তাহার পর স্বামীজী বলিলেন তোমার "দেবতত্ত্ব" বিষয় কিছু জানা আবশ্যক সে বিষয়েও কোন সন্দেহ না থাকে। তোমাকে আরও বারটী বিষয় লিখিয়া লইতে হইবে অতএব তুমি আর একখানি খাতা লইয়া আসিবে। তাঁহার আজ্ঞামত পর দিবস রাত্রি আর একখানি খাতা লইয়া আশ্রমে আসিলাম। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া সেই রাত্রি হইতে পর পর ছয় রাত্রি বারটী বিষয় লিখাইয়া দিলেন। প্রথম "কৃষ্ণলীলা," দ্বিতীয় "রামলীলা," তৃতীয় "সীতাহরণ", চতুর্থ "রাম রাবণের যুদ্ধ", পঞ্চম "সমুদ্র মন্থন", ষষ্ঠ "ইন্দ্র", সপ্তম "বায়ু", অষ্টম "বরুণ", নবম "গৌতম", দশম "তীর্থ ভ্রমণ', একাদশ "আহার এবং পরিধান", দ্বাদশ "শুচি ও অশুচি"। সমস্ত লেখা শেষ হইলে খাতা দুইখানি অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিতে বলিলেন এবং তাঁহার কৃত "মহাবাক্যরত্নাবলী" নামক একখানি পুস্তক দিয়া মধ্যে মধ্যে এইগুলি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

সংসারে লোকে কনিষ্ঠ পুত্রকে যেমন অধিক ভালবাসে ও

স্নেহ করে সেই প্রকার দুই মাস যাতায়াত করায় আমিও যেন একজন আশ্রমেরই লোক বলিয়া অনেকের ধারণা হইল। বিশেষতঃ উভয়ে প্রত্যহ স্নান করিতে যাওয়াতে সকল লোকে বলিত এই বাঙ্গালী বাবুটিকে বাবা চেলা তৈয়ার করিতেছেন। আমাকেও স্বামীজী সেই প্রকার ভালবাসিতে ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমারও ভয় ভাঙ্গিয়া গেল ও ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া গেল আর ভয়ে ভয়ে বা ভাবিতে ভাবিতে আশ্রমে যাইতে হইত না। পিতার ধনে পুত্রের যেমন অধিকার হয় আমারও যেন ঠিক সেই প্রকার আশ্রমে একটু অধিকার জন্মিল। নিজের বাড়ীর মত যখন ইচ্ছা তখন যাই, যখন ইচ্ছা তখন আসি। বেশ মনের সুখে আছি, আনন্দের সীমা নাই। স্বামীজী যখন আমার উপর এত দয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা না লইয়া ছাড়িব না মনে মনে স্থির করিলাম। ইহার জন্য আমার যতদিন থাকিবার আবশ্যক হয় ততদিন থাকিব।

পরদিন অপরাহ্নে আমি স্বামীজীর নিকট বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছি এমন সময় মঙ্গলদাস ঠাকুর আমাকে বলিলেন "উমেশ বাবু? (মঙ্গলদাস ঠাকুর সেই সময় হইতে আমাকে উমেশ বাবু বলিয়া ডাকিতেন) আপনি বাবাকে খুব বশীভূত করিয়াছেন বোধ হয় বাবা আপনাকে চেলা করিবেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম যে "আপনি কি স্বামীজীর কোন কথা শুনিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন "আপনাকে চেলা করিবার আর কি বাকী আছে? বাবা আজ পর্য্যন্ত এত ঘনিষ্টতা কাহারও সহিত করেন নাই আর প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে এই বাঙ্গালী বাবুটি অতি শান্ত ও সৎ স্বভাবের লোক।" মঙ্গলদাস ঠাকুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইল ও স্বামীজীর নিকট দীক্ষা লইতে পারিব মনে মনে অনেকটা আশা হইল। আমি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে করজোড়ে বলিলাম "যাহাতে আমার দীক্ষা হয় সে বিষয় আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে আর সুবিধা মত স্বামীজীর মনের ভাব কি একবার দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, স্বামীজী আমাকে বাসায় যাইতে সঙ্কেত করিলেন আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে স্বামীজীর নিকট বসিয়া তাঁহার যোগ শাস্ত্রে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া আমি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য হইতে মনস্থ করিলাম। স্বামীজীকে মনের কথা প্রকাশ করিব ভাবিয়া আর একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া বসিলাম। আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন "এই বাঙ্গালী বাবু এক্ষণে দীক্ষা লইবার মানস করিয়াছে।" আমি করজোড়ে বলিলাম "আমার প্রতি আপনি বিশেষরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।" তিনি বলিলেন "সে বিষয় রাত্রি যুক্তি দেওয়া যাইবে, ইহা বড় শক্ত কথা, এক্ষণে

স্বাধীন ও মুক্ত আছ দীক্ষা লইলেই বাঁধা পড়িতে হইবে।” এই কথা বলিয়া বাসায় যাইতে আদেশ করিলেন আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন আমি তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন “তুমি এক্ষণে যোগ শিক্ষা করিবার মানস করিয়াছ কিন্তু তুমি যোগ শিক্ষার অনধিকারী, তুমি উপাসনা মার্গের উপযুক্ত, তুমি উপাসনা মার্গে প্রবৃত্ত হও।” আমি তাহাই স্বীকার করিলাম তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন “এই মাঘ মাসের ৩রা তারিখে পুষ্যা নক্ষত্রে যে চন্দ্রগ্রহণ আছে তোমাকে সেই গ্রহণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কারণ দেহ শুদ্ধ না হইলে দীক্ষা হইতে পারে না। সেই চন্দ্রগ্রহণের সময় রাত্রি তোমার দেহ শুদ্ধ করিয়া দিব।”

তাহার পর কয়েকটি দ্রব্যের একটি ফর্দ্দ লিখাইয়া দিয়া সেই দ্রব্যগুলি গ্রহণের সময় একজন সৎ ব্রাহ্মণকে দান করিতে বলিলেন এবং সে সময় গঙ্গা স্নান করিয়া এক আসনে বসিয়া জপ করিবার একটি মন্ত্র উপদেশ দিয়া যথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। ৺কাশীধামে গ্রহণের সময় সৎ ব্রাহ্মণকে দান করা বড়ই শক্ত। আমি তাঁহাকে বলিলাম “বাবা! আমার প্রতি বড় কঠিন আদেশ হইল। ৺কাশীধামে গ্রহণের সময় কোনও সৎ ব্রাহ্মণ আমার নিকট দান গ্রহণ

করিবেন না। কি উপায়ে এবং কাহাকে দান করিব দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলিয়া দিন।" তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন "ঐ সকল দ্রব্যের নাম ধরিয়া যিনি ভিক্ষা চাহিবেন তাঁহাকে দিবে তাহা হইলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।" আমি তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলাম বাবা নিজেই কোন ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিবেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণের দিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম এবং প্রত্যহই দুইবেলা নিয়মিতরূপে আশ্রমে যাতায়াত করিতে থাকিলাম। যথা-সময়ে গ্রহণের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল স্বামীজীর আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে ঠিক গ্রহণের সময় একজন ব্রাহ্মণ ঐ সকল দ্রব্যের নাম করিয়া আমার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল আমি অতি ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রদান করিলাম।

পরদিন ৪ঠা মাঘ প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সকল দেবতাকে ও স্বামজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন তোমার দেহ শুদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর গুরু কি প্রকার হওয়া উচিত এবং শিষ্যই বা কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং অনুমতি করিলেন যে আগামী কল্য তোমার দীক্ষা হইবে। দীক্ষার জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্য যোগাড় করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন কিছুই যোগাড় করিতে হইবে না।

স্বামীজীকে কিছু খাওয়াইবার জন্য অনেকদিন হইতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল অদ্য তাহা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন "আচ্ছা বেশ অদ্য অন্ন আহার করিতে হইবে তুমি কিছু বেগুন লইয়া আইস।" আমি বাজার হইতে পাঁচ সের ভাল গোল রামনগরের বেগুন এবং পাঁচ সের মিষ্টান্ন লইয়া আসিলাম। বেগুন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন মঙ্গলদাস ঠাকুরের মাতা অম্বাদেবীকে বেগুন ভাজা তরকারী এবং অন্ন পাক করিতে বলিলেন। নিজ হস্তে সেই বেগুন হইতে আমাকে ছোট রকমের চারিটি দিলেন। মিষ্টান্ন দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "আমি ইহা আনিতে বলি নাই তুমি কেন আনিলে?" তাঁহার মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইল এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে চরণ ধরিয়া অনুনয় বিনয় করার পর মিষ্টান্ন আহার করিলেন। অর্দ্ধসের আন্দাজ থাকিল তাহা মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ও আমাকে খাইতে সঙ্কেত করিলেন। আমরা উভয়ে প্রসাদ পাইলাম। তাহার পর যথাসময়ে আমাকে বাসায় যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার বেগুন ভাজা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল তিনি আহার করিতে বসিলেন। আমি বাসায় না গিয়া বসিয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম অদ্য যখন অন্ন আহার করিতেছেন যদি ভাগ্যে থাকে তবে আজ প্রসাদ পাইতে পারি। অন্ততঃ একটা ভাতও কুড়াইয়া খাইব। আহারান্তে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করায় আমাকে বলিলেন

"তুমি আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে কেন ?" আমি বলিলাম "উহা উচ্ছিষ্ট নহে, মহাপ্রসাদ, অন্ততঃ একটা ভাতও আমি কুড়াইয়া পাইব।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "যদি তোমার প্রবৃত্তি হয় তবে যাহা ইচ্ছা করিতে পার।' আমি প্রসাদ খাইয়া পাথর ও বাটি ধুইয়া স্থানটি পরিষ্কার করিয়া বাসায় গমন করিলাম।

অপরাহ্নে আশ্রমে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম, দেখিলাম তথায় তিন জন পরমহংস বসিয়া আছেন। তাঁহারা কোন বিষয় মীমাংসা করিতে আসিয়াছেন। দালানের মধ্যস্থলে দেবনাগরী অক্ষরে হস্তলিখিত প্রায় ২৫।৩০ খানা পুঁথি ছিল। মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা আনাইলেন এবং নিজে তাহা খুলিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় মীমাংসা করিয়া দিলেন। মধ্যে মধ্যে সায়ংকালে দুই চারিজন পরমহংস এই প্রকার তাহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া লইতেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভয়ানক মেঘ উঠিল তাহা দেখিয়া পরমহংস তিন জন তাঁহার অনুমতি লইয়া তাহাদিগের মঠে গমন করিলেন। আমিও বাসায় যাইবার জন্য স্বামীজীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল সেই বৃষ্টি প্রায় দুই ঘণ্টা একই ভাবে রহিল, রাত্রি অধিক হইতে লাগিল বৃষ্টির বেগ ভয়ানক বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অন্ধকার

যেন ভীষণ আকার ধারণ করিয়া জীবগণকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া মনে করিলাম অদ্য আর বাসায় যাইব না এই স্থানেই থাকিব। এমন সময় স্বামীজী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "এই সময় বাসায় যাও।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিয়া আকুল হইলাম, কারণ সে সময় বাটীর বাহির হওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে। বৃষ্টি থামিলে যাইব অনুমতি চাহিলাম, তিনি বলিলেন "তাহা হইবে না এই সময় যাও আর বিলম্ব করিও না।"

আমি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে বলিলাম "আজ কি কারণে স্বামীজী আমার প্রতি কঠিন আদেশ করিলেন, অকারণে মহা কষ্ট পাইতে হইবে। একে ছাতা নাই, আলোক নাই, তাহাতে এই ভীষণ অন্ধকার, চারিদিকে প্রবল বেগে বৃষ্টি পতন শব্দ, ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ আলোক এক একবার চমকিত হইতেছে, কি প্রকারে যাইব মহা ভাবনা হইতেছে।" মঙ্গলদাস ঠাকুর বলিলেন "ভয় খাইবেন না বাবার হুকুম পালন করুন বোধ হয় ইহাতে তাঁহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।" নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে স্বামীজীকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া দরজার বাহির হইলাম এবং দেখিলাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু আমার গাত্রে এক বিন্দুও জল পড়িতেছে না। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে সম্মুখে দেখিলাম একটী বাবু আলোক লইয়া আমার কিছু অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। আশান্বিত

হইয়া আলোক লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনি কোথায় যাইবেন?" কোন উত্তর না পাইয়া দ্রুতপদে যাইতে লাগিলাম কিন্তু সেই অদূরবর্ত্তী আলোকধারী বাবুকে কিছুতেই ধরিতে না পারিয়া একটু দৌড়িয়া গেলাম তাহাতেও ধরিতে পারিলাম না, তিনি সেই সমান দূরে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম যে এই আলোকদ্বারা যখন আমার গন্তব্যপথ সুচারুরূপে দর্শন হইতেছে তখন কষ্ট পাইয়া নিকটবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন কি? আমি ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম কিন্তু আলোকধারী ব্যক্তি তখনও সমদূরবর্ত্তী থাকিয়া আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ধারা প্লাবিত বৃষ্টির জলের উপর দিয়া আলোক লক্ষ্য করিয়া বাসায় যাইতেছি ইহা ভিন্ন আমার আর কোন লক্ষ্যই ছিল না। আমি ছত্রাদি বিহীন হইয়া অনাবৃত মস্তকে গমন করিতেছি কিন্তু ভূপৃষ্ঠ জল ব্যতীত বর্ষণ বারি আমার শরীর স্পর্শ করিতেছে না। আমি যে কি কারণে এত সুখে গমন করিতেছি পথি মধ্যে একবারও তাহা হৃদয় মধ্যে স্থান দিতে পারিলাম না। এইরূপে যেমন বাসায় উপনীত হইলাম সম্মুখস্থ আলোকও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন আমার চমক্ ভাঙ্গিল এবং স্বামীজীর নিষেধ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম। এতাদৃশ মহাপুরুষের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি ভাবিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিলাম। স্বামীজীকে অলৌকিক

ক্ষমতা সম্পন্ন দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইব ভাবিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিলাম। আগামী কল্য দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন না ঘটে ভাল মন্দ, একের পর এক নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য সকল ভাবিতে ভাবিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পর দিন ৫ই মাঘ প্রাতঃকালে প্রথমে আশ্রমে যাইয়া স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া উভয়ে স্নান করিতে গমন করিলাম। প্রায় তুই ঘণ্টার কমে তাঁহার স্নান করা হইত না। আমি কোন দিন তুই ঘণ্টা জলে থাকিতে পারিতাম না, স্নান করিয়া পঞ্চ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া অপেক্ষা করিতাম, তিনি জল হইতে উঠিলে তাঁহাকে মুছাইয়া দিয়া উভয়ে আশ্রমে আসিতাম অদ্যও তাহাই করিলাম। স্নান করিতে যাইবার ও আসিবার সময় আমার গলায় একটী হাত দিয়া ধরিয়া যাইতেন। কোন কোন দিন একটু ভর দিয়া চাপ দিতেন সেই চাপ সহ্য করিতে আমায় বিশেষ বেগ পাইতে হইত। আশ্রমে আসিয়া তিনি তাঁহার বেদীর উপর বসিলেন, আমি তাঁহার নিকটে মেজেয় বসিলাম। তিনি আমাকে বসিতে স্থান দেওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকট সেই এক স্থানেই প্রত্যহ বসিতাম। কিয়ৎক্ষণ পরে লোক সমাগম বন্ধ হইলে, তিনি বেদী হইতে নামিয়া প্রথমে আমাকে বসিবার আসন প্রণালী দেখাইয়া পরে জপের মন্ত্র উপদেশ দিলেন এবং যথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা

বলিয়া দিলেন। তাহার পর বেদীতে বসিয়া বলিলেন "দেখ বিষয় কার্য্য অনুরোধে যে কথা না কহিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না কেবল সেই কথা মাত্র কহিবে, বৃথা বাক্য এবং গল্পাদি করিয়া সময় কাটাইবে না। বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিলে তেজঃক্ষয় হয়। কখনও কাহার ধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না। যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস তাহার তাহাতেই মুক্তি। আহারাদিতে ধর্ম্মের হানি হয় না, কেবল মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয়। মুসলমানেরও মুক্তি হইয়া থাকে। ব্যাকুল হইয়া ভক্তি ভাবে যিনি তাঁহাকে ডাকিবেন তিনিই তাঁহাকে পাইবেন।"

তাহার পর বলিতে লাগিলেন "যে সকল ঘটনা দেখিয়া এখন তুমি মোহিত হইতেছ ইহার কোনটাই আশ্চর্য্য নহে। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তবে সকলেই এই সকল কার্য্য করিতে পারে। কেবল আহার বিহার ও বিষয় সম্ভোগ করিবার জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবানের যে সকল শক্তি আছে মানুষেরও ঠিক সেই সমস্ত শক্তি আছে। ভগবান মানুষকে মনের মত তৈয়ার করিয়া তাহাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কেহ সেই শক্তির ব্যবহার করিতে জানে না। যাঁহা হইতে এই পৃথিবী এবং কার্য্য করিবার, কথা কহিবার, কথা বুঝিবার ও চলিবার শক্তি পাইয়াছি যিনি নিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানিবার বা দেখিবার ইচ্ছা কাহারও নাই যদি কখনও কাহারও ইচ্ছা হয় তবে প্রণালী অনুসারে কার্য্য

করিতে না জানায় দশ দিন মধ্যে সাক্ষাৎ না হইলেই সে কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে। যিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিবেন তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন। এই পৃথিবীর নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, যিনি সকল সময় সকল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন তিনিই "ঈশ্বর।" তিনি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, কেবল জ্ঞান ও বিচার বলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা চাই। যে জিনিষ আছে তাহা চেষ্টা করিলে অবশ্যই পাওয়া যায়।"

স্বামীজীর এই সকল উপদেশ দিবার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সত্য সত্যই কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়?" তিনি বলিলেন "সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপা হইলেই দর্শন পাওয়া যায়। তুমি কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?" আমি আগ্রহ পূর্ণ হৃদয়ে বলিলাম "প্রভো! তাহা হইলে জীবন সার্থক হয় আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবানকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিয়াছি। ভগবান না হইলে কেহ ভগবান দেখাইতে পারেন না।" তিনি বলিলেন "অদ্য রাত্রে তোমার সে আশা পূর্ণ করিব। এক্ষণে বেলা হইয়াছে বাসায় যাও।" তাঁহার আজ্ঞামত বাসায় আসিলাম। সেই দিবস আর বৈকালে না গিয়া সন্ধ্যার সময় আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বের মত অপর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া

উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট বসিলাম। স্বামীজী বলিলেন "আমার বেদীর নিকট ছোট ঘরে যে কালী মূর্ত্তি আছেন তাঁহাকে দেখিয়া আইস।" আমি যাইয়া দেখিয়া আসিলাম যে পাষাণময়ী মা অচলা বিরাজমানা। আসিয়া তাঁহাকে তাহাই বলিলাম। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মাকে কি এখানে দেখিতে চাও ?" আমি বলিলাম "গুরুদেব ! এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে তাঁহাকে এখানে দেখিব। মাকে দেখা আর জগৎমাতাকে দেখা সমান কথা। আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া দেখাইলে কৃতার্থ হই।"

আমাকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল, এবং মাকে ডাকিলেন, আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে একটী কুমারী বালিকার ন্যায় সেই পাষাণময়ী মা ধীর পদ বিক্ষেপে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অস্পষ্ট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর জড়ীয়গতি এবং রূপের ছটা দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলাম। মনে সাধ হইল প্রণাম করিয়া একবার মা বলিয়া ডাকি এবং মনে করিতে লাগিলাম যে নিকটে গুরুদেব ও সম্মুখে জগৎমাতা এই সময় যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। আনন্দে ও ভয়ে অন্তঃকরণের কথা ফুটিল না। আমি জড়বৎ হইয়া রহিলাম, অচেতন পাষাণ সচেতন হইল কিন্তু আমি সচেতন হইয়াও অচেতন হইলাম। স্বামীজী আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিলেন তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া

সেই স্থানে মায়ের মূর্ত্তি আছে কিনা দেখিয়া আইস। আমি কম্পিতপদে ও ভয় বিহ্বলচিত্তে দেখিতে গেলাম বটে কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি আর সেখানে দেখিতে পাইলাম না। আমার আরও ভয় হইল দ্রুতপদে স্বামীজীর নিকট আসিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া মাকে ভাল রূপ দর্শন করিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বের মত সবই ঠিক আছে কেবল জিহ্বা বাহিরে নাই, এবং পদতলে মহাদেবও নাই। বাবার অনুমতিক্রমে মাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জীবন পবিত্র ও সার্থক জ্ঞান করিলাম। মায়ের পা দুখানি মনুষ্য পদের মত নরম তাহা বেশ অনুভব হইল। তাহার পর স্বামীজী আমাকে বলিলেন বেশ করিয়া দেখিয়া লও, যেন পরে আর কোন প্রকার আক্ষেপ করিতে না হয়। আমি স্থিরভাবে দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুদেব মাকে নিজের আসনে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। ছোট মেয়েটীর মত মা ধীর পদ সঞ্চারে গমন করিয়া আবার নিজ আসনে পাষাণময়ী হইয়া বিরাজমানা রহিলেন। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "গুরুদেব! পাষাণ কি প্রকারে চলিতে পারে? যাহা দেখিলাম ইহা অতি অসম্ভব।" তিনি বলিলেন "তোমার জড়দেহ কেমন করিয়া চলে?" আমি বলিলাম "মনুষ্যের দেহে আত্মা ও চৈতন্য আছে সেই জন্য চলিতে ও বলিত পারে।" তাহাতে তিনি বলিলেন "সিদ্ধ সাধকের গুণে যখন মৃত্তিকা পাষাণ বা ধাতুতে

আত্মা ও চৈতন্যের সঞ্চার হয় তখন সেই মূর্ত্তিও চলিতে, বলিতে, শুনিতে ও কার্য্য করিতে পারে।" সেই রাত্রি এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিলেন এবং প্রাতঃকালে একত্রে স্নান করিতে যাইতে হইবে অনুমতি করিয়া তিনি বেদীতে আসিয়া শয়ন করিলেন আমি বাসায় গমন করিলাম।

পর দিন ৬ই মাঘ প্রাতঃকালে উভয়ে একত্রে স্নান করিতে গমন করিলাম। পঞ্চগঙ্গার ঘাটে আমাকে বলিলেন অদ্য রাত্রেও তুমি আসিবে কারণ অদ্য তোমার সমস্ত কার্য্য শেষ হইবে তাহার পর আর তোমাকে রাত্রে আসিতে হইবে না। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল জলে অবস্থিতি করিয়া জল হইতে উঠিলেন। আমি তাঁহার দেহ মুছাইয়া দিলাম ও উভয়ে আশ্রমে আসিলাম। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার আহার প্রস্তুত হইল অম্বা দেবী তাঁহার খাবার আনিয়া দিলেন। আমাকে বাসায় যাইতে অনুমতি করিয়া তিনি আহার করিতে বসিলেন আমিও বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে নিদ্রিত হইলাম, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় সন্ধ্যার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিলম্ব হইল ভাবিয়া দ্রুতপদে আশ্রমে আসিয়া দেবতাগণকে ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। অদ্য দেখিলাম বেদীর উপর স্বামীজীর নিকট চারিখানি কচুরী রহিয়াছে তাহা হইতে আমাকে দুই-খানি খাইতে দিলেন এবং তিনি নিজে দুইখানি খাইলেন। তাহার পর আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ

করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আমিও নিকটে বসিলাম। সহজে যাহাতে আত্মদর্শন হয় তাহার দুই তিন প্রকার প্রণালী বিশেষ-রূপে বুঝাইলেন। তাহার পর বলিলেন "দেখ উমাচরণ! এখন হইতে তুমি বাঁধা পড়িলে, প্রত্যহ নিয়মমত কার্য্য করিবে কোন মতে অবহেলা করিও না, তোমার জন্য যেন আমাকে খাটিতে না হয়। দিবসে সুবিধা না পাইলে সন্ধ্যার সময় করিবে যদি সন্ধ্যার সময় সুবিধা না হয় তবে শেষ রাত্রে কার্য্য করা চাই সময় পাই না বলিলে চলিবে না। যদি তুমি ফাঁকি দাও তাহাও আমি জানিতে পারিব।"

তাহার পর বলিতে লাগিলেন যে "পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবান মনুষ্যকে মনের মত গঠন করিয়া নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। সেই জন্য মনুষ্য যে ভগবানের সমান কার্য্য করিতে পারে, তাহা আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইব, দেখিলেই বেশ জানিতে পারিবে যে মনুষ্যই ঈশ্বর। তিনি আত্মারূপে হৃদয়ে এবং পরমব্রহ্ম রূপে মস্তকে বাস করিতেছেন। আমি নামে যে মনুষ্য দেহ ইহা কিছুই নহে, সমস্তই তিনি এবং সকলই তাঁহার। আমি কিছুই নহি, এবং আমার কিছুই নাই, ইহা সর্ব্বদা মনে করিবে। সম, সৎসঙ্গ, বিচার ও আনন্দ এই চারিটী বিষয়কে সর্ব্বদা সঙ্গী করিবে। ধর্ম্ম বিষয় লইয়া কখন কাহারও সহিত তর্ক করিও না। ধর্ম্ম লইয়া যে স্থানে বচসা হইতেছে দেখিবে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। শুনিয়া থাকিবে মা কালী আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের

বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বল দেখি তিনি কি কখন কোন লোকের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক অথবা নিজের ধর্ম্মে কাহাকেও আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ?”

এই সকল কথা বলিয়া আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন এবং স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন চক্ষু খুলিয়া দেখ এবং বল দেখি আমরা এখন কোথায় আছি ? আমি চারি-দিক চাহিয়া দেখিলাম সে ক্ষুদ্র গৃহ আর নাই, গঙ্গার মধ্যস্থলে একখানি উৎকৃষ্ট নূতন পালঙ্ক ভাসিতেছে, পালঙ্কের উপর শুভ্র বর্ণের গদি, তাহার উপর তোষক, উপরে একখানি উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের চাদর পাতা, তিনদিকে তিনটী বালিশ তাহাও সাদা রঙ্গের ছিল, অতি উৎকৃষ্ট মশারি টাঙ্গান আছে। আর স্বামীজী অবিকল মহাদেবের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, তিনি শয়ন করিয়া আছেন, আর আমি তাঁহার নিকট বসিয়া আছি। যে অবস্থা দেখিলাম তাহাই বলিলাম। তিনি বলিলেন যদি গঙ্গার মধ্যস্থলে হয় তবে গঙ্গায় জল আছে কিনা তাহা দেখ, আমি মস্তক অবনত করিয়া নিজ হস্তে জল উঠাইলাম। মনে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল পাছে পালঙ্ক সহিত ডুবিয়া যাই, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন, আমি আজ্ঞামত তাহাই করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন বল এখন আমরা কোথায় আছি ? আমি চক্ষু খুলিয়া

দেখিলাম আমরা আশ্রমে, তিনি সেই বেদীর উপর শয়ন করিয়া আছেন আর আমি তাঁহার নিকট মেজেতে বসিয়া আছি। আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কি আশ্চর্য্য ভৌতিক ব্যাপার, ইহা কি মনুষ্যে সম্ভবে? বিবেচনা হয় দেবতারও অসাধ্য। তিনি বলিলেন ইহা আশ্চর্য্য কিছুই নহে, মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এত প্রকার ঘটনা দেখাইবার কারণ তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং নিজে এই প্রকার সকল বিষয় আয়ত্বাধীন করিতে পারিবে। এই সকল কথা বলিয়া আমাকে বাসায় যাইবার আদেশ করিলেন। আমি তাঁহার আদেশমত বাসায় গমন করিলাম, আহারাদি করিয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা হইল না, রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

পর দিন ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে মহানন্দে গুরুদেবের সহিত পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া আশ্রমে আসিয়া আমার সেই পূর্ব্বের স্থানে বসিলাম তিনিও বেদীর উপর বসিলেন। যখন লোক সমাগম কমিয়া গেল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম গুরুদেবের এত ক্ষমতা, না জানি ইঁহার যিনি গুরু তাঁহার কত ক্ষমতা। ইঁহাদিগের জীবনী একটু জানা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি কথাটা গ্রাহ্য করিলেন না, বার বার অনুরোধ করাতে তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য মহাত্মা কালীচরণ স্বামীর নিকট জানিতে বলিলেন। তাঁহার সহিত বাবার আশ্রমেই আমার সাক্ষাৎ হয় ও বিশেষ রকম

আলাপ পরিচয় হয়। আমি বাবার জীবনী অর্থাৎ বাল্য অবস্থা হইতে ৺কাশীধামে অবস্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহারই নিকট সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি এক্ষণে হরিদ্বারে আছেন, আমাকেও বিশেষ স্নেহ করেন।

গুরুদেব কম্বল পাতিয়া এবং কম্বল গায়ে দিয়া শয়ন করেন তাহাতে আমার বড় কষ্ট বোধ হইত সেই দিবস আমি বাজার হইতে এক জোড়া আলোয়ান ও একখানি চাদর খরিদ করিয়া আনিয়া আলোয়ান জোড়াটী তাঁহার গায়ে দিয়া দিলাম তিনি আলোয়ান দেখিয়া মহা রাগান্বিতভাবে মুখ গম্ভীর করিয়া আলোয়ান জোড়াটী মেজেতে ফেলিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার শরীর একেবারে শুকাইয়া গেল। দুই হাতে চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইলে আমি তাঁহার গায়ে দিবার জন্য কোন প্রকার কাপড় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন তুমি মনে দুঃখ করিও না, আমাকে একখানা কম্বল আনিয়া দিও, এক্ষণে বেলা হইয়াছে বাসায় যাও। আমি বাসায় যাইয়া আহারাদি করিয়া আশ্রমে আসিবার সময় বাজার হইতে দুইখানি ভাল কম্বল এবং একখানি আসন লইয়া আশ্রমে আসিলাম। তাহা দেখিয়া কিছু বলিলেন না তাহাতে আমার একটু সাহস হইল, একখানি কম্বল বেদীতে পাতিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বেদী হইতে নামিলেন এবং পাতা হইলে অপর কম্বলখানি গায়ে

দিয়া শয়ন করিলেন এবং বলিলেন ইহাই বেশ হইয়াছে। তুমি নিজে আলোয়ান ব্যবহার করিবে তাহা হইলে আমি খুসী হইব। আমি আলোয়ান রাখিলাম। চাদরখানি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে দিলাম। তাঁহার রাগ থামিল আমি রক্ষা পাইলাম। হঠাৎ এই প্রকার রাগ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিলাম।

এই প্রকার দুইবেলা যাতায়াত করিয়া নানা প্রকার উপদেশ শুনিয়া সমস্ত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রমাসের ২৪শে পর্য্যন্ত কাটিল। তাহার পর ২৫শে চৈত্র প্রাতঃকালে যথাসময়ে গুরুদেবের নিকট বসিয়া আছি লোক সমাগম বন্ধ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন "এই সকল ঘটনা যাহা দেখিলে এবং এই সকল কথাবার্ত্তা যাহা শুনিলে তাহা কোন অবিশ্বাসী লোকের নিকট বলিও না। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সংসারে থাকিবে, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিবে। কদাচ আসল কাজ ছাড়িও না। সকল বিষয়ই তোমাকে দেখাইয়া, বুঝাইয়া ও লিখাইয়া দিলাম, তুমি আর এখানে থাকিও না, এই কয়েকটা দিন পরে তুমি চাকরী স্থলে চলিয়া যাও।" সেই সময় আমি আর সংসারে যাইব না তাঁহারই নিকট থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি বলিলেন, "তুমি বিবাহ করিয়া আসিয়াছ আমি কি তাহার ভরণপোষণ করিব ? তোমার আর এখানে থাকা হইবে না।" আমি তাঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক বলিলাম আমার হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এক্ষণে অকাল তাহাও ঘটিবে না

যদি এই সময় যাওয়া না হয় তবে আমার ভাগ্যে ইহজীবনে আর ঘটিবে না। তিনি বলিলেন আগামী সংক্রান্তির দিন প্রাতে অযোধ্যা হইয়া প্রয়াগ গমন করিবে। অযোধ্যায় রামদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তিনি সরযূর ধারে ঝরণার উপর থাকেন এবং প্রয়াগে সুরদাস বাবাজীকে দর্শন করিবে। তাহার পর হরিদ্বার যাত্রা করিও।

এই প্রকারে চৈত্র মাস শেষ হইল। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন আমি স্বামীজীর নিকট অযোধ্যা যাইবার অনুমতি চাহিলাম এবং আর একটী সন্দেহ ভঞ্জনের প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুদেব! দয়া করিয়া আপনি আমাকে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন কিন্তু আমি যে পাপ হইতে মুক্ত হইলাম তাহার কিছু প্রমাণ দেখাইয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া দিন।" তিনি আমাকে বলিলেন "তোমার বিশ্বাসের জন্য বলিয়া দিতেছি তোমার কর-পল্লবের উপরের চর্ম্মস্তর উঠিয়া যাইবে।" বস্তুতঃ হরিদ্বার হইতে মুঙ্গেরে ফিরিয়া আসিলে অনেকেই দেখিয়াছেন যে "চষীপোকা" অথবা "আগুনে বাত" হইলে যেমন চামড়া উঠিয়া যায়, আমার হাতেরও চামড়া সেইরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন "যদি কখন কোন বিষয় সন্দেহ হয় তবে একাকী আমার নিকট আসিও।" আমি বলিলাম হরিদ্বার হইতে ফিরিবার সময় আপনার শ্রীচরণ

দর্শন করিয়া যাইব, অনুমতি দিন, আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে আপনি যেন আমাকে শেষ বিদায় দিতেছেন।" তিনি বলিলেন "ফিরিবার সময় ৺কাশীধামে দুই এক দিন থাকিয়া তাহার পর মুঙ্গের যাইবে।" আমি প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম এবং নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিলাম।

পরদিবস ৩১শে চৈত্র সংক্রান্তির দিন গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকালেই অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। তথায় তিন দিবস থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞামত সরযূর ধারে ঝরণার উপর মহাত্মা রামদাস স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দেখিলাম তিনি ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখের কোন কথা শুনিবার জন্য আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চক্ষু চাহিয়া বলিলেন "কাহে বাবা হামারি পাস বৈঠা হ্যায়? তোমারা কাম্‌তো হো গিয়া।" কেবলমাত্র এই কথা বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আর কোন আশা ভরসা নাই বিবেচনায় আমি চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর দিবস প্রয়াগে গমন করিলাম তথায় সাত দিন থাকিয়া নিজের কাজ কর্ম্ম সমাপনান্তে এক দিবস গুরুদেবের আজ্ঞামত মহাত্মা সুরদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গমন করিলাম। গঙ্গাতীরে যাইতে ময়দানের মধ্যে একটী জল যাইবার সোঁতা আছে তাহার উপর লোক যাতায়াত করিবার জন্য একটী বাঁধ আছে, সেই বাঁধের উপর একপার্শ্বে মহাত্মা

সুরদাস বাবাজী বসিয়া ধ্যানস্থ রহিয়াছেন দেখিলাম। আমরা তিন জনে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আমরা সকলে তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলাম কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। শুনিলাম সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানে শীত গ্রীষ্ম বারমাস দিবা রাত্রি ঐ অবস্থাতে বসিয়া আছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় লড়াই হইবার দিন তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য সিপাহীগণ বিশেষ চেষ্টা ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কিছুতেই তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে না পারায় একখানা টিকা ধরাইয়া তাঁহার দক্ষিণ জানুর উপর স্থাপন করে তাহার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সমাধি ভঙ্গ হয়। আগুন ফেলিয়া দিয়া তিনি সিপাহিদিগকে বলেন "অকারণ আমার উপর অত্যাচার করিতেছ কেন?" সিপাহিরা বলে যে "আপনি স্থানান্তরে গমন করুন এখানে লড়াই হইবে আপনি গোলার আঘাতে মারা যাইবেন। তিনি উত্তর দেন, "অদ্য যদি আমার গোলার আঘাতে মরিবার দিন উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তোমরা কোন মতেই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা লড়াই কর আমার জন্য কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই আমি এইস্থান ছাড়িতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্বের মত সমাধিস্থ হইলেন। সেই ময়দানে লড়াই হইয়া গেল অথচ তাঁহার কিছুই হইল না। দক্ষিণ জানুতে সেই পোড়া দাগ এখনও আছে এবং তিনি এখনও সেইস্থানে সেই অবস্থায় সমাধিস্থ আছেন। দেখিতে

অতিশয় কৃশ, কেবল হাড় কয়েকখানি চামড়াতে ঢাকা আছে মাত্র। সন্ধ্যার সময় আমরা তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর দিবস আগ্রা গমন করিলাম, তথায় তাজমহল, সাজাহান বাদসাহের রাজভবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া মথুরায় গমন করি, তথায় তিন দিবস থাকিয়া বৃন্দাবনধাম গমন করতঃ তথায় সাত দিবস থাকিয়া নিজের কাজকর্ম্ম সমাপনান্তে দিল্লী হইয়া মহাতীর্থ হরিদ্বার যাত্রা করিলাম। তথায় যাইয়া প্রথমে নিজের কাজকর্ম্ম সমাপন করিয়া বাবার দ্বিতীয় শিষ্য মহাত্মা কালীচরণ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার কৃপায় কন্খলে তিন চারিজন বহুকালের মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিলাম। পরদিবস উভয়ে স্নান করিতে গিয়া তিনি গঙ্গার ঘাটে বাবার তৃতীয় শিষ্য মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও চতুর্থ শিষ্য মহাত্মা ভোলানাথ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। হরিদ্বারে প্রায় এক মাস আমরা চারি জনে মহাসুখে অতিবাহিত করিলাম। মহাত্মা কালীচরণ স্বামী ও মহাত্মা ভোলানাথ স্বামীর সহিত আমার বিশেষ প্রণয় হইল। তাঁহারা সর্ব্বদা আমার সংবাদ লইবেন এবং মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিবেন স্বীকার করিলেন।

তাহার পর আমি ৺কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলাম। প্রথমেই আশ্রমে যাইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি বলিলেন তোমার সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়াছে আর এখানে থাকিও না, আগামী কল্য মুঙ্গের যাইতেই চাও।

চাও। তিন মাসের বিদায় লইয়া আট মাস হইয়াছে আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নহে আগামী কল্য অবশ্য অবশ্য যাইবে। তোমার চাকরীর জন্য কোন চিন্তা নাই। তোমার চাকরী মারে কে? এই বলিয়া আমাকে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর মঙ্গলদাস ঠাকুরের নিকট যাইয়া অনেক কথাবার্ত্তার পরে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় লইয়া বাসায় আসিলাম। পরদিবস মুঙ্গের রওনা হইলাম।

যে সময় আমার সহিত মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর এইরূপ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ হয় সেই সময় মাননীয়া (স্বর্গবাসিনী) ম্যাডাম ব্ল্যাড্‌ভ্যাসকি ও কর্ণেল্ অল্‌কট্ বোম্বাই নগরীতে আসিয়া থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটী নামক সভা স্থাপন পূর্ব্বক অদ্ভুত যোগ-শাস্ত্র-বিদ্যার মহিমা প্রচার করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহাদিগের সিদ্ধিশক্তির অদ্ভুত পরিচয় দিতেছিলেন। আমি স্বামীজকে এই বিদ্যাবতী ইংরাজ মহিলার যোগসিদ্ধি কিরূপে হইল তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন এ সব যোগসিদ্ধির ফল নহে, যাহা কিছু শুনিতেছ উহা তাবৎই ইন্দ্রজাল মাত্র, ঐ সমস্ত শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃই তাহার কিছুদিন পরে ম্যাডাম কুলুম নাম্নী একজন খ্রীষ্টীয় মহিলা ব্ল্যাড্‌ভ্যাসকির সহচরী হইয়া তাঁহার মান্দ্রাজ নগরীস্থ গুপ্তগৃহের গুপ্ত ঘটনারাশি

প্রকাশ করিয়া দিল। পৃথিবীর চারিখণ্ডে এই ঘটনা লইয়া মহা গণ্ডগোল হইল ও সংবাদপত্র সমূহে সমালোচিত হইল। তাহার পর হইতেই ম্যাডাম ব্ল্যাভভ্যাসকির আর তাদৃশ কুহকবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্বামীজীর তত্বজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বাগ্‌চী মহাশয়কে ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে (মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা) আমি স্বামীজীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা সমস্ত বলিলাম ও আমার বিষয়ও কিছু কিছু বলিলাম এবং দুইখানি খাতায় কিছু উপদেশ লিখাইয়া দিয়াছেন তাহাও দেখাইলাম। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ও বাগ্‌চী মহাশয় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহারা উভয়ে আমার সহিত ৺কাশীধামে যাইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে বিশেষ জিদ্ করিয়া ধরেন। এই সকল কথা প্রকাশ করিতে স্বামীজী আমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও ইঁহাদিগকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না কারণ ইঁহারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে কথাটা একটু প্রচার হইয়া পড়িল তাহাতে আমি বিশেষ ভীত হইলাম। এক বৎসর পরে আমি এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় উভয়ে ৺কাশীধামে গমন করিলাম। আমার জানা ছিল

সন্ধ্যার পর নির্জ্জন না হইলে স্বামীজীর সহিত কোন কথাই হইবে না সেজন্য আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "দেখ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মনে মনে বড় অহঙ্কার হইয়াছে। তুমি মনে স্থির করিয়াছ পূর্ব্বকালে যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তুমিও সেই শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। সকলে পূজা করে এই তোমার ইচ্ছা। তোমার পায়ের ধূলা লইতে ব্রাহ্মণ তনয়কেও পা বাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ হয় না। তোমার ভবিষ্যৎফল বড় শোচনীয়। তুমি একজন সামান্য মনুষ্যমাত্র, তবে কিছু বক্তৃতা শক্তি আছে। দেখ যখন লোকে লুচি ভাজে প্রথমে লুচি বেলিয়া ঘৃতে ছাড়িয়া দেয়, যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ কল্ কল্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে, তাহার পর যখন পাকে তখন স্থির হইয়া ঘৃতের উপর ভাসিতে থাকে। এক্ষণে তোমার অতিশয় কল্-কলানি হইয়াছে, অগ্রে তোমার কল্কলানি থামুক, তারপর যদি ধর্ম্মের নিকট যাইতে পার। উপস্থিত ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে আছ।" এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না অথবা কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করায় আমরা উভয়ে চলিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন

সেন মহাশয় ৺কাশীধামে মিসির পোকরাতে একটী আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া তথায় থাকিলেন। আমি তিন দিবস পরে মুঙ্গেরে চলিয়া আসিলাম, কারণ স্বামীজী আমাকে থাকিতে দিলেন না। তাঁহার বিষয় প্রকাশ করাতে আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। আমি নিজ অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম "গুরুদেব! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ গুণ আপনা হইতেই প্রকাশ হইতেছে আমি সমস্ত বিষয় প্রকাশ করি নাই, দুই একজনকে না বলিয়া থাকা যায় না।"

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কিছুদিন ৺কাশীধামে মিসির পোকরাতে থাকিয়া হাউজ্ কট্‌রাতে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া তথায় "অন্নপূর্ণা" প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং উক্ত বাটীর "যোগাশ্রম" নাম দিয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত হইলেন।

ইহার এক বৎসর পরে আশ্বিন মাসে ৺পূজার ছুটীতে আমি এবং হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বাগ্‌চী মহাশয় উভয়ে ৺কাশীধাম গমন করিলাম। সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উভয়ে তাঁহার নিকট বসিলাম। স্বামীজী আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ যদুনাথ! তুমি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া খারাপ হইয়া গিয়াছ, এখনও

মন ঠিক করিতে পার নাই। অগ্রে মন স্থির কর, তবে মুক্তির পথ পাইবে। আমার নিকট দীক্ষা লইবার ইচ্ছা করিয়াছ কিন্তু আমি পাঁচটী শিষ্য করিয়াছি, আর কাহাকেও দীক্ষা দিব না, দীক্ষা দেওয়া মহাপাপের কাজ। শিষ্যকে যাহা উপদেশ দেওয়া হয়, সে যদি তাহা না করে তবে গুরুকে সেই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়, না করিলে মহা পাপ হয়। সর্ব্বদা শিষ্যের উদ্ধারের জন্য তাহার প্রতি নজর রাখিতে হয়। আমি আর পাপে লিপ্ত হইব না। তবে আমার ন্যায় উপযুক্ত লোক আমার দ্বিতীয় শিষ্য কালীচরণ স্বামী তোমাকে দীক্ষা দিবেন। দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে তোমার দেহ শুদ্ধ হওয়া উচিত। তাহার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন যে আগামী বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ৺কাশীধামে আসিয়া একটী সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারায় এই কার্য্য সমাধা করিবে।" তাহার পর বলিলেন, "তুমি আফিসের একজন বড় বাবু অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু ২০। ২২ বৎসর হইতে নিরামিষ ভোজন করিতেছ, কিছুদিন পরে তোমার ভয়ানক গাত্র দাহ পীড়া হইবে। যদি শরীর সুস্থ রাখিতে চাও তবে এইবার বাটী যাইয়া মৎস্য আহার করিবে। আর যদি চাকরী ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে মৎস্য ব্যবহার আবশ্যক নাই।" পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ যদুনাথ! গোঁড়া হিন্দু হওয়া ভাল নহে। একদিবস জামালপুরে তোমার নিম্নস্থ কোন এক কর্ম্মচারী প্রস্রাব করিবার সময় ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কাণে পৈতা

দেয় নাই তাহা তুমি হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এত চটিয়াছ যে তাহার উন্নতির পথ বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। ইহাতে বোধ হয় কাণে পৈতা দিবার প্রকৃত কারণ তুমি জান না। পৈতা শুচি ও প্রস্রাব অশুচি, পাছে পৈতায় প্রস্রাবের ছিটা লাগে সেই জন্য দুই তিন ফের কাণে জড়াইয়া লইতে হয়।" বাগ্‌চী মহাশয় উক্ত ঘটনার কথা স্বামীজীর মুখে শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। সেই সময় বাগ্‌চী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সরোজ নাথের উপনয়ন দিবার সময় হইয়াছিল। সরোজ নাথ যাহাতে সৎ ব্রাহ্মণ হয় তাহার বড় ইচ্ছা, সেইজন্য স্বামীজীকে একটী উপনয়নের দিন স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি দিন স্থির করিয়া দিয়া আমাদিগকে বিদায় হইতে আদেশ করিলেন। আমরা উভয়ে প্রণামান্তে বিদায় হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আশ্রমে যাইতেছি, মণিকর্ণিকায় মহাত্মা ভোলানাথ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সহিত একত্র আশ্রমে যাইয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহার নিকট বসিলাম। লোক সমাগম কমিয়া গেলে আমাকে বলিলেন "তুমি আর কখনও কাহাকেও সঙ্গে করিয়া আনিও না। আসিতে ইচ্ছা হইলে একা আসিবে নতুবা আসিও না।" এই কথা বলিয়া আমাকে ভোলানাথ স্বামীর সহিত তাঁহার আশ্রমে যাইতে বলিলেন। আমরা উভয়ে চলিয়া আসিলাম। মহাত্মা ভোলানাথ স্বামী বাবার নিকট জনতা করা উচিত নয়

এবং এই বিষয় অনেক কথা বুঝাইলেন। তিনি আমাকে পূর্ব্ব হইতে খুব ভাল বাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। মুঙ্গেরেও আমার নিকট তিন চারিবার আসিয়াছিলেন। সাত দিন ৺কাশীধামে থাকিয়া বাগ্‌চী মহাশয় ও আমি একত্র মুঙ্গেরে ফিরিয়া আসিলাম।

মুঙ্গেরে আসিয়া বাগ্‌চী মহাশয় তাঁহার দেহ শুদ্ধির জন্য সৎ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। তাহাতে বাগ্‌চী মহাশয় অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ায় চেষ্টা করিলেন কিন্তু ৺কাশীধামে কার্য্য করাইয়া দান গ্রহণ করিতে কেহই স্বীকৃত হইলেন না। ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে বাগ্‌চী মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ক্রমে দিন নিকটে আসিল ব্রাহ্মণের জন্য কার্য্য হইবে না ভাবিয়া একদিন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চারি দিবস থাকিতে ৺কাশীধাম হইতে মহাত্মা ভোলানাথ স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন যতুনাথ ব্রাহ্মণের জন্য বড় কাতর হইয়াছে ৺কাশীতে ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া যতুনাথকে লইয়া যাইবার জন্য মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। পর দিবস বাগ্‌চী মহাশয় মহাত্মা ভোলানাথ স্বামীর সহিত ৺কাশীধামে গমন করিলেন এবং মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সমাধা করিয়া সাত দিন মধ্যে মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় হইতে বাগ্‌চী

মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর অলৌকিক ঘটনা ও অসীম দয়ার বিষয় প্রত্যহই আলোচনা হইত। এই ঘটনার পাঁচ ছয় বৎসর পরে বাবার দ্বিতীয় শিষ্য মহাত্মা কালীচরণ স্বামী বাগ্‌চী মহাশয়ের হালিসহরের বাটীতে আসিয়া তাহাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষা লইবার এক বৎসর পরে তাঁহার ভয়ানক গাত্র দাহ পীড়া হয় সেই সময় আমি দার্জ্জিলিঙ্গে থাকি। তিন মাসের ছুটী লইয়া তিনি আমার নিকট তথায় থাকিয়া সুস্থ হইয়া আইসেন।

কিছুদিন পরে এক দিবস আমি যে ডাক্তারখানায় চাকরী করিতাম সেই ডাক্তারখানার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে "মাষ্টার মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন আমিও তাঁহাকে "মাষ্টার মহাশয়" বলিয়া ডাকিতাম) বলিলেন "উমাচরণ! ছয় শত টাকা তহবিল কম হইয়াছে, মনে করিয়া দেখ দেখি এই টাকা কাহাকেও দেওয়া হইয়াছে কি না?" আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম কাহাকেও ইতোমধ্যে টাকা দেওয়া হয় নাই। ডাক্তারখানাতে দুইটী লোহার সিন্দুক ছিল তাহার চারিটা চাবী, দুটী আমার নিকট ও দুইটী মাষ্টার মহাশয়ের নিকট থাকিত এবং যে ঘরে সিন্দুক থাকিত সেই ঘরে আমি শয়ন করিতাম। আমরা দুইজনে খাতা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম কোথাও কোন ভুল পাইলাম না। তাহাতে আমাদের বিশেষ ভাবনা হইল। উভয়ের মধ্যে, হয় তিনি চোর না হয় আমি চোর, তাহা ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। ইহার মধ্যে সঙ্গত ও অসঙ্গত

দেখিতে গেলে মাষ্টার মহাশয় লইয়াছেন উহা অসম্ভব, আমি লইয়াছি ইহাই সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। ক্রমে এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রায় তিন মাস গত হইল টাকার কোন কিনারা হইল না। আমি ভাবিলাম যদি সাধারণ লোকের মতামত স্থির করা হয় তবে সকলেই একবাক্যে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিবেন। নানা প্রকার ভাবিয়া শেষে স্থির করিলাম কপালে যাহাই থাকুক একবার বাবার কাছে যাইতে পারিলে ইহার বিহিত হইতে পারে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি ৺কাশীধামে গমন করিলাম। আশ্রমে যাইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "কি বাবা ! টাকার গোলমাল করিয়া আসিয়াছ।" আমি বলিলাম 'আজ্ঞা হাঁ টাকার গোলমাল হইয়াছে সেই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন "যেমন তুমি তেমনই তোমার মাষ্টার মহাশয়, অমুক মাসে অমুক তারিখে পাঁচ শত টাকা কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিন শত টাকা নরসিংহ প্রসাদ দত্তকে ও দুই শত টাকা স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। তুমি নিজেই তাহা রেজেষ্টারী করিয়া আসিয়াছ। তাহার রসিদ দুইখানি ডাক্তারখানায় অমুক স্থানে অমুক ফাইলে আছে। টাকা পাইয়া তাহারা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দিয়াছে তথাপি তোমাদের কাহারও ঘুম ভাঙ্গে নাই। খাতায়ও কোন খরচ লেখা হয় নাই। আর

এক শত টাকা তোমার মাষ্টার মহাশয় বাহির করিবেন, কোথায় আছে বা কি হইয়াছে তাহা বলিব না।”

তাহার পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন “তুমি মুঙ্গেরে এই সকল কথা প্রকাশ করায় তথা হইতে মধ্যে মধ্যে লোক আসিয়া আমার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য বড় বিরক্ত করে আমার এখানে থাকা দায় হইয়াছে। তোমার আর মুঙ্গেরে থাকা হইবে না। এই বার মুঙ্গেরে যাইয়া চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার, সিলং, আসাম, এই ঠিকানায় একখানা দরখাস্ত করিবে।” আমি করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ও বলিলাম “আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করি নাই তবে অবশ্য দুই চারি জনকে বলিয়াছি, আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা ও ঘটনা সকল আপনিই প্রকাশ হইতেছে।”

তাহার পর তিনি একটী ভয়ানক দুঃখের কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি বলিলেন “যে আর পাঁচ ছয় বৎসর মধ্যে আমি দেহ ত্যাগ করিব। যেখানেই থাক পূর্ব্বে সংবাদ দিব একবার আসিবে। আর এখানে থাকিও না আগামী কল্য মুঙ্গের যাইবে।”

পর দিবস আমি মুঙ্গের রওনা হইলাম। ডাক্তারখানাতে আসিয়া দেখিলাম বাগ্‌চি মহাশয় ও মাষ্টার মহাশয় উভয়ে তথায় উপস্থিত আছেন। আমাকে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হে উমাচরণ! তিন চারি দিবস হঠাৎ কোথায় গিয়াছিলে?” আমি বলিলাম “টাকার গোলযোগ

ভাঙ্গিতে গিয়াছিলাম।" তাহা শুনিয়া বাগ্‌চী মহাশয় অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি ৺কাশীধামে গিয়াছিলে?" আমি বলিলাম "নতুবা আর কোথায় যাইব?" ইহা শুনিয়া উভয়েই খুব আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তৈলঙ্গ স্বামী কি বলিলেন? আমি সেই রেজেষ্টারী রসিদ দুইখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়া সমস্ত কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম। উভয়েই অবাক্ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বাকি একশত টাকার জন্য মাষ্টার মহাশয়ের একটু সংশয় হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে লোহার সিন্দুক দুইটাতে রং লাগান হইয়াছিল। আমি ৺কাশীধাম হইতে আসিবার আট দশ দিন পরে একদিন রাত্রিতে মাষ্টার মহাশয় টাকা তুলিতে গিয়া আমার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। বাহিরে আমি ও বাগ্‌চি মহাশয় বসিয়াছিলাম, আমরা দুইজনেই দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন সেই একশত টাকা পাওয়া গিয়াছে, এই দেখ একখানা একশত টাকার নোট কি প্রকারে সিন্দুকের ভিতর রঙ্গে আটকাইয়াছিল, এই বলিয়া রংমাখা নোটখানি আমার হাতে দিলেন আমরা তাহা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য হইলাম।

আমার মুঙ্গের ছাড়িয়া কোথাও যাইবার ইচ্ছা না থাকাতে মুঙ্গেরে আসিয়া আমি আসামে দরখাস্ত করি নাই। তাহার পর এক বৎসর পরে আসামে চিফ ইঞ্জিনীয়ারের নিকট হেলায়

একখানা দরখাস্ত করিলাম। দশ বার দিন মধ্যেই ৫০৲ টাকা বেতন ও ১৫৲ টাকা ভাতা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাবওভার-সিয়ার পদে নিযুক্ত করিয়া একখানি নিয়োগ পত্র আসিল। তাহাতে শিবসাগর যাইবার হুকুম দেওয়া ছিল। নিয়োগ পত্র পাইয়া এবং মুঙ্গের ছাড়িয়া অনেক দূর যাইতে হইবে ভাবিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। কয়েক দিবস চিন্তা করিয়া শেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। মাষ্টার মহাশয়কে ডাক্তারখানার এবং টাকার তহবিল্ উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবার কথা বলিলাম। তিনি ও অন্যান্য সকলেই আমাকে বলিলেন "তোমার কাছে বুঝিয়া লইবার কিছু নাই তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না। বর্ত্তমান মাহা হইতে আমরা তোমায় ৫০৲ টাকা দিব তোমাকে ছাড়িব না।" আমি তাহাতে রাজী হইলাম না, মধ্যে মধ্যে যাইবার জন্য বলি, কিন্তু কিছুতেই তাহারা সে কথা গ্রাহ্য করেন না। এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল এদিকে আসাম হইতে দুইখানা টেলিগ্রাম আসিল। "যদি যাওয়া না হয় তবে জবাব দিবে" বলিয়া আর একখানা টেলিগ্রাম আসিল। এদিকে মাষ্টার মহাশয় ও অন্যান্য সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন আমাকে কোন মতেই ছাড়িবেন না এবং আমাকেও অনেক বুঝাইলেন। আমার কি করা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ৺কাশীধামে গমন করিলাম এবং বাবাকে সমস্ত জ্ঞাত করিলাম। তিনি বলিলেন তোমাকে তথায় যাইতেই

হইবে। মুঙ্গেরে আর থাকা হইবে না। তাহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যদি পুনরায় মুঙ্গেরে যাই তবে যাওয়া শক্ত হইবে; ইহা ভাবিয়া আর মুঙ্গেরে না যাইয়া বাটী চলিয়া আসিলাম। আট দশ দিন বাটীতে থাকিয়া শিবসাগর যাত্রা করিলাম।

বাটীতে আট দশ দিবস থাকিবার প্রধান কারণ আসাম যাইলে শীঘ্র বাটী আসিতে পাইব না ভাবিয়া পুর্ব্বজন্মের হাতের লেখা সেই শ্লোক তিনটী দেখিবার চেষ্টা করিলাম। সেই গ্রামে গমন করিয়া বাটীর কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করিলাম বটে কিন্তু মনের কথা বলিতে সাহস হইল না অগত্যা ফিরিয়া আসিলাম। কি উপায়ে দেখিব তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টায় রহিলাম। শিবসাগরে এক বৎসর থাকিবার পর আমাকে গোলাঘাট বদলি করিল। তাহার ৩।৪ মাস পরে রুড়কী কলেজ হইতে এক যুবক ওভারসিয়ার হইয়া গোলাঘাটে আসিলেন। আমরা উভয়ে এক বাসায় থাকিলাম। সেইজন্য আমাদের উভয়ে বিশেষ প্রণয় হইল। ঘটনাক্রমে আমার পূর্ব্ব জন্মের সেই বাটীতে উক্ত যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া তিন মাস মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। ঐ যুবকের সহিত একবার তাহার শ্বশুরালয়ে বেড়াইতে যাইব পরামর্শ হইল কিন্তু বিবাহের এক বৎসর মধ্যেই ঐ যুবক ২০০৲ টাকা বেতনে একেবারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সাগর গমন করিলেন। আমার আশা অনেকটা ভঙ্গ হইল। তাহার পর ঐ যুবককে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার শ্বশুরকে মধ্যে মধ্যে পত্র দিতে আরম্ভ করিলাম।

এইরূপ পত্র দেওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জামাতা আমার একজন বিশেষ বন্ধু। চারি পাঁচখানা পত্র দেওয়ার পর একখানা পত্রের মধ্যে তাহাকে লিখিলাম যে আপনার ভিতর বাটীর দ্বিতলের উপরি দক্ষিণদ্বারী ঘরের দরজার উপর তিনটী ভাল সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে শুনিয়াছি। যদি কোন আপত্তি না থাকে দয়া করিয়া লিখিয়া দিলে চিরদিনের জন্য বাধিত হইব, এইবার যখন বাটী যাইব সেই সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" সেই পত্র পাইয়া তিনি মহা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া শ্লোক তিনটী লিখিয়া পাঠাইলেন। আমি পত্র পাইয়া অবাক্ হইয়া ভাবিলাম যে ঐ যুবককে গোলাঘাটে পাঠান বাবারই এক খেলা! সে তিনটী শ্লোক এই ঃ—

১। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

২। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

৩। নির্ম্মমস্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ

করে সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর আশ্রয় করে। (১)

নদী সমুদয় নানা পথগামী হইলেও পরিণামে যেমন এক সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও উপাসনার পথ পৃথক্ হইলেও পরিণামে ব্রহ্ম প্রাপ্তি সকলেরই শেষ উদ্দেশ্য হয়। (২)

ব্রহ্ম অহঙ্কার ও পরিমাণ শূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, শরীর হীন হইলেও সাধক সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। (২)

অনন্তর ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যখন আমি আসামের গোলাঘাট নামক স্থানে কার্য্য করি তখন স্বামীজী আমাকে পত্র দেন তাহাতে আদেশ করেন "আর একমাস পরে আমি দেহত্যাগ করিব। শিষ্য সেবক সকলকেই সংবাদ দিয়াছি, তোমাকেও দিতেছি, দরখাস্ত করিলেই ছুটী পাইবে, অবশ্য অবশ্য আসিবে।" পত্র পাইয়া আমি তিন মাসের জন্য বিদায় চাহিয়া দরখাস্ত করায় যথা সময়ে তাহা মঞ্জুর হইয়া আসিল। আমি প্রথমে বাড়ী না গিয়া ৺কাশীধামে গমন করিলাম তথায় পৌছিয়া শুনিলাম বাবার দেহত্যাগের আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে। সদানন্দ স্বামী, কালীচরণ স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, ভোলানাথ স্বামী, দুইজন পরমহংস এবং মঙ্গলদাস ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই তথায় উপস্থিত আছেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত আমাদের সকলকে নিকটে ডাকিয়া

বাবা নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন, তাহার পর বলিলেন "আমি শয়ন করিতে পারি এই মাপের একটী সিন্দুক তৈয়ার করিয়া আনিতে হইবে। আমার দেহত্যাগ হইলে ঐ সিন্দুকের মধ্যে আমাকে শয়ন করাইয়া, উপরে স্ক্রু আঁটিয়া এবং তালা বন্ধ করিয়া পঞ্চগঙ্গার সম্মুখে এত পরিমাণ দূরে অমুক স্থানে সিন্দুক সহিত জলে নিক্ষেপ করিবে অন্য সৎকার কিছু আবশ্যক নাই।" দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন বলিলেন আগামী কল্য একখানি নৌকা ভাড়া করিবে, দেহত্যাগের পর ঐ সিন্দুক নৌকায় তুলিয়া প্রথমে অসী হইতে বরুণা পর্য্যন্ত একবার ভ্রমণ করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ সিন্দুক জলে নিক্ষেপ করিবে।" তাহার পর বলিলেন "যদি তোমাদের কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে অদ্য রাত্রিতেই শেষ করিবে আগামী কল্য আমার সহিত কাহারও কোন কথা হইবে না।" রাত্রিতে আমরা সকলেই তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম, অনেকগুলি পরমহংস ও ব্রহ্মচারী দেখা করিতে আসিলেন। যাহার যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল সকলেই জানিয়া লইলেন। অবশেষে আমি করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "গুরুদেব! আমার গতি কি করিলেন? সকলেই তাহাদের নিজের কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন কেবল আমার কিছু হইল না।" তাহাতে তিনি বলিলেন "তুমি কাজ কর্ম্ম যেরূপ করিতেছ সেইরূপ করিবে কদাচ খুঁটী ছাড়িও না।" তাহার পর কালীচরণ স্বামীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি ইহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে কোন মতে

অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে ইহার বাটীতে যাইয়া যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে তাহা করিবে, ইহার গতি মুক্তির ভার তোমার উপর রহিল।"

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী দেহ ত্যাগ করিবেন কাশীতে খুব রাষ্ট্র হইয়া মহা হুল স্থূল পড়িয়া গেল, চারিদিকে সকলের মুখে ঐ কথা, সকলেরই এই ঘটনা দেখিবার ইচ্ছা। পর দিবস সিন্দুক, গদী, বালিশ, চাদর প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়া আনিলাম। নৌকা একখানা ভাড়া করিয়া রাখা হইল। বেলা প্রায় আটটা নয়টার সময় বাবা তাঁহার বেদীর পার্শ্বে সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন "সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দাও যে পর্য্যন্ত আমি দরজায় আঘাত না করিব ততক্ষণ কেহ কোন দরজা খুলিও না।" এই আদেশ করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। আমরা দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় বেলা তিনটার সময় দরজায় আঘাত করিলেন, দরজা খোলা হইল তিনি বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। বাহিরে আসিয়া সিন্দুক নিকটে আনিতে বলিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থির ভাবে, শকাব্দা ১৮০৯ অর্থাৎ বঙ্গীয় ১২৯৪ সালের পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীর দিবস সায়ংকালের প্রাক্কালে ২৮০ বৎসর বয়সে, মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী দেহ ত্যাগ করিলেন। আমরা কয়েক জনে তাঁহাকে সিন্দুকের ভিতর ভাল বিছানায় শয়ন করাইয়া স্ক্রু আঁটিয়া এবং চাবি বন্ধ করিয়া পঞ্চ গঙ্গার ঘাটে নৌকায় তুলিয়া অশীঘাট হইতে

বরুণা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িল, আরও অনেক ভদ্র লোক নৌকা করিয়া এই ঘটনা দেখিবার জন্য অগ্রে পশ্চাতে এবং পার্শ্বে যাইতে লাগিলেন। সমস্ত ঘাট লোকে লোকারণ্য। বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বোপলক্ষে সকলে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে। সায়ংকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সিন্দুক সহিত তাঁহার দেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা হইল। সিন্দুক জলে ডুবিয়া গেল সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও আশা ভরসা সব ফুরাইল। হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল এত দিনের পর আমি বল বুদ্ধি যাহা কিছু সমস্ত হারাইলাম।

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী সর্ব্বদাই লোকের হিতাকাঙ্ক্ষা করিতেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয় মনে করিয়া তাঁহার নিকট মীমাংসা করিতে যাইতেন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতেন। হিন্দুধর্ম্মের চরম ফল আত্মতত্ত্ব নিরূপণ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় আধুনিক হিন্দুগণ প্রায়ই স্বীয় ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর সাধন সিদ্ধ জীবন সেই অভক্তির কারণ উন্মূলিত করিয়া সকলেই শিক্ষা দিতেছে যে তোমরা হতাশ হইও না, শাস্ত্রাদিতে যাহাকে চরম সীমা বলিয়া জানিতে পার চেষ্টা করিলে এখনও তাঁহার মত উক্ত সত্ত্বের অধিকারী হইতে পারিবে। এই সকল অলৌকিক কার্য্য কলাপ ও ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন দেখিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন যে তিনি জীবন্ত ঈশ্বর ছিলেন।

তিনি জগৎকে অধিকারী অনুযায়ী তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং দেব দেবী মূর্ত্তি আদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনের সামর্থ্য অনুসারেই জীব ঈশ্বরের সত্ত্বাকে অনুভব করিয়া থাকে। তৈলঙ্গ স্বামী হিন্দু এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, হিন্দু রীতিতে তাহার পবিত্র জীবন গঠন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মেরই চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি অন্য কোন ধর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করেন নাই। অন্য ধর্ম্মকে বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া শান্ত ভাবে স্বধর্ম্মের সেবা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। মান অপমান সমান জ্ঞান করিতেন সেই জন্য দ্বেষ হিংসা কিছুমাত্র ছিল না তাঁহার কার্য্য কলাপ এবং জ্ঞান, অনুভব করিলে সকলেই মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে।

হে ভারতবাসী হিন্দুসন্তানগণ! তোমরা একবার মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর. তিনি কি প্রকার নিস্বার্থভাবে স্বীয় মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া ছিলেন। তোমার বা আমার উপাস্য দেবতায় এবং তাঁহার উপাস্য পরম ব্রহ্মে কিছুই প্রভেদ দেখিতেন না কারণ ঈশ্বর একটী ভিন্ন দুইটী নাই। তবে সহজ জ্ঞানে ও সন্তুষ্ট মনে যিনি যাঁহার উপাসনা করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন তাহাতে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অথবা ভিন্নাকৃতি দেব দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা করা কাহারও কোন মতে উচিত নহে। মহাত্মা তৈলঙ্গ

স্বামী জগতের সুখ দুঃখের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই, কারণ তাঁহার হৃদয়ে সুখ দুঃখের কোন একটী বৃত্তিই স্বতন্ত্র স্থান পায় নাই। তিনি যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁহার হৃদয়ে সেই পরমানন্দজনক ব্রহ্ম দর্শন সুখ ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না, তিনি তখন জগতকে ব্রহ্মময় দেখিতেন, দুঃখ বলিয়া কোন পদার্থ আছে তাহা তাঁহার জানিবার কোন কারণ থাকিত না। তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া আজীবন একই ভাবে সুস্থ শরীরে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ ২৮০ বৎসর পরমায়ুর মধ্যে তিনি কখনও পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তাঁহার এই অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখই বলুন আর দুঃখই বলুন তিনি আপনভাবে আপনিই মত্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তিই মুল পদার্থ। ভক্তিই ভগবৎ লাভের প্রকৃষ্ট পথ। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর জীবের জীবত্ব নির্ভর করিতেছে। এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় সেই সকল নীতিই তাহাদের সেই জীবত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের জীব ধর্ম্ম। সুতরাং যে সকল শারীরিক মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর জীবের এই জীবত্ব নির্ভর করে তাহাদের চরিতার্থতা ও স্ফুরণই প্রকৃত ভগবৎ ভাব। ভক্তি সেই ভাব স্ফুরণের সাহায্যকারী। বস্তুতঃ ভক্তি হইতে নির্ভরতা জন্মে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা জন্মিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই নিষ্কাম

জ্ঞানের উদয় হয়। নিষ্কাম জ্ঞানের উদয়ই ভগবৎ লাভ।

তিনি বলিতেন মনের স্থূলতায় ঈশ্বরের স্থূলভাব, মনের তনুতায় ঈশ্বরের সূক্ষ্মভাব ও মনের বিলয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন থাকিতে কেহ নিরাকার বা নির্গুণ পদার্থের ধারণা করিতে পারে না। ভাব স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবময় ভগবানের বিবিধ মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। ভাবের ঘনতা হইলেই মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। যিনি মনের বিশুদ্ধ সত্ত্বার সরল ভাবের অধিকারী হইয়াছেন তিনিই প্রেম ও ভক্তির আবেগে ভগবানকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবন্মুক্ত তৈলঙ্গ স্বামীর

তত্ত্বোপদেশ

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োর্বিভিন্নাঃ।
নাঽসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

ঈশ্বর

ঈশ্বর কথাটিতে কোন গুণ বুঝায় কি কোন বস্তু বুঝায় এবং তাঁহাকে জানিবার অথবা প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায় আছে কি না? সকলেই স্বীকার করেন যে ঈশ্বর কথাটিতে সর্ব্বব্যাপী বস্তুই বুঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী, তখন ঈশ্বরের যে স্থান ব্যাপকতা গুণ আছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। একখানি পুস্তক স্থান ব্যাপিয়া আছে এই জন্য তাহাকে সাকার বলি, কিন্তু ঈশ্বর স্থান ব্যাপিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলি ইহার কারণ কি? যে দ্রব্য কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই সকলে সাকার বলিয়া বুঝেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া নাই। এই বিশ্ব যে অনন্ত ও অসীম, ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই, অনন্ত ও অসীম, এই জন্য তিনি নিরাকার।

যদি বল কল্পনায় বিশ্বের একটি সীমা দিতে পারি, কিন্তু ঐ সীমা দিয়া একবার ভাব দেখি, যে ঐ সীমার বাহিরে আর স্থান আছে কি না? ইহা কেহ কখন ভাবিতে পারিবে না, এবং কাহারও বুদ্ধিতে আসিবে না। এই জন্যই বিশ্বের সীমা নাই এবং সেই জন্যই ঈশ্বর নিরাকার। এই বিশ্বে যত স্থান আছে, তত স্থান তিনি ব্যাপিয়া আছেন, এই জন্যই তিনি নিরাকার।

মনুষ্যের জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা এমন কোন বস্তু স্থির করিবার ক্ষমতা নাই যাহা দ্বারা তাঁহার আকারের তুলনা হয়, সুতরাং তাঁহার আকারের তুলনা নাই বলিয়াই তিনি নিরাকার।

ঈশ্বর নির্গুণ কেন? যাঁহার এত গুণ, যাহা বুদ্ধির অগোচর তাহা কি প্রকারে নির্গুণ হইতে পারে? ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই এবং কত প্রকার গুণ তাহারও সীমা নাই। অতুলনীয় গুণ বলিয়াই তিনি নির্গুণ। এই কথাটি অনেকের কাছে নূতন বোধ হইতে পারে, কারণ অসীম কথাটিতে সাধারণতঃ এই প্রকার অর্থ বুঝায়, যে যাহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, তাহাকেই অসীম বলা যায়। এখানে যে অসীম কথাটি ব্যবহার হইয়াছে তাহার অর্থ, যাহার কোন বিশেষ সীমা নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে অন্য কোন গুণ হইতে বিশেষরূপে ভাবা যায়, যে গুণের এমন কোন সীমা নাই তাহাই অসীম গুণ ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ এই জন্য তিনি নির্গুণ। এই জগতে যত প্রকার গুণ আছে, সকলই ঈশ্বরে একমাত্র গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং এই গুণটি তাঁহাতে আছে, এবং তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাঁহাতে নাই, এই কথা কেহই বলিতে পারিবেন না, এই জগতে যত গুণ আছে, সমস্তই তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় গুণের অন্তর্গত, এই জন্য তাঁহার গুণের সীমা নাই, এই জন্য তাঁহার গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না বলিয়াই তিনি নির্গুণ।

ঈশ্বরের রূপ কি প্রকার? এই জগতে যত প্রকার রূপ

আছে সকলই তাঁহার একমাত্র রূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোন প্রকার রূপ নাই, যাহা সেই রূপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি জ্যোতির্ম্ময় আনন্দস্বরূপ বলিয়া, তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হইয়া থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ও দেব দেবী সমস্তই তাঁহার স্থূল রূপ। প্রথমে এই সকল স্থূল রূপ ধ্যান না করিলে সূক্ষ্ম রূপ দর্শনে অধিকার হয় না, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে স্থূল রূপের আশ্রয় লইবেন; ক্রমে তাঁহার অবিনাশী পরম সূক্ষ্ম রূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বরূপ যে কি প্রকার তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। সে রূপের মাধুরী যিনি দেখেন নাই, তাঁহার ত কথাই নাই আর যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার ও লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই, কারণ সেই প্রকার ভাষা নাই এবং সে রূপ দেখিলেই লোকে মোহিত হইয়া বাক্যহীন ও জ্ঞানশূন্য হয়।

ঈশ্বর চেতন কি অচেতন? ঈশ্বর চেতনও নহেন, অচেতনও নহেন, তাঁহার নির্গুণ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ বলা হইয়া থাকে। চেতন গুণ কাহাকে বলে সকলেই তাহা জানেন, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য গুণ কিরূপ, তাহা আমরা অন্তরে ধারণা করিতে অক্ষম। ঈশ্বর বিশ্বরূপ, নিরাকার ও নির্গুণ, তাঁহার আকার ও গুণ সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত। সেই জন্য তাঁহার উপাসনা করাও বড় শক্ত। বাস্তবিক নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ভাবিতে পারি না। ঈশ্বর মনের অগোচর,

যদি কেহ বলেন যে তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন তবে ইহা নিশ্চয় স্থির, যে তিনি নিরাকার শব্দের অর্থও বুঝেন নাই। নিরাকার ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই ভাবা যায় না বলিয়া সগুণ ঈশ্বর ধারণা করিয়া চিন্তা করিতে হয়। সগুণ ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে ততই সেই আত্মার উজ্জ্বলতা অন্তরে উদিত হইবে। তখন মনের সাহায্য ব্যতিরেকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সগুণ ঈশ্বর কাহাকে বলে? ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমা। যিনি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বরে লীন হইয়াছেন এবং তাঁহার আর পরিবর্ত্তন নাই। এই উন্নত মনুষ্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে দেখিতে পান এবং এই উন্নত মনুষ্য দশার চরম আদর্শ পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যরূপে আধারে সমগ্র বিশ্ব যাহাতে একেবারে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে তিনিই সগুণ ঈশ্বর। যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিস্ক্রিয়, যিনি মনুষ্য আকার ধারণ করিয়াও অন্তরে বিশ্বরূপ, যাহার আমি জ্ঞান, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, যিনি আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করেন, সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষই ভগবানের স্বরূপ এবং তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

যদি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লালসা জন্মিয়া থাকে তবে এইরূপ উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে অবিরাম চিন্তা কর। নিজের আমি জ্ঞান এইরূপ মুক্ত আত্মার গুণে মিশাইতে চেষ্টা কর। ক্রমে

দেখিবে চিত্ত নির্ম্মল হইতেছে আর কোথা হইতে কে যেন তোমাকে পথ দেখাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। একই ঈশ্বর ইনি নিগুর্ণ নিরাকার বিশ্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দ তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

আমার চারিদিকে, অন্তরে ও বাহিরে যিনি নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও বরুণাদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতে তৎপর হইতেছেন, যাঁহার সত্তা প্রভাবে আমরা জীবিত রহিয়াছি, যিনি চরণশূন্য অথচ সর্ব্বত্র গমন করেন, কর্ণহীন অথচ মনের কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন, নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেখিতেছেন, অথচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না ; কাম ক্রোধ, লোভ, দুরাশা, বিষয় বাসনা ইত্যাদি প্রতারকগণ যাঁহার সমাগম ভয়ে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে ; জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে অক্ষম, কল্পনা যাঁহার পরিমাণ করিতে অক্ষম, মন ও আত্মা যাঁহার নিকটে গেলে আর ফিরিয়া আসে না, মায়া যাহাকে আবরণ করিতে পারে না, বাক্য যাঁহার ব্যাখ্যা করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর।

যাঁহার আরতি করিবার জন্য চন্দ্র সূর্য্য দীপ জ্বালিতেছে, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, তরু লতা পুষ্পরাশি লইয়া সুগন্ধি দান করিতেছে ; বিহঙ্গ সকল কীর্ত্তন করিতেছে, বজ্র, শঙ্খ নিনাদ করিতেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা, মুক্তি,

যাঁহার পদ সেবা করিতেছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ ধর্ম্ম, যাঁহার দ্বারে প্রহরী রহিয়াছে; যিনি জীবের কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতেছেন, যাঁহাকে লোকে বিস্মৃত হইলেও তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়া নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া জাগ্রত করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন, যিনি নিজে নিগুণ হইয়া ত্রিগুণে ত্রিজগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, অরূপ হইয়া আশ্চর্য্যরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, চৈতন্য স্বরূপ হইয়া জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর।

ব্রহ্ম, জগৎ হইতে অতিরিক্ত কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই তবে যে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সকল দৃশ্য হইতেছে সেই সমুদয় মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যে কোন বস্তু দৃশ্য বা শ্রুত হয় তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, কারণ জ্ঞানোদয় হইলে সেই সমুদয় বস্তুকে অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। জ্ঞানীব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও জ্ঞানরূপ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, জ্ঞানচক্ষু বিহীন ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, যে প্রকার অন্ধ মনুষ্য সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। যিনি সূক্ষ্ম নহেন, স্থূল নহেন হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, জন্ম বিনাশ বিহীন এবং রূপ, গুণ, বর্ণ ও নাম রহিত, নিত্য, একই রূপে পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে ও চতুর্দ্দিকে অবস্থান করেন যিনি পূর্ণ, সত্য, চৈতন্য, আদি, অন্ত রহিত, অদ্বিতীয়, আনন্দময়, তিনিই ঈশ্বর।

যে লাভের পর আর লাভ নাই, যে সুখের পর আর সুখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, যাঁহাতে দৃষ্টি হইলে আর কোন বস্তু দৃশ্য হয় না, যাহা হইলে আর তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, এবং যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই জানিতে হয় না, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি কোন দীপ্যমান বস্তু যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাহার প্রকাশে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশ হয়, যাঁহাদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়; যে প্রকার অগ্নি লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত করে, সেই প্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদয় বস্তুর অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া সমুদয় জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি মনুষ্য, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং রাজা বা ভিক্ষুক নহেন কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী, জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানস্বরূপ; ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ সকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্য্যোদয় লোক সকলের ব্যবহারের কারণ হয়, সেই প্রকার যিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অন্তরেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ, আর সমস্ত উপাধি রহিত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী এবং মনোহর সৃষ্টিকার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন দর্পণ, জল, তৈল, প্রভৃতি বস্তুতে মুখ প্রতিবিম্বের দর্শন হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ বুদ্ধিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব তাহা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি স্বরূপস্থ মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন এবং মনের মন প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, কিন্তু মন, চক্ষু ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন নানা পাত্রস্থ জলে, এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নানা প্রকার হয় সেই প্রকার যিনি স্বয়ং প্রকাশ, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় হইয়াও নানা প্রকার জীবের নানা প্রকার বুদ্ধিতে, নানা প্রকারে কল্পিতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সাধারণ প্রকাশক সূর্য্য এক হইয়াও অনেক চক্ষুর বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন, সেই প্রকার এক হইয়া অনেক বুদ্ধির বিষয়কে, যিনি এককালে প্রকাশ করিতেছেন, সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন চক্ষু, সূর্য্য কিরণ দ্বারা প্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করে, এবং অপ্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করিতে পারে না, সেই প্রকার এক সূর্য্য যে চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রূপাদিকে প্রকাশ করে, সেই সর্ব্বপ্রকার নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও চঞ্চল জলেতে অনেক রূপ দৃষ্ট হয়

কিন্তু স্থির জলেতে একরূপই দেখায়, সেই প্রকার স্বরূপত্ব এক হইয়াও চঞ্চল বুদ্ধিতে নানা প্রকারে প্রতীত হয়েন সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন অতি অজ্ঞান ব্যক্তি স্বয়ং মেঘাবৃত নয়ন হইয়া এই অসম্ভাবিত কথা বলে, যে সূর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া প্রভা শূন্য হইয়াছে, সেই প্রকার অজ্ঞানীদিগের নিকট যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য বদ্ধরূপে প্রতীত হয়েন সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি গভীর নহেন, ধীর নহেন, একমাত্র নির্ব্বাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপ ও পুণ্যবিহীন, যিনি ব্যক্ত, অব্যক্ত, রূপশূন্য এবং সর্ব্বময় তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি এক হইয়াও তাবৎ বস্তুর অন্তরে অন্তর্যামীরূপ হইয়া অবস্থিতি করেন কিন্তু তাবৎ বস্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সেই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

আত্মাকে পৃথিবী বলা যায় না, কারণ পৃথিবীতে গন্ধ গুণ আছে, আত্মায় সে গুণ নাই, আত্মা সেই গন্ধের প্রকাশক। আত্মা জল নহে, কেননা জলে রস গুণ আছে, আত্মাতে তাহা নাই, আত্মা রসের বিজ্ঞাতা। আত্মাকে তেজ বলা যায় না, কারণ তেজে রূপ গুণ আছে, আত্মায় তাহা নাই, তিনি রূপের দর্শক। আত্মাকে বায়ু বলা যায় না, যে হেতু বায়ুর ন্যায় আত্মাতে স্পর্শগুণ নাই, আত্মা স্পর্শ গুণের বিজ্ঞাতা। আকাশকেও আত্মা বলা যায় না, কারণ আকাশে শব্দগুণ

আছে, আত্মায় তাহা নাই, আত্মা শব্দের উচ্চারণ কর্ত্তা। আত্মা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় অনেক, আত্মা এক এবং সর্ব্ব অবস্থাতে এক ভাবাপন্ন। যিনি ভূমি প্রভৃতি হইতে পৃথক্, কেবল নিত্য সর্ব্ব মঙ্গলময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে এবং তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্থান, পরিমাণ, রূপ, বর্ণ, কিছুই নাই, যিনি কোন প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট নহেন, যাঁহার দ্রষ্টা, দৃশ্য, শ্রবণ, শ্রাবা, কিছুই নাই, যে ব্রহ্ম বৃক্ষ স্বরূপ, অথচ তাঁহার মূল, বীজ, শাখা, পত্র, লতা, পল্লব, পুষ্প, গন্ধ, ফল ও ছায়া কিছুই নাই, তিনিই নিত্য জ্ঞানময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি শৌচ, কি সন্ধ্যা, কি মন্ত্র, কি জপ, কি ধ্যান, কি ধ্যেয়, কি হোম, কি যজ্ঞ, যাহার এ সকল কর্ম্মের কিছুই নাই, যিনি উর্দ্ধ নহেন, অধঃ নহেন, শিব নহেন, শক্তি নহেন, পুরুষ নহেন, নারী নহেন, ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, কি গ্রহ, কি তারা, কি মেঘমালা কিছুই নহেন, যিনি চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন যাঁহার উদয় অস্ত কিছুই নাই, যিনি স্বর্গে, নগরে বা ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন না, কি জাতিগত, কি অজাতিগত, যাঁহার কোন ভিন্নতা নাই, যিনি একমাত্র নির্ব্বাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপ পুণ্য বিহীন, সর্ব্বময় চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

আলোকের প্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কিন্তু অন্ধকারের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই প্রকার অজ্ঞানের

নাশ হইলেই, জ্ঞান আপনি প্রকাশ পায়, ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া, তিনিই জীবাত্মা এবং সত্য, চৈতন্য তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্মই সর্ব্ব স্বরূপ জানিবে, কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। আকাশে মেঘ হইতে আকাশের স্বরূপ অনুভব হয় না, মেঘ দূর হইলে, আকাশ আবার পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছ হইয়া থাকে। এই আকাশের অস্তিত্বও আকাশ রূপেই প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চের অবসান হইলে, চিৎ শক্তির স্বাভাবিক সত্তা উদিত হইয়া থাকে। এই সত্তা বা অস্তিত্বও উহা হইতে ভিন্ন নহে। যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই পদার্থ তাহা হইতে কদাচ ভিন্ন নহে। চিৎ স্বরূপ, ইক্ষু রসের মধুরতা, অনলের উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, সর্ষপে তৈল স্বরূপ, চিৎ সত্তাই জগতের সত্তা। জগত সত্তাই চিৎ সত্তার আকার। পল্লবের অন্তরে যেমন শিরা রেখা থাকে, তাহা পল্লব হইতে অভিন্ন হইলেও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম জগৎ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম জগৎ হইতে এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও এই জগৎকে ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন।

রাগ, দ্বেষ, বায়ু, মন, বুদ্ধি, মায়া, আশা, বাসনা, চিন্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেহই দেখিতে পান না। ইহারা অপ্রত্যক্ষ হইলেও ইহাদিগের কার্য্য দেখিয়া প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়। সেই প্রকার ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পান না কিন্তু তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়

সৃষ্টি

বিশ্বপতির বিশ্ব সৃষ্টির অপার কৌশল সাধারণতঃ মনুষ্য বুদ্ধির অতীত হইলেও নিয়মগুলি এত সরল যে অনুশীলন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া মন ভক্তিরসে মগ্ন হয়। জীব সৃষ্টির প্রারম্ভে এই জগতে কেবল পঞ্চ ভূতের ও পরমাত্মার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল, সেই পঞ্চভূতই জীব সৃষ্টির উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হয়। তাহার পর আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপত্তির পরে,, আকাশ ইত্যাদিতে কারণগুণ ক্রমে তারতম্য বিশেষে সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ উৎপন্ন হয়। সেই অবস্থাপন্ন আকাশাদিকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র কহা যায়। এই সকল সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যে শরীর, তাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট শরীর যথা :—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা :—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির সাত্ত্বিক অংশ হইতে

উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সূক্ষ্মশরীর সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মক অর্থাৎ সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। চিত্ত ও অহঙ্কার ইহারা উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। চিত্ত অনু-সন্ধানাত্মক বৃত্তি এবং অহঙ্কার অভিমানাত্মক বৃত্তি। বুদ্ধি ও মন আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা প্রকাশ স্বভাব বলিয়া সাত্ত্বিক অংশের কার্য্য বলা যায়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা :—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, এবং উপস্থ। এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্, আকাশাদির রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্য, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি ,তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ অংশ হইতে পায়ু, এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চ বায়ু যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান;এবং ব্যান। উর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্র স্থায়ী বায়ুকে প্রাণবায়ু বলে। অধোগমনশীল পায়ু আদি স্থানে স্থায়ী বায়ুকে অপান বায়ু বলে। ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান বায়ু বলে। উর্দ্ধ গমনশীল কণ্ঠে স্থায়ী বায়ুকে উদান

বায়ু বলে এবং সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীর স্থায়ী বায়ুকে ব্যান বায়ু বলে।

সাংখ্য মতাবলম্বী লোকেরা কহেন যে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে। নাগ উদ্গিরণকারী বায়ু, কূর্ম্ম চক্ষু উন্মীলনকারী বায়ু, কৃকর, ক্ষুধাজনক বায়ু, দেবদত্ত, হাফিকা জনক, অর্থাৎ হাইতোলা বায়ু এবং ধনঞ্জয় পুষ্টিকারক বায়ু। বৈদান্তিকেরা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে এই নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্ভাব করিয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুই কহেন। এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু আকাশাদি পঞ্চ ভূতের মিলিত রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। গমনাগমন ক্রিয়া স্বভাব বশতঃ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে রজঃ অংশের কার্য্য বলা যায়।

শরীর তিন প্রকার, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। এই তিন প্রকার শরীর মধ্যে পাঁচটী কোষ আছে, যথা :—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।

(১) স্থূল শরীর অন্ন রসে উৎপন্ন হয়, অন্ন রসে বৃদ্ধি পায় ও বিনষ্ট হইয়া অন্নরূপ পৃথিবীতে লয় পায় এই নিমিত্ত তাহাকে অন্নময় কোষ বলে।

(২) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে।

(৩) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলা যায়।

(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত এই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায়। সেই বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ দুঃখ ইত্যাদি অভিমানী ইহলোক পরলোকগামী জীব বলিয়া উক্ত হয়।

(৫) কারণ শরীরে সুষুপ্তি কালে, আত্মা প্রচুর আনন্দ ভোগ করেন এই নিমিত্ত ঐ কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ বলা যায়। সন্তোষই কারণ শরীর।

জীবের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত ও পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা নির্ম্মিত এই স্থূল শরীর সুখ দুঃখের ভোগ স্থান হইয়াছে। অনির্ব্বচনীয় ও অনাদি যে অবিদ্যা, যাহা সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ, তাহাকে কারণ শরীর কহা যায়। যিনি কারণ শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন, তিনিই আত্মা।

যে প্রকার স্ফটিক অতি নির্ম্মল, নীলবর্ণাদি বস্ত্রের যোগে তাহাকে নীলবর্ণাদি বোধ হয়, সেই প্রকার আত্মা অতি নির্ম্মল কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ কোষ প্রভৃতির যোগে তাহাকে যেন তত্তৎ কোষময় প্রভৃতি বলিয়া বোধ হয়।

এই পঞ্চ কোষের মধ্যে জ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তা। ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট মনোময় কোষ করণ। ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট প্রাণময় কোষ কার্য্য। একত্রিত এই কোষত্রয়কে সূক্ষ্ম শরীর কহা যায়। যেমন বনেতে বৃক্ষের অভেদ, বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ নাই।

জলাশয়েতে জলের ভেদ নাই, জলাগত প্রতিবিম্বিত আকাশের সহিত জলাশয়গত প্রতিবিম্বিত আকাশের ভেদ নাই। এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়।

পঞ্চীকরণ ঃ—প্রত্যেক পঞ্চ ভূতকে সমান দুই ভাগ করিবে। পরে সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চ ভূতের প্রত্যেক প্রথম পঞ্চ ভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশ স্বকীয় দ্বিতীয় অর্দ্ধ ভাগের সহিত মিশ্রিত করণ।

এই পঞ্চীকরণকালে আকাশে শব্দগুণ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; জলেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস; পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ উৎপন্ন হয়।

স্থূল শরীর চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ। মনুষ্য পশু প্রভৃতি জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষী সর্পাদি অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। ক্লেদাদি হইতে মশক, উই ইত্যাদি উৎপন্ন হয়! ভূমি হইতে বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সকল প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

জরায়ুজ দেহ তিন প্রকার, পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক। শুক্রের ভাগ অধিক থাকিলে পুরুষ হয়। শোণিতের ভাগ অধিক থাকিলে নারী হয়। শুক্র শোণিত উভয়ের ভাগ সমান থাকিলে নপুংসক হয়। অনন্তর ঋতুকালে পুরুষের স্ত্রী সংসর্গ হইলে জীব শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যুগ্ম দিবসে সংসর্গ হইলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা পুরুষ, অযুগ্ম দিবসে সহবাসে যে সন্তান হয় তাহা নারী। ঋতুস্নাতা নারী যাহার

মুখাবলোকন করিবে সেই ঋতুকালে উৎপন্ন সন্তানের আকার তাহার ন্যায় হইবে অতএব তখন স্বামীর মুখাবলোকন করাই কর্ত্তব্য। তাহার পর পাঁচ দিনে বুদ্বুদাকার হয়। সাতদিনে মাংসপেশীরূপে পরিণত হয় পরে সেই পেশী একপক্ষ মধ্যেই শোণিতাপ্লুত হইয়া থাকে। পঞ্চবিংশতি দিবসে অঙ্কুরাকার হয়। এক মাসে ক্রমে স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, পৃষ্ঠ এবং উদর এই পাঁচটি অঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মাসে হস্ত পদাদি, তৃতীয় মাসে সমুদয় অঙ্গ সন্ধি এবং চতুর্থ মাসে জীব শরীরে রক্ত সঞ্চার হয়। পঞ্চম মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নখশ্রেণী এবং গুহ্য উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠমাসে গুহ্যছিদ্র, স্ত্রী চিহ্ন, পুং চিহ্ন, কর্ণছিদ্র এবং নাভি উৎপন্ন হয়। সপ্তম মাসে কেশ রোমাদি হয়। অষ্টম মাসে জীব গর্ভমধ্যে বেশ বিভক্ত অবয়ব হয়। কেবল দন্ত ও গোঁপ দাড়ি ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত অবয়ব গর্ভ মধ্যেই হয়। নবম মাসে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য লাভ করে। তখন জীব জননীর ভোজন অনুসারে গর্ভ মধ্যেই বাড়িতে থাকে। তাহার পর গর্ভ হইতে বাহির হইয়া মাংস পিণ্ডবৎ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। যতদিন সুষুম্না নাড়ী শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে, ততদিন কথা কহিতে পারে না, গমন করিতেও পারে না। কালক্রমে বালকের সকলই হয়, ক্রমে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া গর্ভযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়।

বাল্যাবস্থা অতিশয় কষ্টকর, কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। ইচ্ছামত কিছুই করা যায় না। সময়ে

সময়ে বিষ্ঠা মাখিয়াও থাকিতে হয়, কোন সুখ নাই। শৈশব কাল তাহা অপেক্ষাও কষ্টকর। সম্পূর্ণ পরাধীন, লেখা পড়া শিখিবার সময় নানা প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়। সকলের নিকটই ধমক ও মার খাইতে হয়। যেমন কাহারও বশীভূত হইতে ইচ্ছা হয় না, তেমনই ঐ সময় সকলেই বশীভূত রাখিতে চায়। কখন পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইতে হয়, কখন ছুরী বা কাটারিতে হাত পা কাটিয়া কষ্ট পাইতে হয়। নানা প্রকার অত্যাচার করিতে ইচ্ছা হয়, সেই জন্য খুব পীড়া ভোগও করিতে হয়।

যৌবন কাল তাহা অপেক্ষাও কষ্টকর, অধঃপাতে যাইবার সময়। কেবলমাত্র দেহের একটু চাক্‌চিক্য হয়। যত প্রকার মন্দ কার্য্য লোকে এই সময় করিয়া থাকে। নানা প্রকার নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, লোভ, চুরি, বিষয়ে আসক্তি, মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ, মোকর্দ্দমা, যাহা কিছু মন্দ কর্ম্ম আছে সমস্ত এই সময় করিয়া থাকে। সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা পার হওয়া সম্ভব কিন্তু যৌবন শান্তভাবে কাটান কোন মতেই সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ লোকেই এমন যত্নের দেহ নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া মাটী করিয়া ফেলে। যিনি ভাল ভাবে কাটাইতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ। লোকে যৌবনে পদার্পণ করিলেই নারীতে আসক্ত হওয়া প্রধান কার্য্য ধারণা করে। যতদিন না স্ত্রীসংসর্গ হয় ততদিন তাহার সংসার অসার, নানা প্রকার বৃথা বৈরাগ্য, জীবনে কোন সুখ নাই বলিয়া মনে হয়।

বিবেচনা করিয়া দেখ রমণীতে কি আছে? পঞ্চভূত লইয়া একটা আকার ভিন্ন আর কিছু নহে। স্তন যুগল তুইটা মাংস পিণ্ড ভিন্ন আর কিছু নহে। সংসর্গ করা নরক ভোগ ভিন্ন আর কিছু নহে। মনুষ্য দেহ মাত্রই বিষ্ঠা ও প্রস্রাব পূর্ণ একটি চামড়ার ভিস্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। মনুষ্য মৎস্য, চিত্ত তাহার জল, বাসনা তাহার সূতা বঁড়িশ, চিন্তা তাহার টোপ্। সংসার তরুণীর প্রতি আসক্ত যুবা, বিন্ধ্য শৈলের গহ্বরে করিণীলোলুপ করীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া অতীব শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। যাহার বাসনা আছে তাহারই ভোগ ও কামনা আছে। বাসনা পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়। জগৎ পরিত্যাগ করিলেই মহা সুখী হওয়া যায়।

যৌবন পূর্ণ হইতে না হইতে জরা আসিয়া যৌবনকে গ্রাস করিয়া বার্দ্ধক্য অবস্থায় আনয়ন করে। জরা আক্রমণ করিলেই লোভ বাড়ে, শ্রীহীন, তেজোহীন ও শক্তিহীন হইয়া চিন্তায় মগ্ন হয়; সেই সময় আত্মীয় লোক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। যত বার্দ্ধক্য বেশী হয় ততই ভাল খাইবার ইচ্ছা বলবতী হয় কিন্তু কার্য্যে তাহা পারে না। সেই সময় নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বে যাহা কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছে সকলই একে একে মনে উদয় হয়, আর কি করিলাম, কি হইবে, কি করা উচিত, পরকালেই বা কি হইবে, এই প্রকার ভাবিয়া অতিশয় ভীত হয় ও শেষে চুপ করিয়া থাকাই

স্থির করে, কারণ এই অবস্থায় নিরুৎসাহ এবং কাতরতা উপস্থিত হয়। বল শক্তি হীন, আহারেও অশক্ত হইয়া দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। শরীরে জরা উপস্থিত হইলে মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়। শ্বাস, কাশ, মূর্চ্ছা, বাত, ভেদ, আমাশয়, ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধির যাতনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যে দেহের এত যত্ন, এত আদর, এত ভালবাসা, আজ সেই দেহ মৃত্যুমুখে পতিত ; আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি সকলই পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতে হইবে ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

দেহের অল্পেই আনন্দ এবং অল্পেই দুঃখ হইয়া থাকে অতএব দেহের ন্যায় নীচ, শোচনীয় এবং গুণহীন আর কিছুই নাই। দেহের সম্বন্ধ আমাতে নাই, আমার সম্বন্ধও দেহেতে নাই ; এই দেহ ও আমি এক নহে। যিনি সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বর সেবায় রত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনি শেষে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হন, আর যিনি বিষয় বাসনায় ও ভোগ বিলাসে মজ্জিয়া যান তাঁহার এ জন্মটা বিফলে যায়। ঈদৃশ সংসারেও যাহাদের অসার সুখ ভাবনা, কালে তাহা-দিগকেও ছেদন করিয়া থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন কোন বস্তু নাই যাহা কালের করাল গ্রাসে পতিত না হয়।

ভগবান্ সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন. শিব প্রধান পুরুষ, শিবা পরমা শক্তি, তত্ত্বদর্শী যোগিগণ তাঁহাকে শিব শক্তি উভয়াত্মক

পরাৎপর পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনিই ব্রহ্মারূপে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই বিষ্ণুরূপে এই সমস্ত জগৎ পালন করেন, আবার তিনিই অন্তকালে শিবরূপে সমস্ত জগৎ সংহার করেন।

এই চারি প্রকার স্থূল শরীর স্থূল ভোগের হেতু জাগ্রত বলা যায়। জাগ্রতকালে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমেতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই পঞ্চ বাহ্য বিষয় সকল অনুভূত হয়।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রমেতে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ এই পঞ্চ বাহ্য বিষয়ের অনুভব হয়।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অহঙ্কার, চৈত্ত এই সকল বিষয় অনুভূত হয়।

তাহার পর জীব শরীরে জীবন বা প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা, আত্মা, পরমাত্মা, বা চৈতন্য এই সমুদয়ই এক চৈতন্য বলিয়া জানিবে। যেমন বৃক্ষ বন ছাড়া নহে, জল জলাশয় ছাড়া নহে, দগ্ধ লৌহখণ্ড আগুন ছাড়া নহে।

জীব চৈতন্যেতে নানা প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিরা নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতি অজ্ঞানী ব্যক্তিরা পুত্রকে আত্মা কহেন, কেহ স্থূল শরীরকে আত্মা কহেন, কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, কেহ প্রাণকে আত্মা কহেন,

কেহ মনকে আত্মা কহেন, কেহ বুদ্ধিকে আত্মা কহেন, কেহ অজ্ঞানকে আত্মা কহেন, কেহ চৈতন্যকে আত্মা কহেন, অনেকে শূন্যকে আত্মা কহেন। এই প্রকারে পুত্র হইতে শূন্য পর্য্যন্ত অতি অজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা আত্মার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পুত্র, স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান বা শূন্য কখনই আত্মা হইতে পারে না। কেবল সত্য স্বরূপ চৈতন্যই মাত্র আত্মা। ঐ সকল যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে পশ্চাৎ ভ্রম নাশ হইলে, সর্প জ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল রজ্জু মাত্র থাকে; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে, অবস্তু রূপ অজ্ঞানাদি জড় বস্তুর ভ্রম; তাহার নাশ হইলে পশ্চাৎ ব্রহ্মমাত্রেরই অবস্থিতি হয়।

তত্ত্বমসি অর্থাৎ তৎ, ত্বং, অসি। তৎ পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য, ত্বং পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য, এই উভয় পদের অর্থ শোধন করতঃ তৎ, ত্বং, অসি, এই বাক্য দ্বারা অখণ্ড চৈতন্য অবগত হইলে, আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ: মুক্ত, সত্যস্বরূপ, পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এইরূপ অন্তঃকরণে উদয় হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে তৎ প্রকাশে অভিন্ন পরব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয়, যেমন প্রদীপের প্রভা সূর্য্য প্রভাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। মনোবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়, কিন্তু প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেহেতু পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অতএব তাঁহার অন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে। সর্ব্বব্যাপী, প্রকাশ

স্বরূপ. জন্ম রহিত, বিনাশ রহিত, অলিপ্ত, সর্ব্বগত, সর্ব্বদা বিমুক্ত স্বভাব তাহাই অদ্বিতীয় চৈতন্য।

মায়াময় অচেতন সত্বঃ, রজঃ এবং তমঃ গুণ ও ইন্দ্রিয়গণ ইহারা সমুদয় কর্ম্ম করে। ঐ গুণ ত্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আত্মা সচেতন হইয়াও কিছুমাত্র করেন না। যে প্রকার লৌহই অচেতন হইয়াও চুম্বক প্রস্তরের নিকটস্থ হইলে গমন করে, সেই প্রকার দেহ মধ্যে সকল অচেতন হইয়াও চৈতন্যের অধিষ্ঠানে স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম করে। যে প্রকার সূর্য্যের প্রকাশে লোক সকল কর্ম্ম করে, কিন্তু সূর্য্য স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না, এবং কাহাকেও কর্ম্মে নিয়োগ করেন না, আত্মাও ঠিক সেই প্রকার জানিবে।

আত্মা স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সদসৎ কর্ম্ম সকলের আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা এইরূপ জ্ঞান করেন। যে প্রকার স্ফটিক স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইয়াও নানাবিধ বর্ণের সন্নিধানে নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইয়াও সত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি স্বভাব ধারণ করে।

যে প্রকার বাষ্পজালে জল ভ্রান্তি, শুক্তিকাতে রৌপ্য ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি, দৃষ্টি দোষে দিক্ ভ্রান্তি, এবং দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য দ্বারা এক চন্দ্র দুই চন্দ্র দেখায়, সেই প্রকার সমুদয় এই জগৎও ভ্রান্তি মূলক হয়। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, কল্পনা, স্বর্গ ও নরক বাস, জন্ম, মরণ, বর্ণ এবং আশ্রম এই

সকল সংসার অবস্থায় হয়; পরমার্থে এ সকল নাই। যে প্রকার এক সূর্য্য সমুদয় জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, সেই প্রকার এক আত্মা সমুদয় উপাধিতে, অর্থাৎ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।

যে প্রকার জলে পতিত সূর্য্যবিম্ব, জল গমন করিলে গমন করে, জল স্থির থাকিলে স্থির থাকে, ইহা সেই প্রকার; অন্তঃকরণ গমন করিলে আত্মা গমন করেন এবং অন্তঃকরণ স্থির থাকিলে আত্মা স্থির থাকেন। যে প্রকার রাহু অদৃশ্য হইয়া চন্দ্র বিম্বে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপী আত্মা অদৃশ্য হইয়াও জীবের বুদ্ধিতে দৃশ্য হন। যে প্রকার নির্ম্মল দর্পণে মনুষ্য স্বীয় রূপ দর্শন করে, সেই প্রকার নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মা আত্মস্বরূপ দর্শন করেন।

পঞ্চ ভূত, ইন্দ্রিয় সকল, বুদ্ধি, মন এবং অহঙ্কার ইহারা মায়া বশতঃ সংসারের সৃষ্টি ও রক্ষা করণে সমর্থ এইজন্য ইহারা ত্যাজ্য কারণ ইহারা কেবল বন্ধনের কারণ। যে প্রকার আকাশ ঘটাদি বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করে, সেই প্রকার পরমাত্মা সমুদয় বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করেন, অতএব তাঁহার বন্ধন কি মোক্ষ অসম্ভব, কিন্তু দেহ এবং আমি এই প্রকার জ্ঞানই বন্ধনের কারণ। যে প্রকার গুড়, শর্করা ও রস এক ইক্ষুরই বিকার মাত্র, সেই প্রকার এক আত্মাতেই নানাবিধ অবস্থা হয়।

পরমাত্মা প্রাণ প্রভৃতি অসংখ্য অবস্থা ভেদে আপনাকে

জালের ন্যায় কখন বিস্তার কখন বা সংহার করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা যেন ক্রীড়া করিতেছেন। প্রথম জাগ্রত অবস্থায় বিশ্ব, দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থাপন্ন তৈজস, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য এবং তৃতীয় সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞান উপাধি বিশিষ্ট সুষুপ্তি অবস্থায় যে চৈতন্য এই তিন প্রকার ভ্রান্ত চৈতন্য দ্বারা ব্রহ্ম চৈতন্য আচ্ছাদিত হইয়া আছেন। এই রূপ জ্ঞানের স্বয়ং আত্মাই বুদ্ধিস্থ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করেন।

যে প্রকার অগ্নি হইতে ধূমের ঊর্দ্ধ গতির দ্বারা আকাশে নানাবিধ আকৃতি প্রকাশ পায় সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপী পুরুষের স্বীয় মায়াতে সৃষ্টি রূপ দ্বৈত বিস্তার প্রকাশ পায়। মন শান্ত হইলে যেন আত্মা শান্ত, মন প্রফুল্ল হইলে যেন আত্মা প্রফুল্ল, এবং মন মুগ্ধ হইলে যেন আত্মা মুগ্ধ হন। আত্মার এ সকল ভাব সংসার অবস্থায় ব্যবহারিক মাত্র, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। যে প্রকার মেঘজনক ধূমের ঊর্দ্ধ গতিতে গগনতল মলিন হয় না সেই প্রকার আত্মা প্রকৃতি বিকারে লিপ্ত হন না। যে প্রকার ধূমাদির মালিন্য দ্বারা এক ঘট মলিন হইলে অন্য ঘট সকল মলিন হয় না, সেই প্রকার এক দেহস্থ জীব মলিন হইলে অপর দেহস্থ জীব মলিন হয় না।

এক ব্যক্তির দোষ গুণে অন্য ব্যক্তি যে লিপ্ত হয় না এই স্থলে এ আশঙ্কা হইতে পারে, আত্মা একই, দুই নহেন, তিনিই সকল দেহে আছেন, কেবল উপাধি গুণের সংসর্গে তাঁহারই

জীব সংজ্ঞা হইয়াছে, তবে এক ব্যক্তির দোষ গুণে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় না কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা এক বটেন কিন্তু আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও উপাধি গুণে কখন লিপ্ত হন না এবং বন্ধন কি মুক্তি তাহার কখনই নাই। এক আত্মার অধিষ্ঠান সকল জীবে থাকাতে যে আত্মাকে জীব ও সকল জীবকে এক বলিয়া বিবেচনা করা ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ভাবাপন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা শুভাশুভ ফল ভোগ ভিন্ন ভিন্ন জীবেরই অবশ্য হইবে, আত্মার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং এক ব্যক্তির দোষ গুণে যে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় না ইহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত।

জীবের কর্ম্মানুসারে আত্মকৃত ফল, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ বা নরক তাহার এই জগতেই ভোগ হইয়া থাকে। নরক ও স্বর্গ পৃথক্ স্থানে নহে। তাহার প্রমাণ আবশ্যক করে না কারণ জীবের অসংখ্য প্রকার কষ্ট পীড়া সুখ দুঃখ ভোগ হইতেছে তাহা সকলেই দৃষ্টি করিতেছেন। স্বর্গ বা নরক অন্য স্থানে হইলে সুখ দুঃখ ইহ জীবনে ভোগ করিতে হইত না এবং পরকাল অর্থাৎ পরজন্মও থাকিত না। জীবন্মুক্ত আত্মার কোনও কষ্ট ভোগ নাই।

মনোবৃত্তির সহিত মানবের অবয়বের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বৃত্তি ও স্বভাব অনুসারে মানবের অবয়বের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব তাহার অবয়ব হইতে শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের অবয়বে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন অনেক

মনুষ্য আছেন যাহারা মানবের বাহ্য দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার স্বাভাবিক ভাব অবধারণ করিতে পারেন। গুণ সকল স্বীয় স্বীয় ভোগের নিমিত্ত দেহে ও ইন্দ্রিয় সকলে নিয়ত ইহারা কর্ম্ম করে। আমি কর্ত্তা নহি কোন বস্তু আমার নহে এইরূপ জ্ঞান হইলে জীব কর্ম্মে বদ্ধ হয় না।

পরমাত্মা এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বের পাতা, আত্মা সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভোগে আবদ্ধ, তাঁহাদের জানিলেই বন্ধন মোচন হয়। সংসার বন্ধন আত্মার নাই। পরমাত্মাকে অনুসরণ করাই মোক্ষ লাভের সেতু। আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। চিরকাল ব্রহ্ম সত্ত্বতে আশ্রয় করিয়া আছেন ও থাকিবেন।

যখন জীবাত্মা উপাধিযুক্ত তখন তিনি জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং যখন উপাধিযুক্ত নহেন তখন একত্র। এই জগতের প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মার অংশরূপে বিরাজমান। আত্মা শুদ্ধ নির্গুণ এবং নির্ম্মল, প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে তিনি অশুদ্ধ সগুণ ও সমল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ভোগ করিতে হয়। আত্মা যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ অধিকার করিয়া থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন তখন আর তাহার সুখ দুঃখ জ্ঞান থাকে না।

বালক শৈশবে যেমন উলঙ্গ থাকে জগতের যখন বাল্য

অবস্থা ছিল তখনকার জগৎবাসীরাও উলঙ্গ থাকিত, বালকের যেমন লজ্জা নাই তখনকার লোকদিগেরও সেই প্রকার লজ্জা জ্ঞান ছিল না।

সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য পাপাত্মাগণকে সংহার করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতার হইয়া সাধু হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের আদর্শ দেখান। কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না কিন্তু ভক্তি ভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক এই বিষয় গুলি পাঠ করিলে পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম ও হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয় সেইরূপ সেই অব্যয় পরমাত্মা হইতে বিবিধ জীবাত্মার সৃষ্টি হয় ও পরিণামে তাহাতেই লীন হয়। সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তে সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় সুতরাং ইহা স্থির যে আত্মা ও জীবাত্মা এক পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়! আত্মা ও জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সর্ব্বদা সংযুক্ত হইয়াই আছেন ইহা জ্ঞানী মাত্রেই বেশ বুঝিতে পারিবেন।

সংসার

সংসার কাহাকে বলে? সকলেই অবগত আছেন আপনি স্বয়ং ও স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসার। আর কিছু অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা কিছু বিষয়াদি করিয়া ইহাদিগকে লালন পালন করাই সংসারের প্রধান কার্য্য। ছোট বড় সমস্ত লোকই সারা জীবন ইহাতেই মোহিত হইয়া রহিয়াছেন, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া কে পিতা, কে মাতা, কে ভ্রাতা, কে আত্মীয় কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, কি জন্য আসিয়াছি, কেনই বা দেহ ধারণ করিয়াছি, কে আনিল, কে আমাকে কোন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন কিছুই না ভাবিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। কখন ধনী, কখন মানী, কখন জ্ঞানী মনে করিয়া উন্মত্ত ও উল্লাস যুক্ত হইতেছেন; কখন শোক, কখন তাপ, কখন রোগ, কখন নিন্দা কখন অর্থ চিন্তায় ক্ষুব্ধ হইতেছেন। কখন শূদ্র, কখন বৈশ্য, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বা ব্রাহ্মণ বর্ণে আপনাকে বরণ করিতে-ছেন। কখন ভোগী, কখন যোগী, কখন ত্যাগী মনে করিয়া আপনাকে নানা অবস্থার অধীন করিতেছেন। কখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পরপীড়নে উত্তেজিত হইতেছেন। কখন লোভ-গ্রস্থ হইয়া পর দ্রব্য অপহরণে ব্যস্ত হইতেছেন; কখন মোহে

অন্ধ হইয়া কাহাকেও আপনার কাহাকেও পর ভাবিতেছেন, কখন বিষয় মদে মত্ত হইয়া জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ ভাবিতেছেন।

মানব তুমি একবার ভাবিয়া দেখ তোমার অহঙ্কার করিবার কি আছে? যাঁহার সমক্ষে পৃথিবী একটি ধুলিকণা, সূর্য্য মণ্ডল একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুল, মহাসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হইতে পারে। তুমি ধুলিকণার একটি সূক্ষ্ম পরমাণুর সামান্য অংশ মাত্র সেখানে আবার তোমার অহঙ্কার কিসের? সত্বঃ রজঃ তমঃ এই তিন স্থূল আবরণে নেত্র আচ্ছাদন করিয়াছ, সূক্ষ্ম রূপ পরিহার পূর্ব্বক স্থূল দেহ ধারণ করিয়াছ, এক্ষণে আর আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। এখনও সময় অতীত হয় নাই এই বেলা আত্মতত্ব নির্ণয় করিয়া চিনিয়া লও তুমি কে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছ।

সকল মনুষ্যকেই "আমার" এই কথাটিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তোমার শিশু অতি রূপবান হইলেও আমার চিত্ত সহসা তত আনন্দিত হয় না যত আমার পুত্র কদাকার হইলেও তাহাকে বারম্বার দেখিয়াও নয়নের তৃপ্তি হয় না। যে কার্য্য তোমার জন্য আমাকে করিতে হইবে তাহা সামান্য হইলেও অতি শ্রমসাধ্য ও ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহা অপেক্ষা শত গুণ কষ্টকর কার্য্য যদি "আমার" এরূপ বোধ হয় প্রাণপণে তাহা সমাধা করিলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না। কোন দ্রব্য তোমার অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয় তবে তাহার

জন্য কিছু মাত্র দুঃখ হয় না কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার বলিবার অধিকার পাই তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না। আজ যাহা তোমার বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি পর দিন তাহাই যদি আমার হয় তবে মুখে আর প্রশংসা ধরে না। এই মায়ারাক্ষস "আমার" শব্দটির কুহক জালে কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া রহিয়াছে। আমি যাহাকে আমার বলি সে আমার হইল না, আমি যে বস্তুকে আমার বোধে যত্ন করি, কালের বশে তাহা কাহার হইবে তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই।

আমার বুদ্ধিই আমায় সর্ব্বনাশ করিল। বাস্তবিক কি তবে আমার কেহ নাই, এখন জানিলাম আমার বলিতে যিনি আছেন আমি তাঁহার হইতে চাহিনা বলিয়া তিনি আমার নহেন। শাস্ত্রে বলে সকলই তাঁহার, আমি ভাবি এ সকল আমার। এই সামান্য ধন, পুত্র, সুখ, দুঃখ, বিষয়, সম্পত্তি আমার বলিতে এত আহ্লাদ হয় যদি একবার সরল চিত্তে, ভক্তিভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার তাঁহাকে আমার বলিতে পারি, না জানি তাহা হইলে কি অপূর্ব্ব আনন্দ হয়।

মানব তুমি বিদ্যাবান হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিতেছ। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত, নানা প্রকার শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করিতেছ, কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইতে পার সে পুস্তক পড়িলে না, পড়িবার ইচ্ছাও নাই, তুমি অন্য লোকের ভাষা, অন্য লোকের ইতিহাস ও জীবনী পাঠ করিতেছ কিন্তু নিজের কি আছে বা নাই তাহা

একবার দেখিলে না, দেখিবার চেষ্টাও নাই। মনুষ্য মাত্রেই এক এক খানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সমস্ত বিষয় জানা যায়। নিজের শরীরের চর্ম্ম, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত ইত্যাদি গঠন, পরিণাম, গতিবিধি যদি ভাল করিয়া বুঝিতে পার তবে দেখিতে পাইবে ভগবান তোমার শরীরকে সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেমন সুরে তালে মিলাইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চ তত্ত্বে পঞ্চ তন্মাত্র গা ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্রিয়গুলি যথা নিয়মে ক্রীড়া করিতেছে। ইহাদিগের একটি বৃত্তির কার্য্য যদি কখন গোলমাল হয় তবে শরীরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। গুরুর সাহায্যে যদি তোমার জীবনগ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিতে ও রচনা করিতে পার তাহা হইলে তোমার ও অপর লোকের বিশেষ উপকার হইবে।

এক একটি মনুষ্য এক এক খানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষা গ্রহণ ইহার বিজ্ঞান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইহার এক একটি পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র ও সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে তাহারা শাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক, যাঁহারা বড় লোক, জমীদার, রাজা বা মহারাজা তাঁহারা ভাল বাঁধাই করা সোণার জলে কাজ করা, মলাট মোড়া এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্প

দিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য্য না করিয়াই দেহত্যাগ করে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক, যাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া মহৎ কার্য্যরাশি অনুষ্ঠান করিয়া যান তাঁহারাই বৃহৎ গ্রন্থ এবং জগতের সকল লোকের আদর্শ ও পাঠের উপযুক্ত।

যাঁহারা অন্যের জীবন ভাল গঠন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন অথচ নিজে কিছু করেন না, তাঁহারা ব্যাকরণ। যাহারা রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভা ও সমাজ গরম করিয়া রাখেন, তাঁহারা ইতিহাস। যাঁহারা জগতের লৌকিক লাভ লোকসান বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা গণিত শাস্ত্র, যাঁহারা জড় জগতের বিষয় চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা ভূগোল। যাঁহারা কেবল রঙ্গ রস, আমোদ প্রমোদ, বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাঁহারা নাটক। যাঁহারা পরোপকার, সত্য, দয়া, নিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মচর্চ্চা ইত্যাদির দ্বারা কাল যাপন করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্র। যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করাই জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করেন, তাঁহারা যোগশাস্ত্র। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকে এক এক খানি গ্রন্থ। যাহাতে আপনার জীবনগ্রন্থ পরিপাটীরূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি সকলের পাঠ্য হও, তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবন চরিত অন্য জীবনে পুনঃ মুদ্রিত হয়, তুমি সেইরূপে আপনার জীবনগ্রন্থ রচনা করিবে। সমস্ত পুস্তকের

শেষে সমাপ্ত, অর্থাৎ মৃত্যু লেখা থাকে, এই কথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

মনুষ্য মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত, কোথায় ছিলাম, কোথায় বা আসিলাম, কি জন্যই বা আসিলাম, আসিয়াই বা তাহার করিলাম কি? এখানে আমাকে কে আনিলেন, কেনই বা আনিলেন, কি রূপেই বা আনিলেন, যে জন্য আনিয়াছেন তাহারই বা কি করিতেছি? এখানে আসিয়া কত কি দেখিলাম কত কি শুনিলাম, কত কি বলিলাম, কত কি ভাবিলাম, দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ত ঠিক করিতে পারিলাম না। এখানে পিতা মাতা পাইলাম, স্ত্রী পুত্র পাইলাম, বন্ধু বান্ধব পাইলাম, ধন জন পাইলাম, সুখ সম্পদ পাইলাম, সমস্তই পাইলাম কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই পাইলাম না। অনেক ভাষা শিখিলাম, অনেক দেশ বেড়াইলাম, অনেক বস্তু দেখিলাম, অনেক লোকের সহিত বাস করিলাম কিন্তু প্রকৃত সুখ কিছুতেই পাইলাম না। মন ও বুদ্ধির প্রণয় হইল না, সর্ব্বদাই তুমুল সংগ্রাম করিতেছে, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির বিবাদ লাগিয়াই আছে। সংসার সাগরে প্রলয় তুফান দিবা রাত্রি হইতেছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সম্প্রদায় লইয়া মতভেদ। সকলেই আপনার মত বাহাল করিতে ব্যস্ত। কেহ বলিতেছে, কেহ শুনিতেছে, কেহ বুঝাইতেছে, কেহ চুপ্ করিয়া তামাসা দেখিতেছে, কেহ আন্দোলন করিতেছে. কেহ শাসন করিতেছে, কেহ পালন করিতেছে, কেহ সিংহাসনে,

কেহ বা ধরাসনে বসিয়া আছে, কেহ কাঁদিতেছে কেহ হাঁসিতেছে কেহ বা অবাক্ হইয়া বসিয়া আছে। সংসারে সকলেই ঘুরিতেছে আর চিৎকার করিতেছে, সকলেই গোলমাল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কেবল মাত্র চিন্তাই বাড়িতেছে, কিন্তু সুখ কিছুতেই পাইলাম না। যেন একটা কোন আসল বস্তুর অভাবে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা দিবা রাত্রি ভোগ করিতে হইতেছে।

যিনি ভগবৎ চিন্তার গভীর সমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন, তিনিই পরম সুখী, তাঁহারই কেবল অন্য ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকে না। গুরু যাঁহাকে চিনিবার জন্য উপদেশ দান করেন, যিনি অন্তরে বাহিরে পশ্চাতে ও সম্মুখে থাকিতেও কেহ ধরিতে পারিতেছে না অথচ তিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। আমি কে তাহার পরিচয় লইলাম না, আমার কে তাহা বুঝিলাম না, তুমি, আমি, তিনি আদি শব্দে কাহাকে নির্দ্দেশ করি, তাহারও তত্ত্ব জানিলাম না। যাঁহার সংসার, যাঁহার সর্ব্বস্ব, যাঁহার আমি, তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ না করিয়া আমি কর্ত্তা হইয়া বসিলাম। যাঁহার নাম করিলে আনন্দ হয়, যাঁহাকে ভাবিলে ভয় ভাবনা দূরে যায়, যাঁহাকে স্মরণ করিলে বিপদ সম্পদ সমান হয়, যাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে জন্ম মরণ জীবকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিলাম না, তবে মানবজন্ম পাইয়া করিলাম কি?

আমি জন্মাবধি সংসার সুখে আসক্ত, কেননা সংসার ভিন্ন

আর কোন সুখের সামগ্রী আমি কখন দেখি নাই। এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নিদারুণ কথা স্মরণ করিলেই চিন্তাসাগরে মগ্ন হইতে হয়। আমি সংসারের দাস হইয়া, সংসারের অনুগত হইয়া, আপনার জীবনকে সুখী মনে করি, আমার প্রাণ অপেক্ষাও সংসারকে ভালবাসি। যখন মনে করি যে এই গৃহ অট্টালিকা, বাগান, পুষ্করিণী, বিষয় সম্পত্তির আমিই একমাত্র অধিপতি, তখন আমার হৃদয়ে আত্মগৌরব আর ধরে না। যখন দেখি আমার রূপবতী যুবতী ভার্য্যা, আমার পুত্র, আমার ভৃত্য, সকলেই বিনীতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যখন দেখি নানা প্রকার যান আমার জন্য সুসজ্জিত, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না। যখন আমার সুখ্যাতি ঘোষিত হইল, রাজদ্বারে সম্মান হইল, শত শত লোকের মুখে আমার প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম, তখন আহ্লাদে মগ্ন হইয়া যাই। সংসারে মোহ নিদ্রায় এই প্রকারে ডুবিয়া থাকি।

যখন মানবের বয়ঃক্রম বেশী হয়, যখন আত্মজ্ঞান হইতে থাকে, যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখন বিষয় সুখের কোমল শয্যা আর ভাল লাগে না! সুখময় সংসার যেন বিষ বোধ হয়। ভোগ বিলাস বিকট বেশে যেন দংশন করিতে থাকে। চিরদিনের আনন্দভূমি তখন নিরানন্দ বোধ হয়। বাসভবন কারাগার তুল্য বোধ হয়। স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পদ্ তাবৎ সামগ্রী একত্র সমবেত হইয়া যেন বন্ধন শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে

বলিয়া বোধ হয়। তখন মনে মনে বলিতে থাকে—সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইব না। যে দেশে সন্ধ্যা নাই, শর্ব্বরী নাই, নিদ্রা নাই, স্বপ্ন নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই আমি সেই দেশে যাইয়া সেই দেশের লোকের সঙ্গে থাকিব। যাঁহার মধুর স্বর, অসীম দয়া, অতুলনীয় স্নেহ, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইব। তখন সমস্ত জীবনে যাহা যাহা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে সকলই মনে উদয় হয় আর আক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিতে থাকে,—দয়াময় হরি! শুনিতে পাই তুমি নাকি দয়া করিয়া ভক্তের প্রতি তাহার সহায় হও, তুমি সাধুদিগের সর্ব্বস্ব ধন. তোমার মহিমা অপার। দীনবন্ধো! যে তোমায় আশ্রয় লয়. তুমি তাহাকে দয়া করিয়া থাক। হে অনাথের নাথ! তুমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না। আমি মহাপাপী, আমাকে অভয় পদে স্থান দাও, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তোমার দর্শন পাইব তাহা আমাকে বলিয়া দাও. কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয় তাহা আমাকে বলিয়া দাও, তোমার আদি অন্ত বোধগম্য হওয়া আমার সাধ্য নহে, দয়া করিয়া আমার আশা পূর্ণ কর।

আপনাকে না জানিয়া না চিনিয়া তুমি কাহার সুখের জন্য ধর্ম্ম সাধন করিবে। কাহার বন্ধন মোচনের জন্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে। প্রথমে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দেখ, তোমার দুঃখ বা বন্ধন আছে কিনা? একবার জাগ্রত হইয়া দেখ, তুমি কোথায়

ও কোন্ অবস্থায় আছ ? সর্ব্বত্রই আত্মসত্তা বর্ত্তমান, সুযোগ সহযোগে যখন আত্মময় জগৎ দেখিবে, তখন প্রত্যক্ষ করিতে ও দেখিতে পাইবে তুমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছ। তখন আর কাহার সংশয় ও ভেদ জ্ঞান থাকিবে না।

সকলেই গুরুর পদে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া একবাক্যে বলুন, গুরুদেব ! অবোধ শিষ্যের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন, আপনি আমার গতি, আপনি আমার মুক্তি, আত্ম মন্ত্রে যাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছেন আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার পূর্ণ সত্তায় নিজ সত্তা বিসর্জ্জন দিতে পারি। যদি তাহাই না পারিলাম তবে মানব জীবন পাইয়া এবং আপনার অভয়পদে শরণাপন্ন হইয়া কি করিলাম।

সংসারে সকলেই অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সংসারে যত কিছু অনর্থ, যত কিছু অনিষ্ট, যত কিছু দুর্ঘটনা সকলের মূল এই অর্থ। অর্থহীন হইলে যত অনিষ্ট, অর্থশালী হইলেও তত অনিষ্ট। অর্থ থাকিলে জগৎ যত ক্ষতিগ্রস্থ, অর্থ না থাকিলেও জগৎ তত ক্ষতিগ্রস্থ ! অর্থই চিন্তার সহোদর। তুমি ধনবান তোমার চিন্তার সীমা নাই, আমার ধন নাই আমার কষ্টের ও চিন্তার অন্ত নাই। তোমার ধন আছে তাহা রক্ষার জন্য, তাহার বৃদ্ধির জন্য তুমি সর্ব্বদাই ভাবিত হইতেছ আমার ধন নাই আমি কি প্রকারে ধনবান হইব কোন উপায় অবলম্বন করিলে অর্থ উপার্জ্জন হইবে, সেই চিন্তায় দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমার চিন্তা পাছে তুমি নির্ধন হও, আমার চিন্তা আমি কিসে ধনবান হই। ইহার সংযোগও

অসহ্য, ইহার বিয়োগও অসহ্য ; ইহা হইতে দূরে থাকিলেও নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থের লীলাভূমি অদৃষ্ট, যাহার যেমন অদৃষ্ট অর্থ তাহার প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। ঈশ্বরই এই অদৃষ্ট লিপির লেখক তিনিই জীবের সুকৃতি অনুসারে এবং পূর্ব্ব জন্মের ফল অনুযায়ী তাহার অদৃষ্টে কর্ম্মফল লিপিবদ্ধ করেন, অর্থ তাহার লিখিত অংশ কার্য্যে পরিণত করে আর কর্ম্মফল প্রদান করে। অর্থ চিরকালই চঞ্চল কখন এক স্থানে তাহার স্থান হয় না। তাহার অগম্য স্থান নাই, লজ্জারও লেশ নাই, সেই জন্য ধোপা বা চণ্ডালকেও আলিঙ্গন করিয়া থাকে। অর্থের হৃদয় নাই, একের সর্ব্বনাশ করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছে আবার তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া অপরের বাসনা পূর্ণ করিতেছে।

এই সামান্য অর্থ ভিন্ন আর এক অর্থ আছে, যাহার তুলনা নাই, যে অর্থ পাইলে আর কোন অর্থ প্রয়োজন হয় না, সেই অর্থই পরমার্থ। মোক্ষ পদ পাইবার জন্য সাধুগণ সংসারের অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। এই পরমার্থই সংসারের সার বস্তু, ইহা অবিনশ্বর, ইহার ফল অনন্ত। পার্থিব ধর্ম্ম ও অর্থ জীবনান্তে লোপ হয়, কিন্তু পরমার্থের ধ্বংস নাই, তাহা আত্মার সহিত গমন করে। যাহার ইচ্ছা ও ভাবনা যেরূপ, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না সুতরাং সে কার্য্যে সিদ্ধি লাভও তাহার অদৃষ্টে ঘটে না। মানব

যখন যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার শুভাশুভ কামনা অবশ্য না করিয়া কখনও সেই কার্য্য করেন না।

ধার্ম্মিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন মুক্তি কামনায়, চোর চুরি করে অর্থ কামনায়, মানব বিবাহ করে পুত্র কামনায়, বালিকা ব্রত করে গুণবান্ স্বামী কামনায়, এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের মূলেই কামনা। কামনা ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, কার্য্য না হইলে সংসার চলে না, সংসার না চলিলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি নাশ হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফল কামনা করা অনভিপ্রেত নহে। তাই বলিয়া সকল কার্য্যের ফল কামনা করা ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যেমন শ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, বিবেকের সাহায্য লইতে হয়। বিবেক সকল মনুষ্যেরই কম বেশী কিছু কিছু আছেই। কার্য্যের গুণাগুণ এই বিবেকের বলে আপনা হইতেই মানবের মনে উদয় হইয়া থাকে। মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের কার্য্যের ভালফল ও বিষময় ফল জানিতে না পারে সেই পর্য্যন্ত তাহারা সেই কার্য্যে রত থাকে। কার্য্যের ফল জ্ঞান হইলে আর সে কার্য্য করে না। কেহ কেহ কোন কোন কার্য্যের মন্দ ফল জানিয়াও তাহা করে ইহার কারণ কেবলমাত্র হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। সকলে এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছেন যে সকাম কার্য্যে স্বর্গ লাভ হয় এবং নিষ্কাম কার্য্যে মোক্ষ লাভ হয়। ভাল মন্দ সকল কার্য্যেরই ফল আছে। ফল থাকিলেই তাহার ভোগ আছে।

সকলেই মনে করেন মনুষ্য স্বাধীন কিন্তু তাহা নিতান্ত ভুল, মানব যদি স্বাধীন তবে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না কেন? যে স্বাধীন সে নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না কেন? মানবের যতটা ইচ্ছা ততটা ক্ষমতা নাই, ইচ্ছা পূর্ণ করিবার বাসনা সত্ত্বেও তাদৃশ শক্তি তাহার নাই কেন? মানবের এই দুর্দ্দশার কারণ কি? আমার প্রাণকে আমি যাইতে বলি না তথাপি সে যায় কেন? যে আমার আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না, বলিলে কথা শুনে না, সে কি আমা হইতে বলবান নহে? এই সুখদুঃখময় সংসারে নিজ ইচ্ছায় আমি নাই। আমি যাইতে চাহিলে যাইতে পারি না। আমার শরীরে যে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে আমার শরীর রক্ষা করিতেছে তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই। মস্তিষ্কের কার্য্য, পরিপাক কার্য্য, শোণিতের কার্য্য ইত্যাদি এই সকলের উপর তিল মাত্র অধিকার নাই। তবে আমি স্বাধীন কিসে? একটু চিন্তা করিলেই বেশ জানা যায় যে আমার শরীর মধ্যে আমা অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন কেহ আছেন, মনুষ্য মাত্রেই সম্পূর্ণ তাঁহারই অধীন। মনুষ্যের শক্তি ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক সেই মহতী অনন্ত শক্তির অধীন। সেই জন্য আমি আমার নহি। তাঁহাকে চিনি না বলিয়া আমাকেও চিনি না, যিনি আপনাকে জানিয়াছেন তিনি ভগবানকেও জানিয়াছেন এবং সংসার যে কি তাহাও বেশ বুঝিয়াছেন। সংসার একটি বৃক্ষ বিশেষ। আশা ঐ সংসার বৃক্ষের মুঞ্জরি স্বরূপ, দুঃখাদি ইহার ফল স্বরূপ,

ভোগ উহার পল্লব, জরা উহার কুসুম এবং তৃষ্ণা উহার শাখা। পরমব্রহ্মই এই জগৎ উৎপত্তির নিমিত্ত উপাদান কারণ। সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কল্পনাই নাই। বহ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন বহ্নিই, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জগৎ ব্রহ্মই। বস্তুতঃ সংসার বা জগৎ নাই, সমস্তই কেবল ব্রহ্ম। যেমন অন্ধকার বিদূরিত হইলে এই দৃশ্য জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনই এই অবস্তু ক্ষয় হইলে যাহা বস্তু তাহা নির্ম্মল রূপে প্রতিভাত হয়।

গুরু ও শিষ্য

গুরু কাহাকে বলে এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কি? গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দের গতি দাতা, র শব্দে সিদ্ধি দাতা এবং উ শব্দে সকলের কর্ত্তা, অতএব ঈশ্বরকেই একমাত্র গুরু বলা যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি নাই। যিনি গতি মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাকেও গুরু বলা যায়, এই কারণে ঈশ্বর ও গুরুতে বিশেষ নাই, আর এই প্রকার গুরুকে সগুণ ঈশ্বর বলা যায়। কেহ কেহ অর্থ করেন, গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে নিবারক, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তাঁহাকে গুরু বলা যায়, অতএব সেই গুরুকে কখন মনুষ্যবৎ মনে করিবে না। গুরু নিকটে থাকিলে অন্য কোন দেবতারও অর্চ্চনা করিবে না। যদি কেহ করে তাহা বিফল হয়। গুরুই কর্ত্তা, গুরুই বিধাতা, গুরু সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন। গুরু এই দুই অক্ষর যাহার জিহ্বাগ্রে থাকে, তাহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার আবশ্যক নাই। গ এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে, মহাপাতক নাশ হয়, উ এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে, ইহ জন্মের পাপ নষ্ট হয় এবং রু এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে, পূর্ব্ব জন্মের পাপ নষ্ট হয়। গুরুই পিতা মাতা এবং একমাত্র গতি, শিব রুষ্ট হইলে, গুরু ত্রাণ করিতে

পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারেন না। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা শাস্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদি গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। যিনি গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান ও তাঁহার তত্ত্ব সর্ব্বদা জপ করেন তিনি কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হন, গুরুই তারকব্রহ্ম স্বরূপ।

গুরু প্রণাম মন্ত্রের অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, নতুবা কেবল উচ্চারণ করিলে কোন ফল হইবে না ভক্তিভাবে কার্য্য করিলে তবে ফল হয়।

১। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

২। অখণ্ডমণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরম্।
তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

৩। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

১। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

২। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান সেই গুরুকে নমস্কার করি।

৩। অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

গুরু দুই প্রকার শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু। গুরুর উপদেশ ব্যতীত সামান্য বৃক্ষ লতারও ভালরূপ পরিচয় জানিতে পারা যায় না। মন, চিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সকলই আর একটি প্রবল শক্তির দ্বারা উত্তেজিত বা পরিচালিত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে শক্তির দ্বারা আমাদের আত্মার উন্নতি হয় ও আমরা মুক্তির দিকে অগ্রসর হই সেই শক্তিই আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র ঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না। এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়ত ধাবিত হইতেছে তিনিই জগৎগুরু। এই জগৎগুরুকে জানিবার জন্য জীবের মন প্রাণ ব্যাকুল হইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই দীক্ষা গুরু, আর জগৎ গুরুর মায়াজাল স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু হইতে বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যন্ত ভিতর বাহির তত্ত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী ইত্যাদি সকলেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। শিখিবার জন্য যেখানেই গমন কর সেই খানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। শিক্ষা দ্বারা জীবের পরমাত্মা দর্শন করিবারও সাহায্য হয়। সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান এবং দীক্ষা দ্বিতীয় সোপান। শিক্ষা দীক্ষার অনুকুল হওয়া চাই।

পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারেন না। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা শাস্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদি গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। যিনি গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান ও তাঁহার তত্ত্ব সর্ব্বদা জপ করেন তিনি কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হন, গুরুই তারকব্রহ্ম স্বরূপ।

গুরু প্রণাম মন্ত্রের অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, নতুবা কেবল উচ্চারণ করিলে কোন ফল হইবে না ভক্তিভাবে কার্য্য করিলে তবে ফল হয়।

১। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

২। অখণ্ডমণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরম্।
তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

৩। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

১। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

২। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান সেই গুরুকে নমস্কার করি।

৩। অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

গুরু দুই প্রকার শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু। গুরুর উপদেশ ব্যতীত সামান্য বৃক্ষ লতারও ভালরূপ পরিচয় জানিতে পারা যায় না। মন, চিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সকলই আর একটি প্রবল শক্তির দ্বারা উত্তেজিত বা পরিচালিত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে শক্তির দ্বারা আমাদের আত্মার উন্নতি হয় ও আমরা মুক্তির দিকে অগ্রসর হই সেই শক্তিই আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র ঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না। এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়ত ধাবিত হইতেছে তিনিই জগৎগুরু। এই জগৎগুরুকে জানিবার জন্য জীবের মন প্রাণ ব্যাকুল হইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই দীক্ষা গুরু, আর জগৎ গুরুর মায়াজাল স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু হইতে বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যন্ত ভিতর বাহির তত্ত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী ইত্যাদি সকলেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। শিখিবার জন্য যেখানেই গমন কর সেই খানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। শিক্ষা দ্বারা জীবের পরমাত্মা দর্শন করিবারও সাহায্য হয়। সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান এবং দীক্ষা দ্বিতীয় সোপান। শিক্ষা দীক্ষার অনুকুল হওয়া চাই।

শিক্ষা বিধি পূর্ব্বক না হইলে দীক্ষা ফলবতী হয় না। এই জন্য শিক্ষা দিবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদ্ গুরুর আবশ্যক। যিনি শিক্ষা তত্ব ও দীক্ষা তত্ত্বকে পৃথক বলিয়া বিবেচনা করেন তিনি শিষ্যকে বিশেষরূপে সুশিক্ষিত করিতে পারেন না। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষার পূর্ব্বাবস্থা। শিক্ষার দ্বারা মনের সংশয় নাশ, যথার্থ জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি হয়। দীক্ষার দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই হইতে পারে না।

গুরু বলিলে প্রায় লোকে দীক্ষা গুরু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। গুরুকে মনে করিলেই তাঁহাকে জগৎ ছাড়া উচ্চ লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। আমাদের মত মনুষ্য বলিতে ভয় হওয়া উচিত। তাঁহার সহিত এক আসনে বসিতে নাই এবং সে সাহস করাও কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার বাক্য বেদবাণী, তাঁহার পাদধৌত জল অমৃত, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, তাঁহার দর্শনে জীবন সফল হয়। তিনি অপার সংসার সমুদ্রে বিচক্ষণ কর্ণধার। এই পবিত্র দীক্ষা গুরুর পদে বরণ করি কাকে? আমাদের দেশে যাঁহারা আজ কাল গুরুগিরী ব্যবসা করিয়া থাকেন, গুরু-দক্ষিণা লাভ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে কেহই সদ্গুরু বলিতে সাহস করিবেন না। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই এই সংস্কারই আমাদের দেশের গুরুগণকে এত দুর্দ্দশাগ্রস্থ

করিয়াছে। দুই এক জন অবশ্য ভাল গুরুও থাকিতে পারেন তাঁহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন যাঁহারা অশিক্ষিত, অসচ্চরিত্র, সাধনা বর্জ্জিত তাহাদের দীক্ষা দিবার কি অধিকার আছে? যিনি নিজেই অন্ধ তিনি অন্যের চক্ষু উন্মীলিত করিতে গিয়া হয়ত শলাকাতে শিষ্যের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া বসিবেন। তাঁহার ত শিষ্যকে চরাচরব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষকে দেখাইবার ক্ষমতা নাই। যিনি নিজেই কখনও দেখেন নাই তিনি অন্যকে কি প্রকারে দেখাইবেন তবে কেবল সদ্‌গুরুর প্রাপ্য প্রণামটা তাঁহারা ফাঁকি দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পৈত্রিক বাগ্ বাগিচা, গৃহ সম্পত্তির ন্যায় তাঁহারা শিষ্য ঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। একবারও মনে ভাবেন না যে দীক্ষা দেওয়া তামাসা নহে। শিষ্যকে সংসার-সিন্ধু পার করিবার গুরুভার তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। ভগবানের সম্মুখে তিনি শিষ্যের জন্য দায়ী। কিছু না জানিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে এই জ্বলন্ত আগুনে হাত দিতেছেন তাহা জানি না। হিন্দু হইয়া শাস্ত্র মানিয়া কি প্রকারে এমন ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না। গুরুর লক্ষণ কি তাহা প্রথমে জানা উচিত তাহার পর দীক্ষা দিবার উপযুক্ত হইলে অবশ্য দিতে পারেন। যিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, কার্য্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম জ্ঞাত, সুভাষী, সুরূপ, বিকলাঙ্গ নহেন, যাঁহার দর্শনে লোকের কল্যাণ হয়, যিনি জিতেন্দ্রিয়,

সত্যবাদী, ব্রহ্মণ্যশীল, ব্রাহ্মণ, শান্তচিত্ত, পিতৃ মাতৃ হিত নিরত, আশ্রমী, দেশবাসী এই রূপ গুণযুক্ত দেখিয়া গুরুপদে বরণ করা উচিত। এই প্রকার গুণবান হইয়া শিষ্যকে দীক্ষা দিলে উভয়েরই মঙ্গল। আজ কাল গুরুগিরী, চাকরী ও ব্যবসার ন্যায় অর্থ উপার্জ্জনের পথ হইয়াছে। কর্ম্ম দোষে গুরু পদকে লঘু করিতেছেন। শিষ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

মন্ত্র দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু এবং শিষ্য অন্ততঃ ছয় মাস বা এক বৎসর একত্র বাস করিবেন। পরস্পর প্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করিলে শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা চাহিবেন তখন গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যের ভব যন্ত্রণা নিস্তারের উপায় তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দীক্ষা দান করিবেন। অনেক সময় শিষ্যের অমতে গুরু বলপূর্ব্বক দীক্ষা দেন কিন্তু তাহা মহাপাপ। উপযাচক হইয়া দীক্ষা দেওয়া কেবল পয়সার লোভ ভিন্ন আর কিছু নহে। শিষ্য করজোড়ে প্রার্থনা না করিলে কোন সদ্‌গুরুই দীক্ষা দিবেন না। শিষ্য মন্ত্র জপ করে কিনা, সাধনে কোন বিঘ্ন হইতেছে কিনা, শিষ্য কতটুকু উন্নতি লাভ করিল গুরুর খবর রাখা আবশ্যক কিন্তু এখনকার গুরুগণ ভুলিয়াও একবার তাহা জিজ্ঞাসা করেন না। শিষ্য কত টাকা বেতন পায়, মাসে উপরি পাওনা কত টাকা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কখন ভুল হয় না। অনেক শিক্ষিত লোকে আজ কাল সেই জন্য কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে চাহেন না। যোগ্য গুরু পাইলেই দীক্ষা লইবার চেষ্টায় থাকেন।

ভাল গুরু না হইলে ঠিক পথ বলিয়া দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ক্ষেত্র অর্থাৎ মনুষ্যের দেহ সকলকার সমান নহে। সেই জন্য সকল লোকের বীজমন্ত্র ঠিক করা বড়ই শক্ত। মহাপুরুষ ব্যতীত হইতেই পারে না। আমাদের কুলগুরু হইতে কিছু পাইবার আশা ভরসা নাই কারণ তাঁহারা নিজেই কোন্ পথে যাইবেন তাহা জানেন না। অন্ধ হইয়া অন্ধকে কেহ পথ দেখাইতে পারে না। সকল সংসারেই দেখা যায়, এক বাটীতে পাঁচটি ছেলে, তাহার কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ পণ্ডিত ; কিন্তু কুলগুরু, চিরকাল সকলেরই ইষ্টদেবতা এক, বীজমন্ত্রও একের যাহা অন্যেরও তাহা কেবল নামের অক্ষর মিলন করণ মাত্র, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন। সেই বীজে শিষ্যের ভাল হউক বা মন্দ হউক তাঁহার যেন কোন দায়ীত্ব নাই। গুরু যে কি বস্তু তাহা তিনি নিজেও জানেন না। শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া বাৎসরিক এক টাকা বা দুই টাকা বার্ষিক পাইলেই আর কোন কথা নাই। দীক্ষা লইয়া শিষ্যের কি উপকার হইল সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যেন ভয় হয়, পাছে শিষ্য কিছু জিজ্ঞাসা করে। প্রথম হইতেই বাঁধা কথা একটা বলিয়া থাকেন—জন্ম জন্মান্তর না হইলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় না, ইহা এক জন্মের কর্ম্ম নহে। পূর্ব্ব জন্ম পর্য্যন্ত এই কথা শুনিয়া আসিয়াছি, এই জন্মেও তাহাই শুনিলাম. পর জন্মেও তাহাই শুনিব, এই প্রকারে জন্মের পর জন্ম চলিয়া যাইতেছে ও যাইবে,

সেইটা যে কোন্ জন্ম তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। আর এই জন্ম যে সেই জন্ম নয়, ও কেন নয়, তাহাও বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই অথচ তাঁহারা গুরু বলিয়া মহা অভিমান করিয়া থাকেন।

চিটা ধান বা আগড়া অথবা পোড়া বীজ জমিতে রোপণ করিলে কখনই অঙ্কুর বাহির হইবে না। সেই জন্য বীজ ঠিক করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বীজ ঠিক করা সদ্‌গুরু ভিন্ন হইতে পারে না। সদ্‌গুরু সহজে মিলে না। দীক্ষা গ্রহণ করা একটি সামান্য কাজ নহে, উপযুক্ত হইলে তাহার পর দীক্ষা লইবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারে উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় না বলিয়া লোকের এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে অল্প বয়স্ক বালকেই দীক্ষা দিয়া থাকে, আবার কোন স্থানে স্ত্রীলোকেও দীক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই অবগত নহেন যে দীক্ষা দেওয়া কি ভয়ানক কাজ। যাঁহারা এই প্রকার গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারাও জানেন না যে দীক্ষা কি জন্য লইতে হয়। পূর্ব্বকালে উপযুক্ত শিষ্য অনেক পাওয়া যাইত, সেই জন্য সদ্‌গুরুও সকলেই পাইতেন। ভগবানকে পাইবার জন্য যদি প্রাণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে, ভগবান স্বয়ং তোমার সহায় হইয়া সদ্‌গুরু মিলাইয়া দেন।

সদ্‌গুরু হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, নিকটে বা সহরে পাওয়া যায় না। ভগবানের জন্য যদি পাগল হয়, তাঁহাকে

পাইবার জন্য যখন বিরহ হয়, তাঁহার দর্শন লালসা যখন খুব বলবতী হয় এবং তাঁহাকে না পাইলে আর কিছুই ভাল লাগে না তখন তাঁহারই কৃপায় সদ্‌গুরুর দর্শন পাওয়া যায়। সৎ শিষ্য না হইলে সদ্‌গুরু কখন পাওয়া যায় না, যেমন শিষ্য তেমনই গুরু সকলের ঠিক তাহাই মিলিবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, দীক্ষা-মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাঁচা হইলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিষ্য যেমন উক্ত লক্ষণযুক্ত দেখিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু পদে বরণ করিবে গুরুও স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন না। শিষ্য পুণ্যবান, ধার্ম্মিক, বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দান ধ্যান পরায়ণ, ধীর স্বভাব এই প্রকার প্রকৃতি না হইলে সে শিষ্যকে কখনও দীক্ষা দিবেন না। অলস, মলিনবেশ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থের উপযুক্ত ব্যয় না করে, রোগী, অসন্তোষ চিত্ত, রাগী, লোভী, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জ্জনে ধনবান, পরস্ত্রীতে রত, অভিমানী, আচারভ্রষ্ট, খল, বহুভোক্তা, দুরাত্মা এবং যে গুরু নিন্দা করে বা শ্রবণ করে ইত্যাদি প্রকার পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে কদাচ শিষ্য করিবেন না। মন্ত্রীর পাপ রাজা, স্ত্রীর পাপ স্বামী এবং শিষ্যের পাপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন।

গুরু যখন শিষ্যের বাটীতে আসিবেন, শিষ্য অগ্রগামী হইয়া তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিবে। তাঁহার

প্রত্যাগমনকালীন পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর গমন করিবে। বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কোন আসনাদিতে বসিবে না। তাঁহার সম্মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা অথবা প্রভুত্ব দেখাইবে না। শিষ্য ও গুরু এক গ্রামবাসী হইলে ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে প্রণাম করিবে, গুরুভবন এক ক্রোশের মধ্যে হইলে প্রত্যহ একবার প্রণাম করিবে, দুই ক্রোশ মধ্যে হইলে মাসে চারি দিবস প্রণাম করিবে, চারি ক্রোশ বা তাহার অধিক হইলে চারি মাস অন্তর যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করা উচিত।

গুরু আজ্ঞা অবশ্য পালন করিবে, তাহা না করিলে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জপ পূজাদি সকলই বৃথা ও নীচগামী হয়। গুরুর সহিত কখন ঋণ দান কিম্বা কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয় করিবে না। গুরুর প্রসাদ যে শিষ্য ভক্ষণ না করে তাহার বিপদ পদে পদে। ভক্তি পূর্ব্বক গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ করিলে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। দীক্ষা লইবার ইচ্ছা করিলেই নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা সর্ব্বতোভাবে পালন করা উচিত।

১। কখন মিথ্যা কথা কহিবে না।

২। কখন কাহারও হিংসা করিবে না।

৩। সকল জীবে সমান দয়া করিবে।

৪। যথাসাধ্য পরোপকার করিবে।

৫। রিপু সকলকে দমন অর্থাৎ আপন বশে আনিবে।

৬। পরশ্রীতে কাতর হইবে না বরং আনন্দিত হইবে।

৭। জ্ঞানকৃত কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিবে না।

৮। বৃথা ও বেশী কথা কহিবে না।

৯। লোভ ও বাসনা একেবারে ত্যাগ করিবে।

১০। কামনা ত্যাগ করিয়া উপাসনা করিবে।

১১। সদা সৎসঙ্গ করিবে।

১২। কোন ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করিবে না, সকল ধর্ম্মই সমান, যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস তাহার তাহাতেই মুক্তি, ভ্রমেও কখন কাহার বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে না।

———

চিত্তশুদ্ধি

হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়। সাকার উপাসনা বা নিরাকার উপাসনা, একেশ্বর বাদ বা বহু-দেব ভক্তি, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তাঁহার কোন ধর্ম্মই নাই। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে তাঁহার আর কোন ধর্ম্মই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্ম্মের সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, ইত্যাদি। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম এবং ইহা হিন্দু ধর্ম্মেই প্রবল। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি হিন্দু নহেন বলা যাইতে পারে।

এই চিত্তশুদ্ধি কি তাহা অনেক প্রকার লক্ষণ ও কার্য্যের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয় সংযম এই বাক্য দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে ইন্দ্রিয় সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস

করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত অর্থাৎ আপন বশে আনিতে হইবে তাহাদের বশে যাইবে না, ইহারই নাম ইন্দ্রিয় সংযম জানিবে। ঔদরিকতা এক প্রকার ইন্দ্রিয়পরতা, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের সংযম করিতে হইলে এমন বুঝিতে হইবে না যে পেটে কখন খাইবে না অথবা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে কিম্বা অর্দ্ধাসন বা কদর্য্য আহার করিয়া দিন যাপন করিবে। শরীর এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের কোন বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয় সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে কেবলমাত্র কোন ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী না হইয়া তাহাদিগকে আপন বশে আনা আবশ্যক আর তাহা হইলে উত্তম আহারাদি অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না থাকে। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয় সংযম। আত্ম রক্ষার্থে বা ধর্ম্ম রক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযম হয় নাই, যে না করে তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্ম্ম রক্ষা আছে তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এমন অনেক লোক আছেন যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করেন নাই। লোক লজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা ঐহিক

উন্নতির জন্য অথবা ধর্ম্মের ভাণে পীড়িত হইয়া তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করেন কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনও স্খলিত পদ না হইলেও তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য্য তাঁহাদিগের হইতে এইরূপ ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়কেই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর যখন ভ্রমেও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কথা মনে আসিবে না, আত্ম রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তাহার অভাবে যোগ অভ্যাস, তপস্যা, উপাসনা, কঠোর কার্য্য সকলই বৃথা।

কেবল যোগ বা তপস্যা করিলে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। কার্য্য ক্ষেত্রেই সংসার ধর্ম্মেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে গমন করতঃ সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয় জয়ী হইয়াছি কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই তাহা যেমন স্পর্শমাত্র টিকে না, তেমনই এই প্রকার ইন্দ্রিয় সংযমও লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল অমনি ঋষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, আর ধৈর্য্য করিতে না পারিয়া নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয়

পরিতৃপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যে দেশে যে দ্রব্য পাওয়া যায় না সেই দেশের লোকে সেই দ্রব্য খায় না বা ব্যবহার করে না, যদি কখন পায় তবে অতি আগ্রহের সহিত খায় বা ব্যবহার করে; তাহাকে ত্যাগ স্বীকার বলে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে আসিয়াছে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে। পরাশর বা বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ ইঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয় সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিব না কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমায় সকলে ভাল বাসিবে, এই বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর আমাকে সকলে ধার্ম্মিক ও মহাত্মা বলিয়া মান্য করুক, তাহারা সর্ব্বদাই এই কামনা করে। যাহাতে এই বাসনা পূর্ণ হয় চিরকাল সেই চেষ্টায় সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকে। সেই জন্য না করে এমন কার্য্য নাই, তাহা ভিন্ন এমন বিষয় নাই যাহাতে মন না দেয়। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট ইহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই

উন্নতির জন্য অথবা ধর্ম্মের ভাণে পীড়িত হইয়া তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করেন কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনও স্খলিত পদ না হইলেও তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মুহুর্ম্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য্য তাঁহাদিগের হইতে এইরূপ ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়কেই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর যখন ভ্রমেও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কথা মনে আসিবে না, আত্ম রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তাহার অভাবে যোগ অভ্যাস, তপস্যা, উপাসনা, কঠোর কার্য্য সকলই বৃথা।

কেবল যোগ বা তপস্যা করিলে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। কার্য্য ক্ষেত্রেই সংসার ধর্ম্মেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে গমন করতঃ সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয় জয়ী হইয়াছি কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই তাহা যেমন স্পর্শমাত্র টিকে না, তেমনই এই প্রকার ইন্দ্রিয় সংযমও লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল অমনি ঋষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, আর ধৈর্য্য করিতে না পারিয়া নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয়

পরিতৃপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যে দেশে যে দ্রব্য পাওয়া যায় না সেই দেশের লোকে সেই দ্রব্য খায় না বা ব্যবহার করে না, যদি কখন পায় তবে অতি আগ্রহের সহিত খায় বা ব্যবহার করে; তাহাকে ত্যাগ স্বীকার বলে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে আসিয়াছে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে। পরাশর বা বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ ইঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয় সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিব না কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমায় সকলে ভাল বাসিবে, এই বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর আমাকে সকলে ধার্ম্মিক ও মহাত্মা বলিয়া মান্য করুক, তাহারা সর্ব্বদাই এই কামনা করে। যাহাতে এই বাসনা পূর্ণ হয় চিরকাল সেই চেষ্টায় সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকে। সেই জন্য না করে এমন কার্য্য নাই, তাহা ভিন্ন এমন বিষয় নাই যাহাতে মন না দেয়। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট ইহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই

নহে। তাহারা ঈশ্বর মানিলেও ঈশ্বর আছেন কি না সে বিশ্বাস নাই, জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগৎ নাই। ইন্দ্রিয় আসক্তির অপেক্ষা এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ও বাসনা ত্যাগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। যখন আপনি যেমন পরও তেমন এই কথা বুঝিব, যখন আপন সুখ যেমন খুঁজিব পরের সুখও তেমনই খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিবে। তাহা না হইলে ডোর কৌপীন ধারণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করতঃ দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া বেড়াইলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে রাজ সিংহাসনে হীরক মণ্ডিত হইয়া উপবেশন করতঃ যে রাজা একজন ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবেন তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ, এই ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির এবং ধর্ম্মের মূল।

চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ হৃদয়ে শান্তি, দ্বিতীয় লক্ষণ পরকে ভালবাসা, তৃতীয় লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ শান্তি, প্রীতি ও ভক্তি যোগ হয় তাহাদের কোন

কামনা থাকে না, অধিক কি তাহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত বাস, সামীপ্য অর্থাৎ সমীপবর্ত্তিত্ব, সাযুজ্য অর্থাৎ আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য, সারূপ্য অর্থাৎ আমার সমান রূপত্ব এবং একত্ব, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা ভগবৎ সেবা ব্যতীত আর কিছু চাহে না। ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত, হিংসা ত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া পূজা বা জপ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ দর্শন, স্পর্শন, স্তব করণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে তাঁহার ভাব চিন্তা করণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করণ, দীনের প্রতি দয়া, আত্মতুল্য ব্যক্তির সহিত মৈত্রতা, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, আত্ম বিষয়ক শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতা, সৎসঙ্গ করণ এবং নিরহংকারিতা প্রদর্শন, এই সকল গুণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় আর সেই সকল লোক বিনা যত্নে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে সেই প্রকার ভক্তি যোগযুক্ত চিত্ত বিনা যত্নে পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে।

তিনি সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতেই অবস্থিত আছেন। জীবে যে পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিত "তাঁহাকে" আপন হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া উপাসনা বা জপ্ করিবে। যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, যাহার আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব না হয়, তাহার ঈশ্বর কি এবং ব্রহ্মময় জগৎ কি প্রকার তাহা অনুভব হইতে পারে

না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তিনি সকল স্থানে অর্থাৎ বনে, গ্রামে নগরে, জলে, স্থলে, শূন্যে, প্রস্তরে এবং সকল প্রাণীতে আত্মার স্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছেন। কেবল মুখে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বলিলে চলিবে না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এই কথা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মময় জগৎ স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা জ্ঞানের সহিত ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী বলেন তাঁহারা ব্রহ্মময় জগৎ কি প্রকার বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ঈশ্বর যে কি পদার্থ এবং তাঁহার আকারই বা কি প্রকার, আর কি করিলে বা কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা প্রথমে ধারণা বা দৃষ্ট হয় না কেবল বুঝিয়া লইতে হয়। বুঝিতে চেষ্টা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া প্রথমে কারণ প্রত্যক্ষ হইয়া পরে দর্শন হয়। তিনি দিবা রাত্রি সম্মুখেই আছেন আমরা অন্তরের সহিত দেখিতে চাইনা বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না।

ধৰ্ম্ম

আজ কাল সৰ্ব্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক কেবল ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এমন পুস্তক, এমন পত্রিকা, এমন প্রবন্ধ নাই যাহাতে ধর্ম্মের হুঙ্কারে লোকের কর্ণে তালা না লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজিকার মনুষ্য সমাজ এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম বড়ই বিরল। সকল লোকের মধ্যে, সকল সম্প্রদায় মধ্যে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষ পূর্ণ, কেবল ভাব চুরি অর্থাৎ ভিতরে এক প্রকার, বাহিরে অন্য প্রকার। যিনি নিজে বলিতেছেন আজ কাল কন্যাদায় বড়ই শক্ত ব্যাপার হইয়াছে ইহা উঠিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক তিনিই নিজের পুত্রের বিবাহের সময় অতি অল্প করিয়া দশ হাজার টাকার কমে ঘাড় পাতেন না। কেবল মুখে ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম করিয়া গগনভেদী রোল হইতেছে। কপটতার এত প্রাদুর্ভাব বোধ হয় পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। মনুষ্য সমাজের এমন দুরবস্থা আর কখনও হয় নাই। মনুষ্য আজ বড়ই অসুখী তাই সুখ দুঃখ তত্ত্ব লইয়া এত ব্যস্ত হইয়াছে।

প্রথমে দেখা উচিত ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল, কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাই বা কে? অনেকেই মনে করিতে পারেন একথার উত্তর বড় সহজ। খ্রীষ্টিয়ান বলিবেন মুসা ও যীশু ধৰ্ম্ম আনিয়াছেন, মুসলমান বলিবেন মহম্মদ

ধর্ম্ম আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন তথাগত ধর্ম্ম আনিয়াছেন, হিন্দু বলিবেন ধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান আনিয়াছেন অর্থাৎ ইহা ভগবান বাক্য এবং ঋষিবাক্য। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম্ম আছে। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে তাহার সংখ্যা নাই, সকলেরই এক একটা ধর্ম্ম আছে। এই জগতে এমন কোন জাতি নাই যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই, তাহাদের ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ? অথচ তাহাদের ধর্ম্মস্রষ্টা কেহ নাই।

যাঁহারা বলেন, যীশু বা মহম্মদ, মুসা বা বুদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহা ভয়ানক ভুল, ইঁহারা কেহই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ইহুদি ধর্ম্ম ছিল, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে। মহম্মদের পূর্ব্বেও আরবে ধর্ম্ম ছিল, ইস্লাম ধর্ম্ম তাহার উপর ও ইহুদি ধর্ম্মের উপর গঠিত হইয়াছে। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার মাত্র। মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বেও এক ইহুদি ধর্ম্ম ছিল, মুসা তাহার উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল আদিম ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল, তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্ম্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইবে না, কারণ সভ্য জাতির ধর্ম্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই ; প্রথম অবস্থা ভিন্ন আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন গাছ কোথা হইতে হইল.

অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায় প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিলে বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের আলোচনা করিলে ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝা যায়।

মনুষ্য যতই অসভ্য হউক না কেন তাহারা সকলেই বেশ বুঝিতে পারে যে শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক সামগ্রী। একজন মানুষ চলিতেছে, কাজ করিতেছে, কথা কহিতেছে, খাইতেছে, সে মরিয়া গেলে আর কিছুই করে না অথচ তাহার শরীর যেমন ছিল তেমনই আছে হস্ত পদাদির কিছুই অভাব নাই কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। তাহার শরীরের একটা কিছু প্রধান বস্তু তাহার আর নাই সেইজন্য সে আর কিছু করিতে সক্ষম হয় না। তাহাতেই অসভ্য লোকেও বুঝিতে পারে যে শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি পদার্থ আছে সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে। সভ্য লোকে ইহার নাম দিয়াছে জীবন অথবা প্রাণ বা আর কিছু অসভ্য লোকে নাম দিতে পারুক আর নাই পারুক সকলেই বেশ জানে ইহা দেহের মধ্যে একটী প্রধান ও স্বতন্ত্র সামগ্রী।

আর একটু বুঝিয়া দেখিলে বেশ জানিতে পারা যায় যে ইহা কেবল জীবের আছে তাহা নহে, গাছ পালারও আছে, গাছ পালাতেও ঐ জিনিসটা যতদিন থাকে, ততদিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, হ্রাস বৃদ্ধি পায়, আর তাহার অভাব হইলে আর ফুল ধরে না, পাতা গজায় না, ফলও ধরে না, গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে।

গাছ পালার সঙ্গে আর জীবের সঙ্গে একটা প্রভেদ এই যে গাছ পালা নড়িয়া বেড়ায় না, কথা কহিতে পারে না, ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারে না। অতএব মনুষ্য এক্ষণে জ্ঞান সোপানে একপদ উঠিল; কারণ বেশ জানিতে পারিল যে জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু পদার্থ আছে, যাহা গাছ পালায় নাই, তাহাকেই সভ্য লোকে চৈতন্য বলিয়া থাকে।

সকলেই দেখিতেছেন মানুষ মরিলে, তাহার শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্চ্ছাদি রোগ হইলে শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। এক্ষণে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে চৈতন্য শরীর ছাড়া একটি স্বতন্ত্র বস্তু। এক্ষণে আরও দেখিতে বা বুঝিতে হইবে, এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক বস্তু হইল তবে এই শরীর না থাকিলে চৈতন্য থাকিতে পারে কি না এবং থাকে কি না। যদি থাকে তবে কোথায় ও কি ভাবে থাকে। মানুষ মাত্রেই প্রত্যহ দেখিতেছেন যে চৈতন্য দেহ ছাড়িয়া যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারে এবং যথা ইচ্ছা তথা থাকিতে পারে। তাহার প্রমাণ স্বপ্ন অবস্থায় শরীর এক স্থানে থাকিল, কিন্তু চৈতন্য আর এক স্থানে বেড়াইতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা প্রকার কার্য্যও করিতেছে। তাহা হইলে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে ইহাতে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীব আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিতে পারে, এই জন্য জীবের চৈতন্য আছে। নিৰ্জ্জীব ইচ্ছা

অনুসারে কার্য্য করিতে পারে না, সেই জন্যই অচেতন। এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বেশ ভালরূপ বুঝিয়াছেন, যে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে এবং এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রথম সোপান। জ্ঞানই ধর্ম্মের মূল, যাহার জ্ঞান নাই তাহার আর ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কি?

জড় পদার্থে চৈতন্য আরোপ করা ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া উপধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। আর উপধর্ম্মই সত্য ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে, মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইয়া কোথা যায়, মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন, যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সেই সময় সচরাচর বৃষ্টি হয় কেন, আবার এক সময় তাহাই বা হয় না কেন? এই সকল আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বৃষ্টির ইচ্ছা, এই জন্য আকাশ, মেঘ ও বৃষ্টিকে সচেতন বলা যায়। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি, ঝড়, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ ও সমুদ্র সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য্য, ইঁহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন শক্তি, জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই আশ্চর্য্য; ইনি জগতের রক্ষক বলিলেও হয়। ইনি যতক্ষণ উদয় না হন ততক্ষণ জগতের কাজ কর্ম্ম সকলই প্রায় বন্ধ থাকে।

এই সকল শক্তিশালী পদার্থের ক্ষমতা দেখিয়াই উপাসনার

উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকেই ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান বলা যাইতে পারে। এই জন্য সর্ব্ব দেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, আকাশাদির উপাসনা করিয়া থাকে। এই জন্য বেদে ইন্দ্রাদি, আকাশ, সূর্য্য, বায়ু, ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা ব্যবস্থা আছে। মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায়ে যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায় সেই প্রকার ধর্ম্মরাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় বা পথ আছে।

অহিংসা, ভক্তি ও ভালবাসা ধর্ম্মের মূল। সর্ব্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক ভালবাসার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেহ কাহাকেও বাস্তবিক অন্তরের সহিত ভালবাসে না। যতদিন না আপন পর সমান বোধ হইবে ও প্রকৃত ভালবাসিতে শিখিবে ততদিন ধর্ম্মের ভাণ করা বৃথা ও বিড়ম্বনা মাত্র। সকলেই অবগত আছেন যে ভালবাসা দুই প্রকার। প্রথম স্বাভাবিক, সম্বন্ধের বলে ভালবাসা যেমন পিতা পুত্রে, স্বামী ও স্ত্রীতে। দ্বিতীয় গুণ দর্শনে, যেমন বন্ধু বান্ধব মধ্যে। যথার্থ ভালবাসার একটি প্রণালী আছে সেই প্রণালীতে ভালবাসিলে তবে সেই মহৎ এবং মনোহর ফল লাভ হইতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া আপনাকে এবং সমস্ত পৃথিবীকে ও সমস্ত প্রাণীকে, সেই সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভাবিয়া সমস্ত মনুষ্যকে, সমস্ত প্রাণীকে, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিলে তবে প্রকৃত ভালবাসা কাহাকে বলে জানিতে পারা যায়।

যাহাকে ভালবাসিব সে ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক নাই। সে ভাল হইলেও ভালবাসিব মন্দ হইলেও ভালবাসিব, জগৎ ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া জগৎকে ভালবাসিতে শিক্ষা করা উচিত নহে। সমস্ত জগৎ সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব সমস্ত জগৎ ভালবাসার পাত্র। যে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্ম অভিমান বিনাশ করিয়া আপনাকে ভগবদ্ভাবে ভরাইয়া ফেলিয়াছে সেই সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে সক্ষম হইয়াছে এবং জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসিতে পারিবে। আমার বিবেচনা হয় শিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে হিন্দু শাস্ত্রের কিছু সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন যে হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্য ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। যদি কেহ ভগবান দর্শন ও মুক্তি পাইয়া থাকেন কিম্বা মুক্তি চান, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্ম হইতেই অতি সহজে পাইয়াছেন ও পাইবেন। কেবল আমাদের পথ দেখাইবার বা বলিয়া দিবার লোক নাই। এক্ষণে অনেক বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিবার তেমন পণ্ডিত নাই। এখনকার পণ্ডিতেরা অনেক বিষয় জানিয়া শুনিয়া সত্য মিথ্যা অথবা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন। আবার কেবল তাহাই নহে অনেক মহাত্মা নিজে শ্লোক রচনা করিয়া হয়ত পুরাণের কথা বেদের মধ্যে দিয়া শাস্ত্রের দেহাই দিয়া কাটাইয়া দিতেছেন। সেই আসল বস্তু ঠিক রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

কোন প্রকার একটা পথ অবলম্বন না করিলে ধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা জানা যায় না। কোশা কুশী নাড়িলেই ধর্ম্ম হয় না, প্রত্যহ কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও ধর্ম্ম হয় না, নাক মুখ টিপিয়া ধর্ম্মের ভাণ করতঃ লোক ভুলাইলে ধর্ম্ম হয় না, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাব দিয়া, হরিনামের ঝুলি হস্তে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইলেও ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের নিকটে দ্বেষাদ্বেষ, ভেদাভেদ নাই। "আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু" না হইলে প্রকৃত ধার্ম্মিক হয় না। সমদর্শী না হইলে যখন সিদ্ধি হয় না, কলহ দ্বেষ যখন জগতের পাপপ্রসবতা, তখন ধর্ম্ম কলহ বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যে একান্ত নিন্দনীয়, তাহার আর সন্দেহ কি? ঈশ্বর সকলের সমান, তাঁহার নিকট জাতি গত বা সম্প্রদায়-গত ধর্ম্ম নাই, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন ইত্যাদি কোন প্রকার ভেদ নাই। যে তাঁহাকে এক মনে ভক্তিভরে ডাকে তিনি তাঁহার। তিনি সকলের, এমন উদার ভাব ছাড়িয়া আমরা ধর্ম্ম বিবাদ করি ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। তিনি এক এবং সকলের, সেইজন্য সমস্ত জগৎ এক, সমস্ত জগতের লোক এক, এবং সমস্ত ধর্ম্মই এক। ধর্ম্মের পথ অতিশয় উদার, যাঁহার যে মতে বিশ্বাস তিনি সেই মতেই ধর্ম্ম লাভে সমর্থ। কখন কাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস ভঙ্গ করা কোন মতেই উচিত নহে।

অনেকে মনে করেন সংসার ছাড়িয়া বনে না যাইলে ধর্ম্ম হয় না, ইহা ভয়ানক ভুল। যদি জগতের সমস্ত লোক বনে

গমন করে তবে বনই সংসার হইয়া যায় অথবা সৃষ্টি থাকে না। সৃষ্টি না থাকিলে সংসার ও জীব সৃষ্টি হইবার কোন কারণ ছিল না। ইহাতে ঈশ্বরের কার্য্যে হস্তার্পণ করা হয়। সংসারই ধর্ম্মের প্রধান স্থান, সকল কার্য্যই করা চাই কেবল বায়ুর মত কিছুতে লিপ্ত হইবে না। সকলেই অবগত আছেন ধর্ম্মের পথ সকলকার সমান নহে। গৃহী যদি বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারীর পথ অবলম্বন করেন তাহার কোন ফল হইবে না ঘরে বসিয়া যদি কেহ কুম্ভক যোগী হইতে চেষ্টা করেন তাহারও কোন ফল হইবে না। পথ ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু কার্য্য একই, যেমন জলের সমষ্টি জলাশয়।

জগতে অনেক প্রকার সাধক আছেন, তাহার মধ্যে দুই শ্রেণীর সাধক প্রধান। প্রথম শ্রেণীর সাধক, সংসারের মায়া বন্ধন ছেদন করিয়া নিজের মুক্তির জন্য নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে যোগ বা তপস্যা করতঃ কালাতিপাত করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক, মানবমণ্ডলীকে আপন জ্ঞান করিয়া, তাহাদিগের মুক্তি নিজের মুক্তির সহিত সংযুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে অতি প্রেমের সহিত ধর্ম্ম পথে আনয়ন করেন, পরের ইষ্ট নিজের ইষ্ট বোধ করেন এবং পরের জন্য পাগল; যেমন, বুদ্ধদেব ও চৈতন্য।

যতদিন হইতে মানবের সৃষ্টি, যতদিন হইতে মানবেরা কথা কহিতে শিখিয়াছে, যতদিন হইতে মানবের বুদ্ধির উদয় হইয়াছে ততদিন হইতেই মানব সমাজে ধর্ম্মও বিস্তৃত হইয়াছে। তখন ধরের্ম্ম নামক রূপ না হউক, ধর্ম্মের এত বন্ধন না থাকুক, কিন্তু

একটা না একটা ধর্ম্ম ছিল। যাহা সত্য তাহা অবিনশ্বর এবং তাহাই মানবের গ্রহণীয়। বেদোক্ত যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহা অবিনশ্বর এবং অনন্ত সত্যে গঠিত, সুতরাং তাহার অবলম্বন করা উচিত। এক্ষণে দেখা উচিত, সকলেই মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন বা বলেন, কিন্তু আসল কথাটাই বা কি, আর তাহার কার্য্যই বা কি ? মন স্থির করিয়া ভক্তিভাবে নিজের চৈতন্য বিশ্ব চৈতন্যের সহিত যোগ করাই ধর্ম্ম, এবং যে পথ অবলম্বন করিলে সেই সংযোগ করা যায় তাহারই নাম ধর্ম্মপথ।

ধর্ম্ম কি এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কি ? ধর্ম্ম শব্দের অর্থ নির্ণয় করিলেই ইহার আবশ্যকতা জানিতে পারিবেন। ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যে ধারণ করে সেই ধর্ম্ম, যে যাহাকে ধারণ করে সেই তাহার ধর্ম্ম ; দ্রব্যের স্বভাবকে ধর্ম্ম বলে, যেমন সূর্য্যের ধর্ম্ম তাপ, জলের ধর্ম্ম রস, অগ্নির ধর্ম্ম দাহন,-সেই প্রকার জীবের ধর্ম্ম আত্মজ্ঞান। যে বস্তুর অভাবে পদার্থের পদার্থত্ব থাকে না, সে বস্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না। ধর্ম্ম জগতের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, ধর্ম্মদ্বারা পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই জন্য ধর্ম্ম সকলের শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, ধন, শরীর, সৎকুলে জন্ম, অরোগিতা ও মুক্তি কেবল ধর্ম্ম হইতে হয়। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে জীবের সকলই বৃদ্ধি হয় এবং হ্রাস হইলে সকলই হ্রাস হয়। মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্মকে আশ্রয় করা উচিত, নতুবা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অপগত হইয়া পশুত্ব অথবা কোন হীন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

ধর্ম্মের মূল—হৃদয়, মন ও শক্তির সহিত ভগবানে ভক্তি এবং বিশ্বাস। প্রতিবেশী, আত্মীয়গণ এবং সমস্ত জগৎকে আপনার জ্ঞান হওয়া, জ্ঞানকৃত কোন অন্যায় কার্য্য না করা, জীবে দয়া, অহিংসা, লোভ সম্বরণ, ক্রোধ সম্বরণ, সত্যবাক্য, ক্ষমা, সৎসংসর্গ, জিতেন্দ্রিয়তা, শৌচ, গুরুভক্তি, সকল ভূতে ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরে পিতৃত্ব এই সকল জ্ঞানই ধর্ম্ম।

শাস্ত্র অনন্ত কিন্তু আয়ু অতি অল্প, মনুষ্য জীবনে বিঘ্নও অনেক অতএব সকল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম জ্ঞাত হওয়াই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম লাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে, সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক করে না। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানে তেজঃকান্তি, যেখানে লজ্জা সেইখানে শ্রী, যেখানে সৎসঙ্গ সেইখানে সুবুদ্ধি যেখানে ধার্ম্মিক সেইখানে ভগবান বিরাজিত। ধর্ম্ম লাভ জন্য মতাপেক্ষা করে না। যে ভাবে যে কেহ তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি সেই ভাবে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যেমন নদী নানা দিক দিয়া গমন করতঃ পরিশেষে একমাত্র সাগরেই নিপতিত হয়, সেই প্রকার ভগবানকে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন তাহা সেই ভাবগ্রাহী পরমব্রহ্মে অর্পিত হয়।

উপাসনা

উপাসনা কাহাকে বলে এবং আবশ্যক কি না তাহাই প্রথমে জানা আবশ্যক। যদি ঈশ্বরকে জানিবার বা পাইবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে উপাসনা করা আবশ্যক, নতুবা যাঁহার সে ইচ্ছা নাই তাঁহার উপাসনা করিবারও আবশ্যক নাই। ঈশ্বর কাহারও তোষামোদ চাহেন না। তাঁহার সকল জীবে সমান দয়া। উপাসনা বা আরাধনা ইত্যাদি উৎকোচ নহে, উহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল, আকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ। তাঁহাকে জানিবার আবশ্যক বিবেচনা হইলে যে পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় সেই পথের নামই উপাসনা।

মনুষ্য মাত্রেই কেবল সুখ ভোগ করিতে চাহে কিন্তু সুখ শব্দটি প্রকৃত কোন্ অবস্থার নাম তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। দুঃখের পরম নিবৃত্তিই মহা সুখ। তাহা যে কোন্ কানন আলো করিয়া আছে, মনের সম্পূর্ণ শান্তি কোন্ সাগরগর্ভে লুক্কায়িত আছে, তাহার অনুসন্ধান কেহ করিতে চাহেন না। দুঃখ না থাকিলে সুখ যে কি প্রকার তাহা কেহই জানিতে পারিতেন না। কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিলেই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কষ্ট দেন তাহা কেবল তাহারই সুখ ভোগের নিমিত্ত। তাঁহার ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেই সৎপথে থাকিয়া চিরকাল সুখ ভোগ

করুক। পাকা স্বর্ণ এক ভরির মূল্য পঁচিশ টাকা, তাহাতে যে পরিমাণে খাদ মিশ্রিত হয় সেই পরিণামে মূল্য কম হয়। স্বর্ণকার তাহাকে রসায়ন দ্বারা পুড়াইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পুনরায় পাকা স্বর্ণ হয় ততক্ষণ পেটাপিটি করে। সেই প্রকার জীব কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিলে, ঈশ্বর তাহাকে কষ্ট ভোগ করাইয়া পুনরায় খাঁটি করেন এবং সোজা পথে লইয়া আসেন। জীবকে কষ্ট দেওয়া ইহাও তাঁহার পরম দয়ার পরিচয়, সেইজন্য মনুষ্য মাত্রেরই বুঝা উচিত যে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান বস্তু, সুতরাং কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা তাহা না করাই ভাল। গায়ে কাদা মাখিয়া তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য গা ধোয়া অপেক্ষা কাদা না মাখাই ভাল ; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

উপাসনা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা যখন বেশ বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইবে এবং মনের সহিত পাকা বিশ্বাস হইবে তখন প্রথমে আসনের প্রয়োজন। আসন অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে সংসারী জীবের পক্ষে যাহা উপযুক্ত তাহাই সকলের জানা উচিত, সেই জন্য এখানে কেবল তাহাই প্রকাশ করা হইল। প্রথমে কুশাসন, তাহার উপরি কম্বলাসন এবং এই দুই আসনের উপর বস্ত্রাসন, উপরি উপরি পাতিয়া, সাধক তাহার উপর উত্তর মুখে নির্জ্জন ও প্রশস্ত ঘরে, শরীর মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে রাখিবে এবং দক্ষিণ জানু ও উরুর মধ্যে বাম পদতল, আর বাম জানু ও উরুর মধ্যে দক্ষিণ পদতল স্থাপন

করিয়া, সরলভাবে উপবেশন করিবে। তাহার পর নয়ন মুদ্রিত করিয়া, নাসিকাগ্র অর্থাৎ দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ শান্ত ও স্থিরভাবে মনে মনে গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই। প্রাতে ও সায়ংকালে প্রত্যহ দুইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিমাণ সময় নিশ্চিন্ত মনে বসিতে হইবে যতদিন না আলোক দর্শন হয়, ক্রমে সময় বাড়াইতে হইবে। মন স্থির করিবার ইহা অপেক্ষা আর কোন প্রকার সোজা পথ নাই। মন বড়ই চঞ্চল, বাহিরে গেলেই পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিবে ও কার্য্যে লাগাইবে। কিছুদিন এই প্রকার করিতে করিতে মন ক্রমে ক্রমে আপন বশে আসিবে। মন দিয়াই মনকে বশ করিবে, আমি পারিব না আমার হইবে না ভুলক্রমেও এই ভাব মনে করিবে না, তাহা হইলে কোন ফল হইবে না। সর্ব্বদা মনে করিবে আমার এই প্রধান কার্য্য, এই কার্য্য আমাকে করিতেই হইবে, যতদিন না হইবে ছাড়িব না। এই প্রকার দৃঢ় হইয়া কার্য্য করিলে তবে নিশ্চয় ফল পাওয়া যায়। মন স্থির না হইলে কোন প্রকার সাধনা হইতে পারে না। মন স্থির হইলে আর আসন আবশ্যক করে না।

বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয় সকল হইতে বিভিন্ন চিৎ স্বরূপ আত্মা আছেন ইহা নিশ্চয় জানিবে। সেই আত্মাই ঈশ্বর, নিরাকার, নির্ম্মল ও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি বর্জ্জিত। তিনি চিন্ময়, আনন্দময়, অশরীরী, পূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময়, নিত্য এবং

শুদ্ধ জ্ঞানাদিময়, সর্ব্ব দেহগত সর্ব্বাতীত, একাগ্রচিত্তে আত্মাকে নিত্য এই প্রকার চিন্তা করিবে। কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর নাই, স্বভাব হইতে সমস্ত হইতেছে। তাহাদের মত মূর্খ ও অজ্ঞানী জগতে আর নাই। যদি ঈশ্বর এক মুহূর্ত্তের জন্য দেহ ছাড়া হন, তখনই নয়ন মুদ্রিত করিয়া এ জীবনের লীলা সমাপ্ত করিতে হইবে। আজ কাল ধর্ম্ম পিপাসা কোন কোন লোকের একটু জন্মিয়াছে বটে কিন্তু পরিশ্রম করিতে কেহ রাজি নহেন। দুই চারি দিন চক্ষু মুদিয়া বসিয়া যদি কিছু না পান তবে অমনি বুঝিলেন সকলই মিথ্যা, বৃথা পরিশ্রম করিয়া ফল নাই। উইল্ ফোরস্ (Will force) করিয়া যদি কেহ খানিকটা ঈশ্বর তাহাদের পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহাদের বিশ্বাস হয়। তাহাদের বিশ্বাস হউক বা, না হউক জগতের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পতিত জমিতে বন ও জঙ্গল আপনিই হইয়া থাকে। সেই সকল লোকের নিকট হইতে তফাতে থাকা উচিত। যখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবে তখন নিজেই সোজা পথে আসিবেন।

প্রথমতঃ অরুণের ন্যায় জ্যোতিঃ ও সেই সঙ্গে জ্ঞান উদয় হইয়া অজ্ঞান অন্ধকারকে হরণ করে, পরে আত্মা সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। যে প্রকার ভ্রান্তিজ্ঞানে মুড়ো গাছকে মানুষ বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার ভ্রান্তির দ্বারা ব্রহ্মকে জীব বলিয়া বোধ হয়, ঐ ভ্রান্তি নাশ হইলে, জীবের যথার্থ স্বরূপ

দৃষ্ট হয় এবং জীবত্ব ব্যবহার নিবৃত্তি হয়। যেমন যথার্থ জ্ঞান হইলে দিক্‌ভ্রম নষ্ট হয়।

চিত্তের উন্নতি সাধন করিতে হইলে মনুষ্যের উন্নত দশার চরম আদর্শ স্বরূপ কোন মহাপুরুষের আদর্শ চিন্তা দ্বারা, সেই আদর্শকে সর্ব্বদা অন্তরের সম্মুখে ধারণ করিয়া সেই আদর্শ অনুযায়ী উন্নত হইবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মন বড় অস্থির, কোন আদর্শ চরিত্র মনোমধ্যে সদা সর্ব্বদা ধরিয়া রাখা বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্য এই আদর্শ পুরুষের সঙ্গে আমাদের মনকে কোন বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। মহাপুরুষের সহিত বন্ধন দৃঢ় করিতে হইলে, দৃঢ় ভক্তির প্রয়োজন। এই জন্য ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর উপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট যোগী, জ্ঞান চক্ষু দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সমস্ত জগৎকে এবং সেই এক আত্মাকে সমস্ত জগৎস্বরূপে দেখেন। এই সমুদয় জগৎই আত্মা, আত্মা ভিন্ন কোন বস্তু নাই। যে প্রকার সমুদয় ঘট, কলস, হাঁড়ি, গামলা ইত্যাদি বস্তু সকলই কেবল মৃত্তিকা মাত্র, মৃত্তিকা ভিন্ন ঘটাদি কোন বস্তুই নাই, সেই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকেই সমুদয় দেখেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্য অনিত্য সুখে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম সুখে পরিপূর্ণ হইয়া, ঘটের মধ্যস্থিত দীপের ন্যায় নির্ম্মলরূপে অন্তরেই প্রকাশ পান, আর মৌনী হইয়া বিচরণ করেন, যেমন বায়ু সর্ব্বত্রগামী হইয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয়

না। সেই মৌনী পুরুষ উপাধির বিনাশ হইলে, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন ; যে প্রকার জলে জল, তেজে তেজ, আকাশে আকাশ মিলিত হয়। যে প্রকার কাঁচপোকা, তেলাপোকাকে ধরিলে, তেলাপোকা কাঁচপোকাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করিতে করিতে, আপনার স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কাঁচপোকার স্বরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার পূর্ব্বস্থিত যে উপাধি ও গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় সচ্চিদানন্দ ভাব প্রাপ্ত হন। এমন ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যায়।

সেই জ্যোতির্ম্ময়, পরমব্রহ্ম, আনন্দময়ের আনন্দের কথা মাত্রে আশ্রিত হইয়া ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র জীব পর্য্যন্ত সকলেই তারতম্যরূপে আহ্লাদিত রহিয়াছে। যে প্রকার দুগ্ধমাত্রেই ঘৃত আছে, সেই প্রকার সকল বস্তুই ব্রহ্মেতে অন্বিত, সুতরাং সাংসারিক ব্যবহারও তাহা হইতে ভিন্ন নহে। জীব শ্রবণ, মনন, অজ্ঞান ও কুবাসনা দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট ; তাহাকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে স্থায়ী করণ দ্বারা উদ্দীপ্ত, এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পরিতাপিত করিলে, সমুদয় উপাধি মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং আত্মা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পান।

সর্ব্বব্যাপী ও সকলের আধার যে আত্মা, হৃদাকাশাদি হইতে জ্ঞান সূর্য্যরূপ উদিত হইয়া, অজ্ঞান তমোকে হরণ করতঃ সমুদয় বস্তু প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি বিশেষরূপে নিষ্ক্রিয়,

দিগ্‌দেশ কালাদির অপেক্ষা রহিত, শীত উষ্ণাদির বিনাশক, সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্য সুখ স্বরূপ স্বীয় আত্মা তীর্থকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ও অমৃত হন।

ধর্ম্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ঈশ্বরে মন প্রাণ অর্পণ করাই ধর্ম্ম। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য এইরূপ আশ্রয় করিবে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বময়। দেবগণের দেহও তাঁহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। মুমুক্ষু ব্যক্তি বিধি বিহিত কার্য্য এই প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া, চিত্তশুদ্ধি হইলে, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হইবে। কামাদি ষড়বর্গ পরিত্যাগ করিবে এবং হিংসা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহারা ধর্ম্মপথের ভয়ানক অনিষ্টকর বলিয়া জানিবে। যাহারা যত্নবান হইয়া ইহা করিতে পারিবে তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্ম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আত্ম প্রত্যক্ষ হইলেই মুক্তি লাভ হয়।

মনঃ সংযমই সাধনার প্রধান লক্ষণ। বাহ্য বিষয়ে যিনি আসক্তিশূন্য এবং অন্তরে যিনি পরমানন্দ ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্ম সংযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। প্রজাপালক, প্রজা-রঞ্জক রাজাও রণজয়ী যোদ্ধা অপেক্ষাও যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন তিনিই মহাপুরুষ। সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব হইতে পারে কিন্তু মন জয় করা বড়ই শক্ত। মন জয় করা সহজ হইতে পারে যদি ভক্তি, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করা হয়।

দয়াই সাধনার মূল ভিত্তি আর অভিমান নরকের প্রশস্ত পথ। যে ব্যক্তি অহঙ্কার শূন্য, ক্ষমাশীল, সুখ দুঃখে সমভাব, সর্ব্বদা সন্তোষযুক্ত ; যিনি ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, যিনি কাহাকেও সন্তাপ প্রদান করেন না, যিনি ক্রোধ ও ভয় হইতে বিমুক্ত, যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, যিনি হর্ষে সন্তুষ্ট ও বিষাদে ক্লেশযুক্ত নহেন, যিনি পাপ পুণ্য পরিশূন্য, যিনি শত্রু মিত্র মান অপমান সকলেই সমভাব, যাহার নিন্দা ও স্তুতি সমান জ্ঞান, শরীর রক্ষার্থ যাহা কিছু সংস্থান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি ঈশ্বর পরায়ণ, শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তি পরায়ণ, তিনিই ঈশ্বরকে পাইবেন এবং তাহার মুক্তি নিশ্চয়।

অন্য সকল সাধনা অপেক্ষা কেবল জ্ঞানই মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ, যেমন অগ্নি ব্যতীত পাক সম্পাদন হয় না। পরিচ্ছন্ন আত্মাকে অজ্ঞান বশতঃ অপরিচ্ছন্ন বোধ হয়, যদি অজ্ঞানের নাশ হয় তবে কেবলমাত্র আত্মাই স্বয়ং প্রকাশিত হন, যে প্রকার মেঘের বিনাশ হইলে সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হন। অজ্ঞানরূপ মালিন্যযুক্ত যে জীব, তাহাকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা নির্ম্মল করিয়া জ্ঞান স্বয়ং নষ্ট হয়, যে প্রকার নির্ম্মাল্য ফল জলকে নির্ম্মল করিয়া স্বয়ং নষ্ট হয়। যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন দৃশ্য বস্তু সকল সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, এবং জাগ্রত অবস্থায় তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল এই সংসার, স্বপ্নের ন্যায় অজ্ঞান অবস্থায় সত্য বোধ হয় এবং অজ্ঞান বিনাশ হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়।

ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এবং ভক্তি, দয়া ইত্যাদি গুণের অতীত। আজ কাল যাহারা নিরাকার উপাসনা করেন, তাহারা নিজেই বলিতে পারেন না যে ঠিক উপাসনা হইতেছে কিনা। তাহাদিগের ভক্তি বৃত্তির চর্চ্চায় কিছু মানসিক উপকার হইবে, আসল ফলে ইহার বেশী কিছু হইবে না। যখন বুঝিব নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ জন্য ভক্তি ও মানসিক বৃত্তির স্ফূরণ প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ জন্য কোন সাকার পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত, সেই সকল বৃত্তির স্ফুরণের ইচ্ছা করি তখন তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য কোন সাকার চিন্তার রূপ অবলম্বন করিলে তাহাকে সাকার উপাসনা বলে, আর সাকার চিন্তা ব্যতীত, জগৎব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা, শক্তি, গুণ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করাই নিরাকার উপাসনা। নির্গুণ ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা ভিন্ন অন্য কোনরূপ উপাসনা হইতে পারে না।

উপাসনা চারি প্রকার, প্রথম ঈশ্বর উপাসনা দ্বিতীয় দেব দেবীর উপাসনা, তৃতীয় শক্তিশালী পদার্থের উপাসনা, যেমন সূর্য্য, অগ্নি ইত্যাদি, চতুর্থ ধার্ম্মিক মনুষ্যের উপাসনা। গাভীর উপাসনা, বৃক্ষের উপাসনা, নদী বা গঙ্গার উপাসনা, শস্যের উপাসনা ইত্যাদিও এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু সূত্রধর বাইস্ বাটালি পূজা করে, কর্ম্মকার হাতুড়ি নেহাই পূজা করে, কুম্ভকার চাক পূজা করে, ব্রাহ্মণ

পুঁথি পূজা করে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। অন্য প্রকার উপাসনায় অচেতনকে অচেতন বলিয়া জ্ঞান থাকে ; এই জাতীয় উপাসনাকে জড় উপাসনা কহে। ইহা অহিতকর নহে, কারণ ইহা দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়।

ঈশ্বরকে আমারা দেখিতে পাই না, তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি দেখিয়া ও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইয়া। সাকার বা দেব দেবী ব্যতীত যে উপাসনা তাহা কেবল পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্ম্মে যে প্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে, তাহা বেশ ভালরূপ বুঝিয়া দেখিলে উহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া জানা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতি হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে যে কেবল একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। হিন্দুধর্ম্মে যে সার কথা এবং উচ্চ ও উদার ভাব আছে তাহা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর বিশ্বরূপ, যেখানে তাঁহার রূপ দেখা যায় সেইখানে তাঁহার পূজা করা হয়।

যে প্রণালী দ্বারা সেই অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই প্রণালী অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করার নাম ঈশ্বর উপাসনা। যাহা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ, উন্নত ও নির্ম্মল হয় তাহারই নাম ঈশ্বর উপাসনা।

যেমন অপরিষ্কৃত দর্পণে কোন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়িতে পায় না, সেইরূপ চিত্ত নির্ম্মল না হইলে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয় না। যদি চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন জন্য কেহ কোন দেব দেবী রূপ সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্য অবলম্বন করেন, তবে সেই দেব দেবী আরাধনাকেও ঈশ্বর উপাসনা বলিতে হইবে।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার, নির্গুণ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, শুদ্ধ, জরা রহিত, অমর, শান্ত, নির্ম্মল, অন্তর্য্যামী, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মার জন্মস্থান, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও উদ্ধারের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। ইহার অর্থ ভালরূপে বুঝা উচিত ; প্রথম নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বুঝায় ; রূপ ও আকার এই দুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্রব্যের বর্ণ গুণকে রূপ বলে, যাহা দ্রব্যের আকার তাহাও রূপ। অনেকে মনে করেন যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর তাহার কোন আকার নাই, অনেকে দ্রব্যের আকারকে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া মনে করেন। বায়ু চক্ষুর অগোচর কিন্তু বায়ুরও আকার আছে। শব্দ, গন্ধ, অতি ছোট ছোট কীট যাহা জলে থাকে এই সকল চক্ষুর অগোচর হইলেও ইহাদের আকার আছে।

কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে তাঁহার উপাসনা করা হয় না। উপাসনা করিবার অগ্রে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি,

তাহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এই যে বিশ্বব্যাপী জগৎ, যাহা এক শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং এই শক্তিই চৈতন্য শক্তি বলিয়া জানিবে। যিনি তাঁহার নিজ শক্তি এই শক্তির সহিত এক তানে মিলাইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর কি তাহা বেশ বুঝিতে ও জানিতে পারেন। এই সমস্ত জগতের সমষ্টিভাবই ঈশ্বর, ইহা স্পষ্ট বুঝিলে ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, তিনি বিশ্বরূপ ও অনন্ত এই সকল শব্দগুলির অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঈশ্বরকে তাঁহার কার্য্য, তাঁহার শক্তির বিষয়, ভক্তিভাবে আলোচনা করিলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত জানিতে পারা যায়।

সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিতে হইলে সৃষ্টির বিষয় অধ্যয়ন এবং ভাব গ্রহণ প্রয়োজন। প্রলয় কর্ত্তাকে জানিতে হইলে প্রলয় তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, আর পালন কর্ত্তাকে জানিতে হইলে, পালন তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। সংহার কর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই অনাদি কারণের, আগ্রহচিত্তে স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা। যদি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ বাসনা না থাকে তবে নিজের জন্য মন্দিরে অথবা দেবালয়ে বসিয়া প্রার্থনা কর বা কোন দেব দেবীর ভজনা কর তাহা ঈশ্বর উপাসনা নহে। কালিকা দেবীর অসীম ক্ষমতা, ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা

করিলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়, সেই বিশ্বাসে যদি কালিকা দেবীর মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া কালীর উপাসনা কর, তবে তাহা কালিকা দেবীর উপাসনা করা হইল, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করা হইল না। যদি কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে উপাসনা করা যায় তাহা হইলে উহা ঈশ্বর উপাসনা করা হইল।

কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয় এবং উপাসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন। যদি আমি কালিকা দেবীর রূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি এবং যখন কালীরূপ অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই আমি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়াছি ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উপাসনায় কোন ফল নাই, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। তবে এই প্রকার সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না।

মনুষ্যের কর্ম্মের ফলদাতা শক্তির নামই দেব দেবী। দেব দেবীগণ অনিত্য সুখের প্রলোভনে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। সেই জন্য মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। যতদিন সামান্য অনিত্য সুখের কামনা মনুষ্যহৃদয়ে প্রবল থাকিবে, ততদিন তিনি নিত্য সুখ দাতা ঈশ্বর যে কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিবেন না। ভগবানকে পাইব বা দেখিব এই আশা করিলে প্রথমেই কামনা ত্যাগ করা চাই। সকাম কর্ম্মই দেব দেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কর্ম্মই ঈশ্বর উপাসনা।

যে সমস্ত অজ্ঞান ব্যক্তি মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহকে ঈশ্বর মনে করেন, তাঁহারা কেবল ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। কল্পিত মূর্ত্তি যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্য প্রাপ্তি ও সম্ভব হইতে পারে। ঈশ্বরকে আমরা সহজে জানিতে পারি না, সেই কারণে অজ্ঞানবশতঃ তাঁহার স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পূজা অর্চ্চনা করতঃ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। এই মূর্ত্তি তাঁহার শক্তি বা স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু ঐ মূর্ত্তি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না। তাঁহার শক্তি সকল স্থানেই বিদ্যমান আছে।

মনুষ্যের কর্ম্মই শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে, এই কর্ম্মাত্মক শক্তিই দেব দেবী জানিবে। বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ, আর যোগ শাস্ত্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা গন্তব্য পথে যাইতে হয়। সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত নিত্য সুখ এবং নির্ব্বাণ মুক্তি পাওয়া যায় না। দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং সেই জন্য সমাধি সুখে বঞ্চিত থাকিতে হয়। একাগ্রচিত্তে যে যেরূপ কামনা করে, তাহার একাগ্রতা জন্য সে সেই কামনানুযায়ী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ভোগৈশ্বর্য্য কামনা থাকিলে ভোগ ঐশ্বর্য্য ফল দাতা শক্তি অর্থাৎ দেব দেবীর সাহায্য পাইবে, আর যদি নিষ্কাম হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কামনা না থাকে তবে নির্গুণ নিরাকার শক্তির সাহায্য পাইবে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সকাম কর্ম্মই দেব দেবীর উপাসনা আর নিষ্কাম

কর্ম্মই ঈশ্বর উপাসনা। ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু হইয়া সাকার উপাসনা এবং ভোগ ঐশ্বর্য্য কামনা রহিত হইয়া করিলে যথার্থ ঈশ্বর উপাসনা করা হয়।

কর্ম্ম কথাটিতে কি অর্থ বুঝায়? যাহা করা যায় তাহারই নাম কর্ম্ম। কর্ম্ম দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। আমি কলিকাতা যাইব মানস করিয়া তথায় গমন করিলাম, ইহা স্থূল জাতীয় কর্ম্ম, দৈহিক অঙ্গ চালনা শক্তির ব্যয় করা হইল। আর কলিকাতা যাইব মানস করিয়া গেলাম না ইহা সূক্ষ্ম জাতীয় কর্ম্ম, কারণ ইহাতে কেবল মানসিক শক্তির ব্যয় করা হইল। চিত্তের একাগ্রতায় কর্ম্মরূপে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড যাহা, দেব-দেবীর উপাসনা তাহা। ঈশ্বর নিষ্কাম, সুতরাং তুমিও নিষ্কাম সেই জন্য কামনা রহিত হইয়া উপাসনা করিলে তবে ঈশ্বরকে পাইবে। কামনা ও আশা থাকিতে তাঁহাকে পাইবার আশা নাই। হিন্দুমাত্রেই ঈশ্বরের নিকট মোক্ষ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। নিত্য পদার্থ ঈশ্বর নিত্য ফল মোক্ষ সুখ ভিন্ন অন্য ফল প্রদান করিতে জানেন না। আর ঈশ্বর জগৎ রচয়িতা, তিনি অদ্বিতীয়, দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান, অচিন্ত্য, অব্যক্ত এই প্রকার কথাগুলি বলিতে পারিলেই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে তাহা কখনই নহে।

রাগ দ্বেষাদি দোষ হইতে শুভাশুভ কর্ম্মের উৎপত্তি, সেই কর্ম্ম হইতে সংসার। অতএব অবিদ্যা পরিত্যাগ করা

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেহ অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি প্রথমেই বিচার করিবে কাহার অপকার করিল, এই বিষয়টি বিচারিত হইলে আর দ্বেষই হইতে পারে না। আত্মাকে ছাড়িয়া দিলে পঞ্চভূতময় দেহ ত জড় পদার্থ মাত্র, জ্ঞান চৈতন্য কিছুই নাই, তখন অগ্নিদগ্ধ হউক, আর শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিতই হউক,যে নিজে কিছুই জানিতে পারে না, তাহার সেই জড় দেহের আবার অপমান কি?

আমার আত্মার সহিত জগতের আত্মার একতানে মিলন করাই যোগ। এই প্রকার যোগযুক্ত আত্মাই আপনাকে সর্ব্ব-ভূতস্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। জনতা হইয়া কোন প্রকার মহা গোলমাল হইলে, প্রত্যেকের আলাহিদা শব্দ শ্রবণ গোচর হয় না, কেবল হো হো একটি শব্দ শুনা যায়, তাহারই নাম যোগ। যেমন অনেকগুলি সুর একতানে মিলাইয়া বাজাইলে শ্রোতৃগণ কেবল একটিমাত্র শব্দ শুনিতে পান, সেই সুরই যোগ। সেই প্রকার এই সমস্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভূতের চৈতন্য, যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনিই জানিতে পারেন চৈতন্য অথবা যোগ কি প্রকার। এই চৈতন্যই জগতের আত্মা।

উপাসনা দ্বারা উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে "সোহং" সেই আমি এই জ্ঞান যাহাতে জন্মায় তিনিই ঠিক বুঝিতে পারেন আমি কে। আমার সহিত আমার হস্ত পদাদির ও মনের সহিত একটি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তাহা অনুভব করিতে পারি বলিয়া আমার হস্ত পদাদি ও মনে অহং জ্ঞান জন্মিয়াছে।

মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে আমার সহিত সমস্ত বিশ্বের ঠিক এই প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। অনুভব শক্তির বিকাশে মানব সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে। নিজের অহং জ্ঞানের সহিত এই জগতের যোগই প্রকৃত যোগ। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে জগৎ চলিতেছে, সেই সকল শক্তির ক্রিয়া মানব চেষ্টা করিলে আপনাতেই সমস্ত দেখিতে পান। এই জন্য মনুষ্যকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম

পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম বা পরকাল আছে কি না তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলে স্থিরচিত্তে বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পূর্ব্বজন্ম, বর্ত্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্ম· স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব জন্মে আমি যে প্রকার কার্য্য করিয়াছি এবং যে প্রকার স্বভাবের লোক ছিলাম, মৃত্যুর পর কর্ম্মফল অনুসারে সেই সকল পরমাণু লইয়া, এই বর্ত্তমান দেহ তৈয়ার হইয়াছে। বর্ত্তমান জীবনে আমি নিজে ভাল মন্দ কার্য্য যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা সমস্তই আমি বেশ জানি। ভাল কার্য্য করিলে ভাল ফল এবং মন্দ কার্য্য করিলে মন্দ ফল ভোগ করিতে হয় তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে যিনি বিচার করিয়া দেখিবেন, তিনিই জানিতে পারিবেন, যে বর্ত্তমান জীবনে আমি কি প্রকার লোক তৈয়ার হইতেছি এবং আমার এই সকল কার্য্য অনুসারে ভবিষ্যৎ জীবনে কি প্রকার স্বভাব ও কি প্রকার অবস্থার লোক হইব। যাহা চেষ্টা করিলে নিজে জানা যায়, তাহা জানিবার জন্য পরের সাহায্য আবশ্যক করে না।

বর্ত্তমান জন্মের যেটি ইহলোক, তাহাই পূর্ব্ব জন্মের পরলোক আর বর্ত্তমান জন্মের পরলোকই ভবিষ্যৎ জন্মের ইহলোক। এই স্থূল দেহের ভিতর অন্য দেহ আছে তাহার

নাম সূক্ষ্ম দেহ এবং তাহার ভিতরেও আর এক দেহ আছে তাহার নাম কারণ দেহ। কদলী ত্বকের ন্যায় অবস্থিত এই ত্রিবিধ দেহই সংসার সংজ্ঞায় বিরাজমান। মানবদেহের গঠন, আকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, সুশ্রী বা কদাকার, বিদ্বান্ অথবা মূর্খ, কর্কশ বা নম্র, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক, সাধু অথবা চোর, সরল বা কুটিল, রাজা অথবা জমিদার, মধ্যবিত্ত অথবা গরীব, উচ্চ বংশে জন্ম অথবা নীচ বংশে জন্ম এই সমস্তই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে এই বর্ত্তমান দেহ তৈয়ার হইয়াছে। সেই প্রকার পুনরায় ইহজীবনের কর্ম্মফল লইয়া পর জন্মের দেহের আকৃতি হইবে।

জীব ভূমিষ্ট হইতে লয় পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাই তাহার পরমায়ু। যদি আধ্যাত্মিক অর্থে ধরা যায় তবে জীবের পরমায়ু অনন্ত, জীব অক্ষয় ও অমর। জীব ধ্বংস হইলেও তাহার উপ-করণ কখনই নষ্ট হয় না। বাস্তবিক জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সময় সে জীবিত থাকে সেই সময়টুকুই তাহার পরমায়ু। সাধারণের বিশ্বাস যে জীব যত পুণ্যবান্, তাহার পরমায়ুও তত অধিক সে ততদিন জীবিত থাকে কিন্তু তাহা ভুল। সংসার হইতে জীব যত দূরে থাকিবে, পাপ তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারিবে না। জীব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য সংসারে আগমন করে, কারণ সংসারই কর্ম্মফল ভোগ করিবার স্থান। যে পুণ্যবান সে কখন কর্ম্মফল ভোগ করে না; সুতরাং যতদিন জীবের কর্ম্মফল ভোগ সমাপ্ত না হয়, যতদিন

জীব পাপ হইতে মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে সংসারে থাকিতে হয়। যে পুণ্যবান্ সে অধিকদিন সংসারবাসী হয় না, যে যত পাপী সে ততদিন সংসারে থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। যাহার কর্ম্মফল শেষ হয়, সে সংসার হইতে অপসৃত হয়, যাহার জীবন যত শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হয় সে তত পুণ্যবান্, তাহার জীবন তত পাপ শূন্য ; পাপ শূন্য হইলেই ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয় তখন তাহার আয়ুঃ অসীম, যতদিন ঈশ্বরের সত্তা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তাহার সত্তা বর্ত্তমান থাকিবে।

মনুষ্য যেমন পর পর পাপ পুণ্য করিয়া থাকে তাহার ফলভোগও দিবা রাত্রির ন্যায় পর পর হইয়া থাকে। সেইজন্য কর্ম্মফল শেষ না হইলে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হয়। এই যে পঞ্চভূতের পুত্তলি মানব, মৃত্যুর পর কি কোন স্থানে গমন করে, কি মৃত্যুই মানবের শেষ ? ইংরাজেরা বলেন মনুষ্যের কর্ম্মফল ইহজন্মেই ভোগ হয় এবং মৃত্যুই শেষ। ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলেই পরজন্ম আছে তাহা অবশ্যই মানিতে হইবে। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে মনুষ্যের আত্মা আছেই ; ঈশ্বরের ধ্বংস নাই সুতরাং ঈশ্বরের শক্তি আত্মারও বিনাশ নাই। যদি পরজন্ম না থাকে তবে ঈশ্বরকে দয়াময় কখনই বলা যাইতে পারে না, কারণ এই জীবনে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ ভদ্র বংশে, কেহ নীচ বংশে ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করে কেন ?

ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বজন্মে যে যে প্রকার কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ভোগ শেষ না হওয়াতে জীব কর্ম্মফল অনুসারে পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছে। যে জন্মান্ধ সে এই জীবনে কিছুই দেখিতে পাইল না কিন্তু আর সকলে বেশ দেখিতে পাইতেছেন ইহার কি কোন কারণ নাই? বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না ইহা পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল ভোগ হইতেছে। এই জীবনের দেহ আকৃতি গঠন স্বভাব জ্ঞান ইত্যাদি সকলই জানিবেন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে ঠিক সেই প্রকার গঠিত হইয়াছে। যে যে প্রকার কর্ম্ম করিয়াছে তাহার আকৃতি, স্বভাব ঠিক সেই প্রকার হইয়াছে। যে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতেছে পরজন্মে তাহার আকৃতি ও স্বভাব ঠিক দস্যুর মত ও রুক্ষ হইবে। যিনি ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন তাহার আকৃতি সৌম্য ও স্বভাব অতি কোমল হইবে।

একজন মনুষ্য সমস্ত জীবন ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া হয়ত সুখী হইল না সংসারে নানা প্রকার কষ্ট পাইল, আর একজন অতি ঘৃণিত কার্য্য, লাম্পট্য বা দস্যুবৃত্তি করিয়া হয়ত জীবন বেশ সুখে কাটাইল, পূর্ব্বজন্মই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ। যদিও এক ব্যক্তি ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া এ জীবনে কষ্ট পাইল ইহার সুখ এক সময় নিশ্চয় ভোগ করিবে, আর এই জীবনে যে কষ্ট পাইল তাহা পূর্ব্বজন্মের মন্দ ফল, যাহা এই ভোগ করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া কষ্ট ভোগ করিল। আর অপর ব্যক্তির

এক্ষণে পূর্ব্বজন্মের শুভ ফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া সুখে জীবন কাটাইল কিন্তু ইহার পরই তাঁহাকে মহা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন পাপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি, তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পুণ্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি, তাহাও ঈশ্বর দিয়া থাকেন ইহা নিতান্ত অজ্ঞানের কথা; রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল ভাল মন্দ কার্য্য করাইয়া থাকে। রাগ করিলেই অনিষ্ট হইবে, কামনা হইলেই প্রাপ্তি ইচ্ছা হইবে, লোভ করিলেই পর দ্রব্য অপহরণের চেষ্টা হইবে, অহঙ্কার হইলেই পরের অনিষ্ট চিন্তা হইবে ইত্যাদি যাহার যে ধর্ম্ম সে তাহার কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই মনুষ্যকে হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন এবং সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মৃত্যুই কখন শেষ হইতে পারে না তাহা হইলে ঈশ্বরকে প্রত্যহ রাশি রাশি আত্মা সৃজন করিতে হয়। মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার কার্য্য কত বেশী হয় এবং বড় কষ্টের জীবন হইয়া পড়ে। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান।

দেহ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার অপকার হয় না যেমন গৃহ দগ্ধ হইতে থাকিলে গৃহ অভ্যন্তরস্থ আকাশের কিছু ক্ষতি হয় না। আত্মা হন্তাও হয় না আত্মা হতও হয় না। দ্বেষই সন্তাপের মুল, দ্বেষই সংসারের বন্ধন, দ্বেষই মুক্তির প্রতিবন্ধক, অতএব যত্নপূর্ব্বক দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। সুখ দুঃখ দেহের নাই আত্মারও নাই। আত্মা বায়ুর মত নির্ম্মল ও নির্লেপ তথাপি ইনি ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া আমি সুখী আমি

দুঃখী আপনিই এই প্রকার বোধ করেন। বিশ্বমোহিনী সেই অনাদি অবিদ্যার নামই মায়া। জন্মিবামাত্র জীবের সেই অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধ হয় তাহাতেই এই সংসার বন্ধন হইয়া থাকে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমীপে অবস্থিতি হেতু আত্মা নির্ম্মল হইলেও তত্তৎ পদার্থের সমগুণ সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জীবের সহকারী আপনাদিগের কৃত কর্ম্মফল আপনাদিগের ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ যাহার যেমন কর্ম্মফল তাহাকে সেই প্রকার ভোগ করিতে হয়। পুনঃ সৃষ্টি সময়ে জীব ও মন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ লইয়া দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হন। যত দিন না জীব মুক্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে এইরূপে ভ্রমণ করিতে হয়। দেহ মনস্তাপের মূল, দেহ সংসারের কারণ, কর্ম্মফল হইতেই সেই দেহের উৎপত্তি। কর্ম্ম দুই প্রকার পাপ ও পুণ্য, সেই পাপ পুণ্যের অংশ অনুসারেই দেহীর সুখ দুঃখ হইয়া থাকে। যতটুকু পাপ ততটুকু দুঃখ, যতটুকু পুণ্য ততটুকু সুখ ভোগ করিতে হয়। এই সুখ দুঃখ দিবা রাত্রির ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ এবং ভোগ না করিলে শেষ হয় না। ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হয় না।

আত্মা শরীরের কর্ত্তা, যে বস্তু জীব-দেহ হইতে বিভিন্ন হইলে জীবের জীবন থাকে না, ইন্দ্রিয়াদি আর কেহই কার্য্য করিতে পারে না, সেই বস্তুই জীবের আত্মা। আত্মাহীন দেহে সুখ দুঃখ কিছুরই অনুভব হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ,

জ্ঞান কিছুই থাকে না সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে আত্মাই দেহের কর্ত্তা। সুখ দুঃখ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ, আত্মাকে তিরস্কার বা পুরস্কার দিতে হইলে সেই আত্মার বাসস্থল দেহের প্রয়োজন, ক্লেশ ও বিষাদ শরীরের সাহায্য না পাইলে আত্মার বোধগম্য হইতে পারে না। আত্মা একাকী চলিয়া যায় দেহ তাহার সঙ্গে যায় না সুতরাং আত্মার শাস্তি অসম্ভব। প্রত্যেক জীব-দেহে ঈশ্বর আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। পাপ যেমন অনেক প্রকার তাহার শাস্তিও সেইরূপ অনেক প্রকার, পুণ্যও অনেক প্রকার, হর্ষও অনেক প্রকার, অনুতাপই পাপের প্রধান দণ্ড, হর্ষই পুণ্যের প্রধান পুরস্কার। মনুষ্যের হৃদয় পাপ পুণ্য নিরাকরণের তুলাদণ্ড। পুণ্যে হর্ষ ও পাপে অনুতাপ, আপনা হইতে মানব হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহার কৃত কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার দান করিয়া থাকে; এই দণ্ড দেখিয়াই যিনি বুদ্ধিমান তিনি নিজেই পাপ হইতে অপসৃত হইতে শিক্ষা করেন। পাপ পুণ্যের বিচার ও ফল ভোগ এই পৃথিবীতেই হইয়া থাকে। পঞ্চ ভূত কেবল পরমাণু সমষ্টি মাত্র, পরমাণু অবিনশ্বর সুতরাং ভূতসমষ্টিরও বিনাশ নাই। মৃত দেহ পুনরায় সেই পঞ্চ ভূতেই মিশায়। যে মানব আজ তোমার সম্মুখে বিরাজমান তাহার শরীর পূর্ব্বজন্মে কোন জীবের পরমাণু দ্বারা নির্ম্মাণ হইয়াছে। সুতরাং সেই ভূতপূর্ব্ব জীবের পুনর্জন্মের ফল তোমার সম্মুখস্থ মানব।

যে আত্মা যে পরিমাণে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত; যে আত্মা যে

পরিমাণে বিষয় বাসনা শূন্য, সেই আত্মা সেই পরিমাণে উন্নত ; ধার্ম্মিকের আত্মা, পাপাত্মার আত্মা হইতে অনেক উন্নত। সেই উন্নতিশীল আত্মা দেহ ত্যাগ করিলেও তাহার সেই উন্নত স্বভাব নষ্ট হয় না ; বরং সংসারের যাহা কিছু বাসনা, যাহা একটু প্রবৃত্তি ছিল তাহা বন্ধ হইয়া আত্মা ক্রমশঃ উন্নতির পথে গমন করিতে লাগিল। আত্মা পুরুষ এবং দেহ প্রকৃতি। এই আত্মা যে পর্য্যন্ত না প্রকৃতিতে সংযুক্ত হন সেই পর্য্যন্ত তিনি নিষ্ফল ও নির্গুণ অবস্থায় থাকেন, প্রকৃতির মিলনে তাঁহার ইচ্ছা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইলে, পুনর্ব্বার তিনি পূর্ব্ববৎ স্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ ও নির্লিপ্ত ভাব প্রাপ্ত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মার যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি বাসনাদি বর্ত্তমান থাকে সে পর্য্যন্ত আত্মা পাপ দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি সগুণ, সর্ব্ব বিষয়ে লিপ্ত, বাসনাদি সংযুক্ত ; আর দেহ পরিত্যাগ করিলে, পুনর্ব্বার তিনি পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হন। আত্মা প্রথমে নির্গুণ থাকিলেও দেহ আশ্রয় হইতেই গুণ সম্পন্ন হইতে হয়, এবং যে পর্য্যন্ত তিনি মোক্ষ লাভে সমর্থ না হন, সে পর্য্যন্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হয়।

পশ্বাদি দেহ হইতে মনুষ্য দেহ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন জন্য অতিশয় কষ্ট ও চেষ্টা করিতে হয়, পশু হইতে মনুষ্য হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তাহা অপেক্ষা কঠিন। মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন। শুভকার্য্যের

অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব পাইতে পারে, কিন্তু অনায়াসে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না। সমস্ত ভোগ আশা ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। সকাম শুভ কার্য্য সাধন দ্বারা মুক্তির পথ আরও দুর্গম হইয়া উঠে। জীব দেবলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগে মত্ত হইয়া ভোগাবসানে মর্ত্ত্যলোকে আসিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং মহাপুরুষ কখন দেব-ধাম কামনা করেন না কারণ তাহা কর্ম্মফল জন্য চিরস্থায়ী নহে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় সকলের বেগ সম্বরণ করিতে হয়। রিপুবর্গের বশীকরণ, অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করণ, সর্ব্বভূতে সম দর্শন, অভিমান ত্যাগ ইত্যাদি মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপাদান। তাহা ছাড়া শমদমাদি, অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এবং উপরতি, শম অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মনন ব্যতীত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দম অর্থাৎ শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত উষ্ণ সহন, সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে মনের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু বাক্য এবং বেদান্ত বচনে বিশ্বাস, উপরতি অর্থাৎ মোক্ষের ইচ্ছা, এই কয়েকটি গুণও মানবের থাকা উচিত।

মনুষ্যত্ব লাভ হইলেও মুক্তি ইচ্ছা সহজে হয় না। বিষয় ভোগে যতদিন না ক্লেশ উপলব্ধি হয় ততদিন জীব মহা জিতেন্দ্রিয় ও যোগীন্দ্র হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। বাসনা ত্যাগই মুক্তির প্রধান উপায়। মুক্তির ইচ্ছা হইলেই

যে মুক্তি পদ লাভ করিবে তাহা নহে। মহাপুরুষদিগের সহিত সদা সঙ্গ না করিলে মুক্তির পথ দেখাইবে কে? সৎপুরুষ সহবাস জীবের সৌভাগ্য সাপেক্ষ। ইচ্ছা করিলেই সাধু দর্শন হয় না। সাধুগণ প্রায়ই নির্জ্জন স্থানে থাকেন, কখন দৃষ্টি-গোচর হইলেও সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না। চিনিতে পারিলেও নিকটে রাখিতে চাহেন না। নিকটে থাকিবার অধিকার পাইলেও তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ের ভাব আমরা বুঝিতে পারি না। নদী পারের জন্য যেমন নাবিকের নিকট নৌকা লইতে হয়, সেইরূপ সংসার সাগর পার হইবার জন্য মহাপুরুষ সংসর্গ করিয়া উপায় লাভ করিতে হয়। সৎসঙ্গ দ্বারা সমস্তই সুলভ হইয়া পড়ে। ধার্ম্মিকের আত্মা ধর্ম্ম বলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অবশেষে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই উন্নতি এক মাসে বা এক বৎসরে হয় না। বহুকাল চেষ্টা করিলে তবে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সেই প্রকার পাপীর আত্মাও ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বর্গ ও নরক বাস আর কিছুই নহে, কেবল আত্মার উন্নতি ও অবনতি মাত্র, আত্মার উন্নতি ও অবনতির সহিত আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য তাহার নানা স্থানে নানা প্রকার জন্ম হইয়া থাকে।

এই বিশাল বিস্তৃত জগতে কে কোথায় কি ভাবে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইল তাহার অনুসন্ধান হয় না বলিয়াই পুনর্জন্ম সাধারণে বিশ্বাস করে না। পুনর্জন্ম ও পরকাল এ সকল আমরা দেখিতে পাই না। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কেহ সাক্ষাতে আসিয়া

বলে নাই কেবল অনুমান ও যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয়, নতুবা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কিছুরই পার্থক্য থাকে না। লোকে পাপ করিতে ভীত হয় কেন? কেবল পরকালে বিশ্বাস আছে বলিয়া এবং পরকালে ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে সেই ভয় থাকার জন্য, ইহ-জীবনে কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহ জ্যোতিষী, কেহ উচ্চ অঙ্গের গায়ক, কেহ বাদ্য যন্ত্রে মহা পটু ইহার কারণ কেবলমাত্র পূর্ব্বজন্মে তাহারা সেই সেই বিদ্যায় পটু ছিল, ইহ-জন্মে সেই আত্মাই আছেন দেহ মাত্র প্রভেদ সুতরাং তাহাদের সেই সকল বিষয় অতি সহজে অভ্যাস হয়, শিখিতে আর তত কষ্ট পাইতে হয় না। যদি কর্ম্মফল না থাকিত তবে এত প্রকার অবস্থার ভেদ হইত না। ভাল মন্দ কার্য্যের জন্যই জীবকে নানা প্রকার অবস্থায় পতিত হইতে হয়। ভাল কার্য্যে আত্মার উন্নতি অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি হয়, মন্দ কার্য্য করিলে আত্মার অবনতি অর্থাৎ আত্মা নীচগামী হয়। এই বিষয় "তত্ত্বজ্ঞানে" বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আত্মবোধ

আত্মবোধ অর্থাৎ আপনাকে চিনিয়া লওয়া। আমি যদি আমাকে জানিতে পারি, তবে আমি ভগবানকেও জানিতে পারি। আমি যত দিন আমাকে না জানিব তত দিন ভগবানকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিলেও জানিতে পারিব না। আমি কি, ইহা জানিতে হইলেই আত্মা, মন ও বুদ্ধি এই তিন পদার্থের তত্ত্ব জানা আবশ্যক, এক আত্মা শরীরের প্রধান জিনিস বা মালিক অর্থাৎ কর্ত্তা ইহা নিশ্চয়। পৃথিবীর সূর্য্য যেমন কর্ত্তা ও আলোক প্রদান করাতে জীবসকল সেই আলোকের আশ্রয়ে কার্য্য করে কিন্তু সূর্য্য নিজে কিছুই করে না। মনুষ্য শরীরে আত্মাও সেই প্রকার সূর্য্যের স্বরূপ কর্ত্তা ও আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, সেই আলোকের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু আত্মা নিজে কিছু করেন না। এক্ষণে দেখা উচিত আত্মা সাকার কি নিরাকার এবং দেহের কোন স্থানে কি ভাবে থাকেন। যাহাকে আত্মা বলা যায় তাহা অবশ্যই দেশব্যাপী কিন্তু তাহার কোন বিশেষ আকার নাই যাহার সহিত তুলনা করা যায়। তোমার আত্মা ও আমার আত্মা একই পদার্থ। যেমন একখানি কাগজের উপর নানা প্রকার চিত্র আঁকা থাকিলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র কাগজ, সেইরূপ এই জগতে সকলের আত্মাই এক। কিছুদিন

একমনে আত্মাকে জানিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে আত্মা অগ্নিকণা তুল্য হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আত্মা থাকিলেই পরমাত্মা আছেন ইহা নিশ্চয়, যিনি পরমাত্মা তিনিই ঈশ্বর। ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে আত্মা রূপ বিশেষ, সেইজন্য চেষ্টা করিলে নিশ্চয় দেখিতে পাওয়া যায়; অনেক মহাপুরুষ দেখিতে পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সুতরাং আত্মা সাকার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আত্মাকে জানিতে পারিলে আপনাকে জানা যায় এবং পরমাত্মাকে জানিলেই ভগবান বা ঈশ্বরকে জানা যায়। আত্মা পরমাত্মার অংশ বলিয়া জানিবে। আত্মাকে জানিলেই পরমাত্মাকে জানা যায়।

মন ও বুদ্ধি ইহারা সাকার কি নিরাকার ইহা অনেকের জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। মন বিশ্বব্যাপী নহে, মন অবশ্যই কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহা হইলে মন নিশ্চয়ই বস্তু বিশেষ। সকলেই বলেন আমার মন তোমার মন ইত্যাদি এবং প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য ও পৃথক্ বেশ বুঝা যায়, আর মনের কার্য্যও যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় সুতরাং মন সাকার। যদি মনের স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম্ম অস্বীকার করা যায় তবে মনকে আর বস্তু বলিতে পারা যায় না, তাহা হইলে মনকে কোন প্রকার স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণ মাত্র বলিতে হইবে। সাধারণতঃ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দ্রব্যের আকার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় না

বলিয়া মনের আকার কিরূপ তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আকার কথার যথার্থ যাহা অর্থ তাহা জ্ঞাত হইলে, কাহার মনে আর গোল থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ যে তোমার মন তোমার দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, অথচ উহা কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই এরূপ ধারণা তুমি কখনই করিতে পারিবে না, সুতরাং মন সাকার নিশ্চয়। সেইজন্য মনের কার্য্যও পৃথক্ তাহা চেষ্টা করিলেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বুদ্ধি জগৎব্যাপী নহে, নিশ্চয়ই কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি বস্তু বিশেষ। বুদ্ধি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই জন্যই বলিয়া থাকে সকলের বুদ্ধি সমান নহে, আর যাহার বুদ্ধি কম, তাহাকেই লোকে বোকা বলে ; তাহা হইলে বুদ্ধির স্থানব্যাপকতা শক্তি আছে সুতরাং বুদ্ধি সাকার, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর ভাল মন্দ বিচার করা বুদ্ধির কার্য্য তাহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মন ও বুদ্ধির থাকিবার স্থান মস্তক, তাহা সামান্য চেষ্টা দ্বারা জানিতে পারা যায়। বুদ্ধি জীব শরীরে দর্পণের স্বরূপ।

এক প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য চলিতেছে, এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগতচক্র ঘুরিতেছে কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্য সম্বন্ধ রহিত,

ইহা কখনও তাহারা ভাবিতেন না। হিন্দুদিগের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্ম চৈতন্য চেতনাযুক্ত।

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলেই উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল তখন আর উহাতে চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ। এই সমগ্র বিশ্ব, চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ; ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আধার সকল যথা অগ্নি, বায়ু, নদী, পর্ব্বত ও মৃত্তিকা ইত্যাদি সেই দেহের অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে না পান তাহার নিকট অগ্নি জড় পদার্থ।

আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র প্রকাশিত হন না, কেবল নির্ম্মল বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হন। ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ায়, অবিবেকিদিগের বোধ হয় যেন আত্মাই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হন, যে প্রকার মেঘসকল ধাবমান হইলে চন্দ্রকে ধাবমান বলিয়া বোধ হয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে প্রকার সূর্য্যের আলোকের আশ্রয়ে মনুষ্যগণ কার্য্য করে।

রাগ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তি সকল বুদ্ধিরই হইয়া থাকে, এ সকল আত্মার হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ বোধ হয় যে

সুষুপ্তিকালে আত্মা থাকেন কিন্তু বুদ্ধি না থাকাতে রাগ, ইচ্ছা, প্রভৃতি তৎকালে কিছুই থাকে না। যে প্রকার সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শৈত্য এবং অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, সেই প্রকার আত্মার স্বভাব সত্য, চৈতন্য, আনন্দ, নিত্যতা এবং নির্ম্মলতা। আত্মার বর্ত্তমানতা, চৈতন্যের অংশ আর বুদ্ধিবৃত্তি, এই তিনের সংযোগে অবিবেকের দ্বারা, আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি, এই প্রকার প্রবৃত্তি হয়।

আত্মার যে বিকার নাই তাহা বুদ্ধি কদাপি বোধ করিতে পারে না। এই জন্য জীব, সমুদয় বস্তুকে জানিয়া আমি জ্ঞাতা, আমি দ্রষ্টা এইরূপ জ্ঞানে মুগ্ধ হইতেছে; যে প্রকার রজ্জুকে সর্প জ্ঞান হইলে, সর্প জন্য ভয় হয় কিন্তু রজ্জু জ্ঞান হইলে আর ভয় থাকে না, সেই প্রকার জীবের আত্মাকে জীব জ্ঞান হওয়াতে ভয় হইতেছে, আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা এই প্রকার জ্ঞান হইলে আর ভয় থাকে না।

এক আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকাশ করেন। অচেতন এই বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয় সকল আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেমন দীপ সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে কিন্তু কোন প্রকার বস্তু দীপকে প্রকাশ করিকে পারে না। আত্মার স্বরূপ বোধ হইলে তাহার জ্ঞান স্বভাব প্রযুক্ত অন্য জ্ঞানে ইচ্ছা থাকে না, যে প্রকার দীপের স্বীয় রূপ প্রকাশ হইলে অন্য দীপ ইচ্ছা হয় না।

অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন শরীরাদি যে সকল দৃশ্য বস্তু ইহারা

বুদ্বুদের ন্যায় বিনাশী। এই সকল বস্তুর অতীত যে নির্ম্মল ব্রহ্ম তিনিই আমি এই প্রকার জ্ঞান করিবে। আমি দেহ নহি ও আমার দেহ নহে, দেহ হইতে আমি পৃথক্, এই জন্য জন্ম জরা কৃশতা ও মৃত্যু আদি যে সকল দেহধর্ম্ম তাহা আমার নহে এবং ইন্দ্রিয় সকলও আমার নহে, সুতরাং তাহাদিগের বিষয় ও কার্য্য সকলের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই।

আমার মন নাই এই জন্য দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি যাহা কিছু মনের কার্য্য তাহা আমার নহে। আমি অপ্রাণ, আমি অমল এবং শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ ইহা বেদ প্রসিদ্ধ। নির্গুণ, ক্রিয়া রহিত, নিত্য যে আত্মা তিনিই আমি। আমার কোন আকার কি বিকার নাই আমি চিরকাল মুক্ত। আমার যখন কোন ক্ষয় ও কোন সংসর্গ নাই তখন আমি অচল, সর্ব্বদা শুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং আকাশের ন্যায় সমভাবে সকল বস্তুর বাহিরে এবং অন্তরে আছি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মই আমি এইরূপ সর্ব্বদা বাসনা করেন, তাহার নিকট সমুদয় সৃষ্ট বস্তু বিনষ্ট হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকল প্রভেদ পরমাত্মাতে নাই, চৈতন্যময় আনন্দ স্বরূপের একরূপ জন্য তিনি স্বয়ং দীপ্যমান আছেন।

যে প্রকার এক আকাশকে ঘটাদি উপাধি প্রভেদে ঘটাকাশ প্রভৃতি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় এবং ঘটাদি ভগ্ন হইলে যে এক আকাশ আছে তাহাই থাকে, আকাশ ভিন্ন ভিন্ন নহে, সেই প্রকার এক পরমাত্মা নানা উপাধি প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন

বোধ হয়, উপাধি বিনাশ হইলে যে এক পরমাত্মা তাহাই থাকেন, পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। যে প্রকার লবণাদি রস, কিম্বা রক্তাদি বর্ণ, জলে মিশ্রিত হইলে ঐ লবণাদি রস কিম্বা রক্তাদি বর্ণ প্রভেদে জলে ঐ লবণাদি রসের কিম্বা রক্তাদি বর্ণের আরোপ হয়, সেই প্রকার নানা প্রকার উপাধিবশতঃ জাতি নাম ও আশ্রয় প্রভৃতি সমুদয় বস্তু পরমাত্মাতে আরোপিত হয়।

যে প্রকার ধান্যাদিকে অবঘাতের দ্বারা তুষাদি কোষ হইতে পৃথক্ করিলে তাহার স্বরূপ তণ্ডুল মাত্র প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার শরীরাদিতে আবৃত পরমাত্মাকে যুক্তি দ্বারা শরীরাদি হইতে পৃথক করিয়া ভাবিলে তাঁহার শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যে প্রকার উষ্ণতা বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি জড় বস্তুসমূহ যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল ও নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; তাঁহাকে সেই সর্ব্ব অন্তর্যামী জ্ঞানময় নিত্য আত্মা বলিয়া জানিবে। অতএব আত্মাই আমি, আমি বলিতে আর কোন পদার্থকে বুঝায় না। আমিই তিনি, অথবা তিনিই আমি, আমি কিছুই নই, আমার কিছু নাই, সমস্তই তিনি এবং সমস্তই তাঁহার।

মানবরূপ তৃণনিচয় বাসনা বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে যে সকল দুঃখ উপভোগ করে, তাহা বচনাতীত। ইহা আমার, ইহা আমার নহে ইত্যাদি প্রকার

ভ্রম জ্ঞানই সংসার বন্ধনের কারণ এবং আমি বলিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু নহে, সকলই সেই ব্রহ্ম এই জ্ঞান জন্মিলেই মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ উপায়ও নিজের অধীন সুতরাং এরূপ স্বাধীন উপায় থাকিতে যে অসীম সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

তন্ময়ত্ব

জাবনের প্রত্যেক সময় এক একটি কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। মানব জীবনে সেই সময় অনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তাই বলিয়া এক সময়ের কার্য্য অন্য সময়ে হয় না. তাহা নহে। এক বয়সে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, অন্য বয়সে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। সময়ানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাহা কখন বিফল হয় না, অসময়ে কার্য্য করিলে প্রায় বিফল হইতে হয়, দুই একটি সফল হইলেও তাহা সম্পূর্ণ হয় না, কিয়দংশ মাত্র হয়। যোগের সময় বার্দ্ধক্য, যখন চিত্তে কোন কুভাব উদিত হয় না, মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া আইসে সেই সময় যোগ বা উপাসনার উপযুক্ত। যৌবনে উত্তেজিত বৃত্তি সমূহ প্রতিনিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, তিনিও যোগ শিক্ষার উপযুক্ত। যৌবনে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই যোগ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র হইল।

যোগ সাধন করা নিতান্ত সহজ কথা নহে, যোগ শব্দে তন্ময়। এই তন্ময়ত্ব ভাব হৃদয়ে না হইলে যোগ শিক্ষা হইবে না, হইলেও তাহা কোন কার্য্যকারী নহে। যদি তন্ময় হইতে পারা যায়, যদি ঈশ্বরে ও তোমাতে কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত না হয় তাহা হইলে তুমি যোগ শিক্ষা করিয়া সুফল পাইবে ও তুমিই যোগ শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী। যোগ সম্বন্ধে যতগুলি

নিয়ম আছে তাহার মধ্যে ষট্‌চক্র ভেদ সর্ব্বপ্রধান। ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারিলে অন্য সাধনার কোন প্রয়োজন থাকে না। কেবল একমাত্র ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারিলে, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ষট্‌চক্র যোগ শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান। যাহারা ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারেন, নির্ব্বাণমুক্তি তাহাদিগের পক্ষে অতি সহজ। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সেই চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে, মানসিক যে সমস্ত বৃত্তির প্রয়োজন তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে ইহা সাধিত হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তি, বিনা চেষ্টায় ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারেন। অগ্রে ষট্‌চক্র কি তাহা জানা আবশ্যক, তাহার পর ক্ষমতা হইলে ভেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং তখন তাহার মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা বুঝিতে সক্ষম হইবে।

জীবদেহে অন্নময় কোষ অবলম্বন করিয়া মনোময় কোষ; মনোময় কোষ অবলম্বন করিয়া প্রাণময় কোষ; প্রাণময় কোষ অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ; বিজ্ঞানময় কোষ অবলম্বন করিয়া আনন্দময় কোষ অবস্থিতি করেন। অঙ্গোষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন। এই অবস্থান চারি অবস্থায় নিষ্পন্ন হয়। প্রথম বৈশ্বানর, তিনি শরীরস্থ হইয়া চালনা করেন, ইহাই জীবের চেতনাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, তৃতীয় প্রাজ্ঞ, ইহা জীবের নিদ্রাবস্থা, চতুর্থ ব্রহ্ম, সকল প্রাণীতে সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্ম জীব শরীরে অবস্থিত আছেন তাহা জ্ঞাত

হওয়া। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা অ, উ, ম এবং ওম্ মন্ত্র দ্বারা সাধিত হয়। নাড়ী সমূহের মধ্যে নিরন্তর যে বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতেছে তাহা অবলম্বন করিয়া পঞ্চ বায়ুর অবস্থান। এই সকলের মধ্য দিয়া নাড়ী প্রধানা সুষুম্না অন্তরের উর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া কেশমূল পর্য্যন্ত প্রলম্বিত আছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান ও আনন্দময় অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গুহমধ্যে আত্মা বাস করিতেছেন। ভূর্ভূ র্ব প্রভৃতি সকলই তথায় অবস্থিত। এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া নাড়ী প্রধানা সুষুম্নার মধ্যে সংযমিত আত্মাকে প্রবেশ করাইয়া সেই সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হইতে হয়, এই সম্মিলনই ষট্‌চক্রভেদ।

কঠিন যোগ অপেক্ষা সরল যোগ সহজ এবং অধিক ফল প্রদান করে। কঠিন যোগ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা ; সরল যোগ কেবলমাত্র মানসিক শিক্ষা। মানসিক শিক্ষা সমাধা হইলে শারীরিক শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। কঠিন যোগ কুম্ভক, বিকুম্ভক, আনুমীন, উৎক্রান্তি ও দাষ্টি। সরল যোগ সত্য, সৎ ও নির্ব্বিকার। সরল যোগ সহজ সাধ্য এবং সাধারণের গ্রহণ যোগ্য। কঠিন যোগ সাধন সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। সরল যোগ শিক্ষার্থে অরণ্যবাস, কায়িকক্লেশ, কিছুই গ্রহণ করিতে হয় না, কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তি আপন বশীভূত ও সৎমার্গে অনুগমন করাইবার ক্ষমতা হইলেই তদ্দারা মহাফল লাভ করা যায়। কায়িক ক্লেশ, তীর্থ পর্য্যটন, উপবাস কিছু

প্রয়োজন হয় না, যদি চিত্তে চিন্ময়ের মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। সদ্‌বৃত্তির আলোচনায় ও সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে যে ফল, তীর্থ পর্য্যটনে তাহা হয় না। মন পরিশুদ্ধ হইলে, জীব আত্মশুদ্ধ হইলে, চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখন সে আপন হৃদয়ে সকল তীর্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ হয়। যাবতীয় তীর্থ মানবের শরীরে বর্ত্তমান আছে। গঙ্গা নাসাপুটে, যমুনা মুখে, বৈকুণ্ঠ হৃদয়ে. বারাণসী কপালে, হরিদ্বার নাভিতে ইত্যাদি স্বর্গ, মর্ত্তের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র মানব শরীরে বর্ত্তমান আছে। যে পুরী প্রবেশ করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা অর্থাৎ সঙ্কোচ হয় না তাহাই বৈকুণ্ঠ। পাপ আশঙ্কার মূল। যে পাপী, সে সকল কাজেই সঙ্কুচিত হয়, যে নিস্পাপ তাহার কোথাও শঙ্কা নাই, সর্ব্বদাই সে কুণ্ঠাশূন্য, সুতরাং সে বৈকুণ্ঠপুরী গমনে অধিকারী। তাহার হৃদয়ে চিৎস্বরূপ আনন্দময় সৎ-স্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিত।

বৈকুণ্ঠের অর্থাৎ হৃদয়ের নিম্নে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অথবা চন্দ্র ও সূর্য্য অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। এই সঙ্গমে স্নান করিতে পারিলে জীবের সকল পাপ ধ্বংস হয়। গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হৃদয়ের নিম্নে, ইড়া আত্মজ্ঞান ও পিঙ্গলা বিবেক নামে কথিত। গঙ্গা যমুনায় যে প্রকার সম্বন্ধ ইড়া ও পিঙ্গলায় ঠিক সেই সম্বন্ধ, পিঙ্গলা অর্থাৎ বিবেক হইতে ইড়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ; মনকে এই পিঙ্গলা পথে প্রবেশ করাইয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তি দ্বারা ইড়ায় সম্মিলিত করিতে হয়।

পরে ইড়া এবং পিঙ্গলা যেখানে সংযোগ হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে আত্মজ্ঞান ও বিবেক একত্র হইয়াছে, মনকে সেই স্থানে লইয়া স্নান করাইলে অর্থাৎ মনকে আত্মজ্ঞান রূপ সলিলে নিমজ্জিত করিলেই মহা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান জন্মিলে যোগ তাহার নিকট অতি সহজ সাধ্য। আত্মজ্ঞান লাভই যোগের কারণ। সেই আত্মজ্ঞান লাভ করণার্থ যোগ শিক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য গৃহত্যাগ বা অরণ্য-বাসের কোন আবশ্যক করে না। এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা কেবলমাত্র চিন্তা ও তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিলে যোগ ফল ও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অন্য কোন প্রকার কঠিন সাধনা করিতে হয় না, কেবল সেইগুলির অনুধ্যান করিলে যোগ ফল লাভ করা যায়, সেগুলিকেও সরল যোগ বলা যায়। যোগ ফল লাভ করিতে হইলে, যে সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, যাহা সংসাধিত না হইলে যোগ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই নিয়ম ও আকারগুলি সেই নিয়মাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেইরূপ আচরণ ও হৃদয়ে সেইরূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ হইলে, নিশ্চয়ই যোগ ফল লাভ করা যায়। নিয়মগুলি যথা :—

১। অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না, সর্ব্বদা যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি সকলকে প্রফুল্ল করিতে পারেন।

২। জিহ্বা পাপ কথা কহিতে বড়ই তৎপর তাহাকে সংযত করা আবশ্যক।

৩। আলস্য সকল অনর্থের মূল, যত্নপূর্ব্বক আলস্য পরিত্যাগ করিবে।

৪। সংসার ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষার স্থল, সাবধান হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া কার্য্য অবলম্বন করিবে।

৫। কোন ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিবে না, সকল ধর্ম্মই সার এবং তাহাতে অবশ্যই সত্য নিহিত আছে।

৬। দরিদ্রকে দান করিবে, ধনীকে দান করা বৃথা, কারণ তাহার আবশ্যক নাই, সেই জন্য সে আনন্দিত হয় না।

৭। সাধু সহবাসই স্বর্গ এবং অসৎ সঙ্গই নরকবাসের মূল।

৮। আত্মজ্ঞান, সৎপাত্রে দান ও সন্তোষ আশ্রয় করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

৯। যিনি শাস্ত্র পাঠ করতঃ তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহা অনুষ্ঠান না করেন তিনি পাপী হইতেও অধম।

১০। যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠানের মূলে ধর্ম্ম থাকা চাই, নতুবা সিদ্ধি হয় না।

১১। কখন কাহারও হিংসা করিবে না, সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কখন কোন প্রাণী বধ করিবে না।

১২। যে ব্যক্তি পাপ কলঙ্ক প্রক্ষালিত না করিয়া মিতাচারী ও

সত্যানুরাগী না হইয়া, রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করতঃ ব্রহ্মচারী হয়, সে ব্যক্তি ধর্ম্মের কলঙ্ক স্বরূপ।

১৩। ছাদহীন গৃহে যেমন বৃষ্টিধারা পতিত হয়, চিন্তাহীন মনেও সেইরূপ রিপুগণ প্রবেশ করে।

১৪। পাপীলোকে ইহকালে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, যখনই সে নিজের কুকার্য্য মনে করে তখনই তাহার প্রাণে অনুতাপ জাগিয়া উঠে।

১৫। (ক) চিন্তাশীলতা অমরত্ব লাভের পথ, চিন্তাহীনতা মৃত্যুর পথ।

(খ) গর্ব্বিত হইবে না, কাম উপভোগ চিন্তা করিবে না।

১৬। শত্রু শত্রুর যত অনিষ্ট করিতে না পারে, কুপথগামী মন তাহা অপেক্ষাও অনিষ্ট করে।

১৭। মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পের সৌন্দর্য্য অথবা সুগন্ধির অপচয় না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তুমিও সেই প্রকার পাপে লিপ্ত না হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে।

১৮। এই পুত্র আমার, এই ঐশ্বর্য্য আমার, অতি অজ্ঞানী লোকে এই প্রকার চিন্তা করিয়া ক্লেশ পায়। সে নিজে তাহার নিজের নয়, পুত্র বা সম্পত্তি তাহার কি প্রকারে হইতে পারে।

১৯। অল্প লোকেই পর পারে উত্তীর্ণ হয়, অধিকাংশ লোকেই ধর্ম্ম ভাণ করিয়া উপকুলে দৌড়াদৌড়ি করে।

২০। সংগ্রামে যে ব্যক্তি লক্ষ লোক জয় করিয়াছে সে ব্যক্তি প্রকৃত বিজয়ী নহে। যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই প্রকৃত বিজয়ী।

২১। পাপ আমাকে আক্রমণ করিবে না এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। ফোঁটা ফোঁটা জলে, জলপাত্র পূর্ণ হয়, নির্ব্বোধ লোকে ক্রমে ক্রমে পাপময় হইয়া যায়।

২২। কাহাকেও কর্কশ কথা বলিও না, কর্কশ কথা বলিলে কর্কশ কথা শুনিতে হইবে। আঘাত করিলে আঘাত সহ্য করিতে হইবে। কাঁদাইলে কাঁদিতে হইবে।

২৩। যাহারা বাসনা জয় করিতে পারে নাই, উলঙ্গ দেহ, জটা ধারণ, ভস্ম লেপন, উপবাস, মৃত্তিকা শয্যা ইত্যাদি তাহাদের মন পবিত্র করিতে পারে না।

২৪। অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দাও, নিজেও সেইরূপ হও, যে আপনাকে বশীভূত করিয়াছে, সে অন্যকেও বশীভূত করিতে পারে, আপনাকে বশ করাই কঠিন।

২৫। পাপ ও পুণ্য সকলই নিজের কৃত, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না।

২৬। এই জগৎ জলবুদ্বুদ্ মরীচিকা সদৃশ, যে এই জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, মৃত্যু তাহাকে দেখিতে পায় না।

২৭। ধাবমান শকটের ন্যায় উত্তেজিত ক্রোধকে যে সংযত করিতে পারে সেই প্রকৃত সারথী, অন্য লোকে কেবল বল্‌গা ধারণ করিয়া থাকে।

২৮। প্রেম বলে ক্রোধ জয় কর, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল জয় কর, নিঃস্বার্থতা দ্বারা স্বার্থ জয় কর এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা জয় কর।

২৯। গুরু যাহা উপদেশ দিবেন তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পালন করিবে।

৩০। বৃথা বাক্য ব্যয় করিবে না, যে অধিক কথা কহে সে নিশ্চয় অধিক মিথ্যা কথা বলে। যতদূর সাধ্য কথা কম কহিতে চেষ্টা করিবে, সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি মিলিবে।

যোগ শিক্ষার জন্য অরণ্য বাস অথবা অনাহারী থাকিতে হয় না। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বশীভূত ইন্দ্রিয়াদিকে ইষ্ট সাধনে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে তাহার লোকালয় বা অরণ্য সকলই সমান, একাগ্রতা যোগের প্রাণ, এই একাগ্রতা নিবন্ধন যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হইবে, জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় কোন প্রভেদ লক্ষিত হইবে না, তখনই তিনি প্রকৃত যোগী। ঈশ্বর লাভার্থ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না ভক্তি দ্বারাই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হইতে পারেন, ভক্ত ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাতে সমাহিত হন; তাহাকেই সমাধি বলে।

সমাধি অর্থে ব্রহ্মে মন স্থির করণ, পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় একীকরণ; সুতরাং সমাধি যোগের ফলস্বরূপ। চিত্ত বশীভূত হইয়া সকল কার্য্যে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই যখন অবস্থান করে তাহাকেই সমাধি বলে। যে অবস্থায় বিশুদ্ধ

অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত, বুদ্ধি মাত্র লভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে লাভ বলিয়া বোধ হয় না, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থির বুদ্ধির দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মায় বশীভূত করিবে। রজঃ এবং তমঃ বিহীন যোগীগণ এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন; সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী, সমাহিত চিত্তে সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। কামনাশূন্য হইয়া যিনি যোগ অভ্যাস করেন তিনিই সমাধিস্থ বা মুক্ত হইবার যোগ্য। ঈশ্বরে লীন হইয়া জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় মিলনের নাম মুক্তি।

সমাধি অর্থাৎ তন্ময় ভাব। যখন জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় পৃথক্ জ্ঞান না থাকে, যখন জীব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, আর বহিরিন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া যায় সেই সময়ের নাম সমাধি। মনকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না করিয়া ইন্দ্রিয় সমুহকে মনের বশীভূত করা যোগ শিক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে ইন্দ্রিয়

উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তিসমূহ সংযত ও চিত্তের বশীভূত করিতে হইবে, পরে চিত্তকে চিত্তের বশীভূত অর্থাৎ সাংসারিক ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির বশীভূত চিত্তকে কামনা শূন্য চিত্তে সমানিত করিতে হইবে; বিবিধ লক্ষ্য হইতে চিত্তকে বিচ্যুত করিয়া কাম্য লক্ষ্যের পন্থাগামী করিতে হইবে, বিবিধ চিন্তা হইতে ক্রমে ক্রমে সংযত করিয়া সর্ব্বদা আত্ম চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যোগ দুই প্রকার সকাম ও নিষ্কাম। সকাম যোগী মোক্ষ প্রাপ্ত হন না, নিষ্কাম যোগীই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনই যোগের মূল।

তন্ময়ত্ব যোগের আর একটি প্রধান অঙ্গ ও যোগের ফল স্বরূপ। তন্ময়ত্ব ভাব উপস্থিত হইলে আর কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, যোগের সিদ্ধি এই তন্ময়ত্ব ভাব; এই ভাব উপলব্ধি হইলে কাম্য বস্তুর প্রতিই কেবল একমাত্র দৃষ্টি থাকে, অন্য কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অন্য চিন্তার ধারণা থাকে না, হৃদয়ে কেবল সেই একমাত্র কাম্য বস্তুর অস্তিত্বই উপলব্ধি হয়। মন ও অভীষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, মনে সেই কাম্য বস্তু এবং সেই কাম্য বস্তুতে কেবল মন মাত্র থাকে, কাম্য বস্তু ভিন্ন মনের অন্য চিন্তা থাকে না, জগতের অন্য কিছুই দেখিতে পায় না, সেই অভীষ্ট বস্তুই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে, তখন সে জগতে থাকিয়াও জগৎ বাসী নহে। কাম্য বস্তুতেই তাহার অস্তিত্ব, কাম্য বস্তুর অবর্ত্তমানে বুঝি তাহার অস্তিত্ব থাকে না, কাম্য বস্তুর সহিত মিলিয়া যায়, ইহারই নাম তন্ময়ত্ব।

যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সময় সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যে তন্ময় হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে সে কার্য্যে কখন বিফল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহার সিদ্ধি নিশ্চয়। যাহার যেরূপ ভাবনা সে কার্য্যেও সেইরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি অভীষ্ট বিষয়ে যে পরিমাণে মনোযোগ দিবে, সে ব্যক্তি সেই কার্য্যে ততটুকু সিদ্ধি লাভ করিবে। কোন কার্য্যে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে সেই কার্য্যে সম্পূর্ণ তন্ময় হইবার প্রয়োজন। তন্ময়ত্ব একাগ্রতা না হইলে হয় না, কোন কার্য্যে প্রস্তুত হইতে হইলে একাগ্রতা শিক্ষা করিতে হয়, একাগ্রতা না হইলে সে কার্য্যে তন্ময়ত্ব ভাব জন্মায় না। কার্য্যে বিশ্বাস না করিলে বা না জন্মিলে, সিদ্ধি লাভে কৃতনিশ্চয় না হইলে, সে কার্য্যে কখন অগ্রসর হইবে না, কারণ তাহার সিদ্ধি হইবে না। অগ্রে কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, কারণ বিশ্বাসই সিদ্ধি লাভের মূল। তন্ময়ত্ব, একাগ্রতা, সিদ্ধি লাভ, সকলের মূলেই বিশ্বাস।

সৃষ্টিকালে ভগবান সর্ব্ব প্রথমে মায়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই মায়া জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপা এবং কার্য্য কারণ রূপা ও সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ বিশিষ্টা। তাহার দুই শক্তি, একটি আবরণ অর্থাৎ মায়া দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হওয়াতে নিত্য সত্য পরমাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া আপনাকে অহঙ্কার সাহায্যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, অপরটি বিক্ষেপ যাহা দ্বারা জীব অসত্য বস্তুতে সত্যারোপ করতঃ জগৎকে নিত্য এবং

সত্য মনে করে, আর পরমাত্মাকে ভুলিয়া অনিত্য বিষয় বস্তুতে মত্ত থাকে।

তন্ত্রমতে ষট্‌চক্র ভেদ ঃ—ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যস্থিতা, সত্ব রজঃ তমঃ গুণ বিশিষ্টা, চন্দ্র, সূর্য্যাগ্নি রূপা, ধুস্তুর কুসুমের ন্যায় শুভ্রা, সুষুম্না নাড়ী আছে ; ঐ নাড়ী চারিদল বিশিষ্টা, মূলাধার পদ্ম হইতে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত গুহ্যে, লিঙ্গে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে এবং মস্তকে ; মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাক্ষ এবং সহস্রার নামে সাতটি পদ্ম আছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মণির ন্যায় প্রভা বিশিষ্টা দেদীপ্যমানা বজ্রা নাম্নী নাড়ী আছে, আবার তাহার অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যুক্ত, ঊর্ণণাভ (মাকড়সার) সূত্রের ন্যায় চিত্রা নাড়ী আছে। নির্ম্মল জ্ঞানোদয় না হইলে এই নাড়ীকে কেহ জানিতে পারে না। আবার এই চিত্রা নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্ম নাড়ী নামে অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল আর একটি নাড়ী আছে, ইহার ছিদ্র দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রার পদ্ম হইতে সুধা ক্ষরিত হয় ; যোগিগণ সেই সুধা মূলাধার পদ্মস্থ কুণ্ডলিশক্তি দ্বারা পান করিয়া সিদ্ধ্যানন্দ ভোগ করেন।

(১) মূলাধার চক্র গুহ্যে আছে, ইহা চতুর্দ্দল, রক্তবর্ণ, স্বর্ণাভ, অধোমুখ পদ্ম (সাধক ধ্যানকালীন ঊর্দ্ধমুখ চিন্তা করিবেন)। ইহার চারিটি দলে বং, শং, ষং, সং, এই চারিটি বর্ণ আছে, কর্ণিকাতে চতুষ্কোণ পৃথ্বী চক্র আছে ঐ চক্র উদ্দীপ্ত

পীতবর্ণ অষ্ট শূলযুক্ত, তাহার মধ্যে লং অর্থাৎ পৃথিবী বীজ আছে এবং তৎসহ লক্ষ্মীবীজ আছে। ঐ চক্রের দেবতা ইন্দ্র, তাঁহার ক্রোড়ে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, ভৌতিক পদার্থাদি সৃষ্টি করিতেছেন এবং চতুর্ব্বেদ পাঠ করিতেছেন। ঐ চক্রে রক্ত-বর্ণ, চতুর্ব্বাহু, দ্বাদশ সূর্য্যতুল্য, ডাকিনী শক্তি আছেন। বজ্রা নাড়ীর মুখে কামরূপ নামে পীঠ আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রোদ্ভুত কন্দর্প বায়ু জীবাত্মাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে শরদেন্দুসন্নিভ লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু আছেন। ঐ লিঙ্গের পাত্রে সার্দ্ধ ত্রিপাক বেষ্টন করিয়া ব্রহ্ম নাড়ীর মুখের কাছে মুখ দিয়া কুণ্ডলি শক্তি নিদ্রিতা আছেন, ইনি বিদ্যুদ্রূপিণী মহামায়া, ইনি ভ্রমরের ন্যায় মধুর গুণ্ গুণ্ নাদ করিতেছেন, ইনিই শব্দ জননী, ইনিই শ্বাস প্রশ্বাস বিভাগ দ্বারা প্রাণিগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনীর দেহ মধ্যে পরমাকলা ত্রিঅংশ রূপা প্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন।

(২) স্বাধিষ্ঠান চক্র লিঙ্গ মূলে। ষড়দল অরুণবর্ণ পদ্ম আছে। ইহার ষড় দলে ষড় বর্ণ বং, ভং, মং, যং, রং, লং, আছে। তন্মধ্যে শ্বেত পদ্মাকার বরুণ দেবতার চক্র আছে, এই চক্র মধ্যে শরচ্চন্দ্রদ্যুতি, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রধারী, মকরারোহী, বং বীজ রূপ বরুণ দেবতা আছেন। ঐ দেবতার ক্রোড়ে চতুর্ব্বিংশতি লক্ষণযুক্ত পীতাম্বর নারায়ণ আছেন। এই চক্রের শক্তি লক্ষ্মীরূপা রাকিনী।

(৩) মণিপুর চক্র নাভিমূলে। দশ দল নীল বর্ণ পদ্ম আছে। দশ দলে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং দশ অক্ষরযুক্ত বর্ণ আছে। তাহার ঠিক মধ্যে রং কারাত্মক ত্রিকোণ বহ্নি বীজ আছে। স্বস্তিমণ্ডল তাহাকে বেস্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ বহ্নি দেবতা চতুর্ব্বাহু, আরক্ত সূর্য্য সম এবং মেষবাহন। তাঁহার ক্রোড়ে ইস্টদাতা এবং সংহারকারী মহাকাল আছেন। এই চক্রের শক্তি লাকিনী, ইনি শ্যামবর্ণা।

(৪) অনাহত চক্র হৃদয়ে। সিন্দুরবর্ণ দ্বাদশ দল পদ্ম আছে। দ্বাদশ দলে কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং বর্ণযুক্ত পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ষট্‌কোণ ধূম্রবর্ণ বায়ুমণ্ডল আছে তন্মধ্যে যং কারাত্মক বায়ু বীজ দেবতা, কৃষ্ণসার মৃগারূঢ়া হইয়া আছেন। ঐ বীজের মধ্যে হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ অভয় বরদাতা ঈশান মহাদেব আছেন। এই চক্রের শক্তি কাকিনী, ইনি পীতবর্ণা আনন্দময়ী। ঐ পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অতি কোমল ত্রিকোণ শক্তি আছে ঐ শক্তি মধ্যে স্নুবর্ণ বর্ণ বাণলিঙ্গ মহাদেব আছেন। অধিকন্তু ঐ পদ্ম মধ্যে আর একটি দ্বিতীয় অষ্টদল পদ্ম আছে, তাহাতে এক কল্পতরু আছে, তাহার তলায় মণিপীঠে হংসরূপী জীবাত্মা আছেন। সাধক এই স্থানে গুরু উপদিষ্ট ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলে আত্ম দর্শন হইবে।

(৫) বিশুদ্ধ চক্র কণ্ঠদেশে। ধূম্রাভ ষোড়শ দল বর্ণ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ষোড়শ

স্বরযুক্ত পদ্ম আছে। কর্ণিকার মধ্যে সুধা কর্ষণ উজ্জ্বল শরীর-ধারী, শুভ্রবর্ণ, করিপৃষ্ঠে শুক্লাম্বর পরিধৃত, গোলাকার আকাশ চক্রধারী আছেন। ঐ চক্র মধ্যে হংসাকার, পাশাঙ্কুশধারী, দ্বিভুজ এবং অভীতিবরপ্রদ আকাশবীজ আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে পঞ্চ মুখ, ত্রিনেত্র দশ বাহু হরগৌরী আছেন। উক্ত কর্ণিকার মধ্যে চন্দ্র মণ্ডলের সুধাপানাসক্তা, পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা সাকিনী শক্তি আছেন।

(৬) আজ্ঞা চক্র ভ্রূযুগল মধ্যে। ধ্যানের নিকেতন শুক্ল বর্ণ দ্বিদল হ ক্ষ বর্ণযুক্ত পদ্ম আছে। এই স্থানে ইড়া পিঙ্গলা, বরুণা অসীরূপে মিলিত হইয়া বারাণসী তীর্থ হইয়াছে। ঐ পদ্মে শুক্লবর্ণা ষড়মুখী হাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার চতুর্ভুজে পুস্তক, কপাল, ডমরু এবং জপমালা আছে। এই পদ্ম ধ্যানে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। এই পদ্ম মধ্যে মন এবং কর্ণিকাতে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই স্থান পরম লয়ের স্থল, তথায় শুক্ল নামে মহাকাল এবং ইতরাক্ষ সিদ্ধলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। এই শিব অর্দ্ধ নারীশ্বর নামে প্রখ্যাত। আজ্ঞাচক্রের জ্ঞান জন্মিলে জীব অদ্বৈতবাদী হয়।

আজ্ঞা চক্রের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে শুদ্ধ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, প্রদীপ শিখাবৎ জ্যোতির্ম্ময়, ওঁকারাত্মক অন্তরাত্মা নিরন্তর বাস করেন। তাহার উপর অর্দ্ধচন্দ্র, তদুপরি বিন্দুরূপী নাদ, তথায় শক্তি রূপাধার স কারাত্মক পূর্ণ শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ আছেন। ঐ ওঁকারের উর্দ্ধভাগে আকাশ এবং নিম্নভাগে

পৃথিবী, তন্মধ্যে নিরলম্ব ভগবান আছেন। ঐ ওঁকারের উপরিভাগে দ্বিভুজ মহানাদ নামে শিবাকার বায়ুর লয় স্থান আছে। উক্ত আজ্ঞা চক্রের ঊর্দ্ধদেশে শঙ্খিনী নাম্নী নাড়ীর অগ্রে আকাশে বিসর্গরূপ যুগল বিন্দু আছে। তাহার অধঃস্থলে পূর্ণেন্দুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরুণ তপন রশ্মি সদৃশ, কেশরযুক্ত সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে আছে। তাহাতে যথাস্থানে পঞ্চাশত মাতৃকা বর্ণ আছে। ঐ স্থানে নির্ম্মল শশঃ ও চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। ঐ চন্দ্র অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ আকার ত্রিকোণ যন্ত্র আছে; ঐ যন্ত্র মধ্যে গুহ্যতম চিদ্রূপাকার শূন্য স্থান আছে, তথায় পরমাত্মার স্বরূপ পরম শিব বিরাজ করিতেছেন। তিনি যোগানন্দ জ্ঞান এবং মঙ্গলদাতা ইঁহাকে পরমহংসও কহে। এই স্থানেই শৈবের কৈলাস, বৈষ্ণবের গোলক, শাক্তের মহাশক্তির নিজাবাস। এই সহস্রদল পঙ্কজাভ্যন্তরে প্রাতঃ তপনের ন্যায় লোহিত বর্ণা, মৃণাল সূত্রবৎ অতি সূক্ষ্ম এবং বিদ্যুন্মালার ন্যায় জ্যোতিঃ বিশিষ্টা, শুদ্ধা, বিকার বর্জ্জিতা এবং নিত্য প্রকাশা, ক্ষয়োদয় রহিতা, অধোমুখী এবং পূর্ণানন্দ শ্রেণী হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হইতেছে তাহা ধারণশীলা, এবম্ভুতা অমা নাম্নী শশিকলা আছে। উহার মধ্যে কেশাগ্রের সহস্রাংশ পরিমিত এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকার, দ্বাদশাদিত্য প্রভা বিশিষ্টা, প্রাণিগণের ইষ্ট দেবতা, নির্ব্বাণ নাম্নী কলা আছেন; তাহা মহাকুণ্ডলিনী নামে খ্যাত। পুনর্ব্বার এই নির্ব্বাণ নাম্নী কলার মধ্যে কোটী সূর্য্য কান্তিমতী শিবলিঙ্গ হইতে

প্রেমধারা বিলাসিনী কর্ম্মফলদায়িনী নির্ব্বাণ শক্তি আছেন। ঐ নির্ব্বাণ-শক্তির মধ্যভাগে যোগী ও মহাত্মাদিগের চিন্তনীয় পরম সুখময় নিত্যানন্দ স্বরূপ শাশ্বত তুরীয় ব্রহ্ম আছেন।

নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা যোগী দীর্ঘ জীবন, ব্যোম গমন ক্ষমতা, অন্তর্দ্ধান শক্তি, অন্য দেহ প্রবেশ পটুতা, দূরদর্শন এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল দর্শন এবং অষ্ট সিদ্ধি, (অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব এবং কামাবশায়িত্তা লাভ করিতে পারেন। অণিমা অর্থাৎ অণু তুল্য ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক্ষমতা। লঘিমা অর্থাৎ লঘুত্ব হেতু ঊর্দ্ধ গমন ক্ষমতা। মহিমা অর্থাৎ বৃহৎ এবং মাহাত্ম্যযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা। প্রাপ্তি অর্থাৎ বিশ্বের তাবৎ জিনিস করতলস্থ হওয়া। প্রাকাম্য অর্থাৎ যথেচ্ছাকারিত্ব। ঈশিত্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব। বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা। কামাবশায়িতা অর্থাৎ সকল প্রকার কামের পরিপূরণ করিয়া শেষে নিষ্কাম হওয়া। ভক্তি না জন্মিলে সাধক পুরুষকার সাধন দ্বারা যতই উন্নত হউক তথাপি তাহার পতন হইবার সম্ভাবনা থাকে। তপস্যার উচ্চ সোপানে উঠিয়াও তপস্বীর কখন কখন অবিশ্বাস এবং নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সঙ্গে একবার ভক্তি জন্মিলে আর অবিশ্বাস কখন আসিতে পারে না। যোগিগণ তখন অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহাই তন্ময়ত্ব। কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ করিয়া অন্যমনা হইলেই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব হইলেই বন্ধন মোচন হইয়া মুক্তি লাভ করে।

কয়েকটি সার কথা

শিষ্য। পৃথিবীতে সৃষ্টির আদিতে কি ছিল ?

গুরু। পঞ্চভূত ও ঈশ্বর।

শিষ্য। পৃথিবী এবং জীব সৃষ্টি কে করিয়াছেন ?

গুরু। ঈশ্বর।

শিষ্য। সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন কে ?

গুরু। ব্রহ্মা।

শিষ্য। ব্রহ্মা কে ?

গুরু। ঈশ্বরের শক্তি।

শিষ্য। সৃষ্টি পালন করেন কে ?

গুরু। বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ।

শিষ্য। বিষ্ণু কে ?

গুরু। ঈশ্বরের শক্তি।

শিষ্য। সৃষ্টি ধ্বংস বা লয় করেন কে ?

গুরু। মহেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব।

শিষ্য। মহাদেব কে ?

গুরু। ঈশ্বরের শক্তি।

শিষ্য। ব্রহ্মাণী কে ?

গুরু। ব্রহ্মার শক্তি।

শিষ্য। লক্ষ্মী কে ?

গুরু। বিষ্ণুর শক্তি।

শিষ্য। দুর্গা কে ?

গুরু। মহাদেবের শক্তি।

শিষ্য। সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন কে ?

গুরু। ঈশ্বর।

শিষ্য। বন্ধন কাহাকে বলে ?

গুরু। বিষয়ে অনুরাগ।

শিষ্য। মুক্তি কাহাকে বলে ?

গুরু। বিষয়ে বিরক্তি ও ঈশ্বরে লয়।

শিষ্য। ঘোর নরক কি ?

গুরু। স্বীয় দেহ।

শিষ্য। স্বর্গ কোথায় ?

গুরু। আশা ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ।

শিষ্য। সংসার বন্ধন কিসে যায় ?

গুরু। আত্মবোধ হইলে।

শিষ্য। কি করিলে মুক্তি হয় ?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞান হইলে।

শিষ্য। নরকের কারণ কি ?

গুরু। নারী।

শিষ্য। স্বর্গের কারণ কি ?

গুরু। অহিংসা।

শিষ্য। মনুষ্যের শত্রু কে ?

গুরু। তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল।

শিষ্য। মনুষ্যের মিত্র কে ?

গুরু। বশতাপন্ন ইন্দ্রিয় সকল।

শিষ্য। দরিদ্র কে ?

গুরু। যে অতিশয় লোভী।

শিষ্য। ঐশ্বর্য্যশালী কে ?

গুরু। যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট।

শিষ্য। জীবন্মৃত কে ?

গুরু। উদ্যমহীন পুরুষ।

শিষ্য। মায়া কি ?

গুরু। অতিশয় ভালবাসা।

শিষ্য। মহা অন্ধ কে ?

গুরু। কামাতুর।

শিষ্য। মৃত্যু কি ?

গুরু। অপযশই মৃত্যু, মনুষ্য অমর।

শিষ্য। চিররোগ কি ?

গুরু। সংসার।

শিষ্য। ঐ রোগের ঔষধ কি ?

গুরু। নির্লেপ হইয়া বাস করা।

শিষ্য। প্রধান তীর্থ কি ?

গুরু। স্বীয় পবিত্র মন।

শিষ্য। ত্যাজ্য কি ?

গুরু। অর্থ, দুরাশা।

শিষ্য। শ্রোতব্য কি ?

গুরু। গুরুর নিকট বেদবাক্য।

শিষ্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি ?

গুরু। সৎসংসর্গ।

শিষ্য। সাধু কে ?

গুরু। যাহার মোহ ও অনুরাগ নাই।

শিষ্য। জীবের জ্বর কি ?

গুরু। চিন্তা।

শিষ্য। মূর্খ কে ?

গুরু। বিবেকহীন ব্যক্তি, নাস্তিক।

শিষ্য। নাস্তিক কে ?

গুরু। যে অতি মূর্খ।

শিষ্য। পণ্ডিত কে ?

গুরু। জ্ঞানী।

শিষ্য। ধার্ম্মিক কে ?

গুরু। যথার্থ পণ্ডিত।

শিষ্য। কর্ত্তব্য কার্য্য কি ?

গুরু। ঈশ্বরে ভক্তি।

শিষ্য। বিদ্যা কি ?

গুরু। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

শিষ্য। লাভ কি ?

গুরু। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি।

শিষ্য। জগৎ জয়ী কে ?

গুরু। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।

শিষ্য। বিষ কি ?

গুরু। বিষয়।

শিষ্য। দুঃখী কে ?

গুরু। বিষয়ানুরাগী।

শিষ্য। সুখী কে ?

গুরু। যাহার কোন চিন্তা নাই।

শিষ্য। ধন্য কে ?

গুরু। পর উপকারী।

শিষ্য। পূজনীয় কে ?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি।

শিষ্য। কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ?

গুরু। ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

শিষ্য। অকর্ত্তব্য কি ?

গুরু। স্নেহ ও পাপ।

শিষ্য। বুদ্ধিমান কে ?

গুরু। যাহাকে নারী বশ করিতে পারে নাই।

শিষ্য। উত্তম ব্রত কি ?

গুরু। সৎপাত্রে দান।

শিষ্য। শৃঙ্খল কি ?

গুরু। নারী।

শিষ্য। কি জানিতে সকলেই অশক্ত ?

গুরু। নারীর মন ও চরিত্র।

শিষ্য। পশু কে ?

গুরু। মূর্খ।

শিষ্য। কাহার সহিত সংসর্গ করিবে না ?

গুরু। মূর্খ, পাপী. খল ও নীচ লোকের সহিত।

শিষ্য। ছোট কে ?

গুরু। যে যাচ্ঞা করে।

শিষ্য। বড় কে ?

গুরু। যে কিছু চাহে না।

শিষ্য। জন্মিয়াছে কে ?

গুরু। যাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।

শিষ্য। মরিয়াছে কে ?

গুরু। যে আর মরিবে না।

শিষ্য। বিশ্বাসী কে ?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি।

শিষ্য। অবিশ্বাসী কে ?

গুরু। নারী।

শিষ্য। কি করিলে শোক হয় না ?

গুরু। ধর্ম্ম ও উপাসনা।

শিষ্য। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না কাহার ?

গুরু। রিপু সকলের।

শিষ্য। দুঃখের মুল কি?

গুরু। মায়া।

শিষ্য। দেয় কি?

গুরু। অভয়।

শিষ্য। মনের বিনাশ কি?

গুরু। মোক্ষ।

শিষ্য। কোথায় কোন ভয় নাই?

গুরু। মুক্তিতে।

শিষ্য। কি করিলে মৃত্যু ভয় হয় না?

গুরু। ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন।

শিষ্য। দস্যু কে?

গুরু। কুবাসনা।

শিষ্য। কোন্ বস্তু দান করিলে বৃদ্ধি হয়?

গুরু। বিদ্যা।

শিষ্য। কোন্ বস্তু দিন দিন কমিতেছে?

গুরু। পরমায়ু।

শিষ্য। চিরস্থায়ী কি?

গুরু। কাল।

শিষ্য। কাহাকে ভয় করা উচিত?

গুরু। লোকাপবাদ।

শিষ্য। প্রকৃত বন্ধু কে?

গুরু। যে বিপদকালে সহায়।

শিষ্য। পিতা মাতা কে?

গুরু। প্রতিপালন কর্ত্তা।

শিষ্য। কি জানিলে আর কিছু জানিতে হয় না?

গুরু। পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম।

শিষ্য। দুর্লভ কি?

গুরু। সদ্‌গুরু ও আত্মজ্ঞান।

শিষ্য। মিত্র অথচ শত্রু কে?

গুরু। পুত্র কন্যা প্রভৃতি।

শিষ্য। চঞ্চল কি?

গুরু। মন, ধন, যৌবন ও আয়ু।

শিষ্য। উত্তম দান কি?

গুরু। তত্ত্ব জ্ঞান।

শিষ্য। কি কার্য্য করিবে না?

গুরু। পাপ কর্ম্ম।

শিষ্য। কি কার্য্য প্রাণপণে করিবে?

গুরু। ঈশ্বরের উপাসনা।

শিষ্য। কোন্ কর্ম্ম ভাল?

গুরু। যাহা ঈশ্বরের প্রীতিজনক।

শিষ্য। কিসে যত্ন করিবে না?

গুরু। সংসারে।

শিষ্য। দিবা রাত্র কি চিন্তা করিবে?

গুরু। সংসার মিথ্যা ও আত্মতত্ত্ব।

শিষ্য। ঈশ্বর আছেন কি না কিরূপে জানিব?

গুরু। তুমি নিজে আছ কি না কিরূপে জানিতেছ।

শিষ্য। যাঁহার আকার নাই তাঁহাকে কিরূপে বুঝা যায়?

গুরু। জীবন, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে কি না কিরূপে জানা যায়?

শিষ্য। আমার জীবন আছে, ইচ্ছা মত সকলই করিতে পারি তাই আমাকে জানি।

গুরু। যে ব্যক্তি আপনাকে জানে সে ঈশ্বরকেও জানে।

শিষ্য। যাহা দেখা যায় না তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

গুরু। বায়ু, সৌরভ, ইহাদের আকার নাই কোন্ জ্ঞানে তাহা অনুভব কর।

শিষ্য। বায়ু, সৌরভ, আছে বিশ্বাস হয় তাহাদের কার্য্য দেখিয়া।

গুরু। তুমি এবং বায়ু উভয়ই ঈশ্বরের কার্য্য নয় কি? এখন ভাবিয়া দেখ ঈশ্বর আছেন কি না।

শিষ্য। বুঝিলাম ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে ভক্তি বা উপাসনা করিব কেন?

গুরু। তুমি সন্তানকে স্নেহ কর কেন, এবং পিতা মাতাকে ভক্তি কর কেন।

শিষ্য। স্নেহ নীচগামী এবং ভক্তি ঊর্দ্ধগামী।

গুরু। সেই জন্য ঈশ্বরকে ভক্তি করা উচিত। চক্ষু পাইয়াছ দেখিবার শক্তি কোথায় পাইলে,

দেখিবার জিনিস্ না পাইলে চক্ষু কোন্ কার্য্যে আসিত ? তোমার প্রপিতামহকে তুমি দেখ নাই তিনি ছিলেন কোন জ্ঞানে জানিতেছ। আকার না থাকিলেও জিনিস আছে তাহা নিশ্চয়।

তত্ত্বজ্ঞান

তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন যদি বিশ্বাস হয় তবে তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত, আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে তবে বৃথা তর্ক করিয়া বাজে কথায় কাহার সহিত বিবাদ অথবা নিজের মত বাহাল রাখিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহার সে বিশ্বাস আছে এবং যিনি তাঁহাকে পাইবার পথ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার প্রথমে "আমি কে" তাহা অবগত হওয়া উচিত, তাহার পর আরও সাতটি বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রণালী অনুসারে বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত কার্য্য করিলে তিন মাস মধ্যে নিশ্চয় আত্ম দর্শন হয়। আত্ম দর্শন হইলে মনুষ্য শান্ত ও মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। যতদিন না আত্মা পরমাত্মায় যোগ করিতে পারিবে ততদিন মুক্তির আশা নাই। যোগ হইলে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া, যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারা যায়, ঐশ্বরিক বল ও শক্তি পাওয়া যায় যাহা দ্বারা অবশেষে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে।

আমি কে—পঞ্চ ভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ঐ সকল ভিন্ন, নাড়ী চতুষ্টয় যথা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ও চিত্রা, ছয় রিপু, এবং চিত্ত, বাসনা, চিন্তা, তৃষ্ণা, মায়া ও আশা, এই সকল উপাদান লইয়া দেহের

গঠন হইয়াছে। তাহা ব্যতীত জ্ঞান, চৈতন্য, আত্মা বা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা আছেন। এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, আমি কে এবং ঈশ্বর মানব দেহে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন কি না বেশ জানিতে পারা যায়। আমি যদি আমাকে চিনিতে পারি তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে জানিতে পারিব। যদি ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস হয় তবে তিনি অতি নিকটে আছেন জানিবে। আর যদি বিশ্বাস না হয় তবে তিনি বহুদূরে এবং কোন কালে সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহা বলা যায় না।

পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখিলে আমি নামে কাহাকেও পাওয়া যায় না। একমাত্র জ্ঞান স্বরূপই আমি, কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যই আমি রূপে প্রকাশিত। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও চৈতন্য একত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। সমুদয় অঙ্গ থাকিতেও শব কি জন্য দর্শন স্পর্শনাদি করিতে পারে না, দেহ ও শব একই পদার্থ; আমার চৈতন্য আছে বলিয়া দেখিতে ও শুনিতে পাই, সুতরাং আমি দেহ নহি ইহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না; অতএব আমি দেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য এবং স্বপ্রকাশ। যে স্থানে আত্মা বিদ্যমান, তথায় মনও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না, বাসনাও থাকে না; রাজার নিকট ক্ষুদ্র পামর ব্যক্তি বসিতে পারে না। যেমন তৈল তিল হইতে পৃথক হইলে খৈল ও তিলের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এই মন ও আমি

নহি, জীব ও আমি নহি কারণ ইহারা চৈতন্য কৃত বোধ্যমান হইয়া থাকে। জীবের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কেবল সাক্ষী মাত্র, অতএব আমি সেই অনন্ত আত্মা। যেমন মুক্তা-হারের সূত্র প্রত্যেক মুক্তাতেই গ্রথিত সেইরূপ এই ভগবান্ আত্মায় জীব সমুদয় গ্রথিত। সূত্রে ও মুক্তায় কোন সম্বন্ধ নাই, সেই প্রকার দেহে ও আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; দেহ জড় পদার্থ মাত্র, আমি অমর। মৃত্যুই বা কি, জীবিতই বা কে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র। আমি শব্দেই আত্মা ভিন্ন আর কিছু নহে, জ্ঞানের উদয় হইলেই ইহা জানা যায়।

বাহ্য জগৎ আমি নহি, অনিত্য দেহ আমি নহি, পঞ্চ প্রাণবায়ু আমি নহি, কারণ ইহারা অচেতন, আমি চেতন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আমি নহি, বাক্য, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রূপ, রস, এই সমস্তও আমি নহি, তবে আমি কে? আমি মনন শূন্য নির্ম্মল শান্ত বিশুদ্ধ চেতন স্বরূপ; আমি বাহ্য অভ্যন্তর সর্ব্ব স্থান-ব্যাপী, আমিই দীপবৎ সকল পদার্থ প্রকাশ করিতেছি, আমি সর্ব্বগামী আত্মা। যেমন অন্ধকারে দীপ সাহায্যে শাদা কাল দ্রব্যাদি চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ আমাতেই অর্থাৎ আমার আত্মাতেই সকল পদার্থের বস্তুত্ব প্রতিপন্ন হয়। দর্পণ যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্বের বিশ্রাম স্থান, সেই প্রকার আমিই সকল জাগ্রত পদার্থের অনুভব স্থল। আমিই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বগামী, চিন্ময় সেই আত্মা। আমার এই স্থাবর জঙ্গম বহু শরীর। 'ইহার পরিমাণ যে কত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

কোন্ সময়ে হইয়াছে এবং কত কাল থাকিবে তাহারও সীমা নাই, ইহা কতদূর ব্যাপী তাহারও নিরাকরণ নাই।

আমি স্বয়ংই স্বপ্রকাশ। আমি কুসুমে সৌরভ, বীজে বৃক্ষ, জলে শৈত্য, অগ্নিতে তেজ, সূর্য্যে কিরণ, দীপে আলোক, কান্তিতে রূপ, ও রূপে অনুভব হইয়া অবস্থান করিতেছি। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, জলে রস, তিলে তৈল, চিনিতে মিষ্টতা বিদ্যমান; আমিও সেইরূপ নিখিল পদার্থে শক্তি রূপে বর্ত্তমান আছি। আমি আত্মা বলিয়াই কাহারও নিকট প্রার্থনা না করিয়া এই বিশাল জগৎ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি বা আমি এবং আমার ইত্যাদি ইহা সমস্তই মিথ্যা ভ্রম মাত্র।

মন—মন কোথাও কিছু পায় না বলিয়া দূর দূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনের বৃত্তি তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, মনের তেজ অগ্নি অপেক্ষা বেশী; ইহাকে অতিক্রম করা, পর্ব্বত অতিক্রম অপেক্ষাও, কষ্টকর। মনকে বশ করা, সমুদ্র পান, সুমেরু পর্ব্বত উৎপাটন এবং অনল ভক্ষণ অপেক্ষাও কঠিন, মন ক্ষীণ অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইলে জগৎ নষ্ট হয়। এই যে শত শত সুখ দুঃখ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত হইতে অরণ্যের ন্যায়, মন হইতেই উৎপন্ন হয়; বিবেকবশে মন ক্ষীণ হইলে সেই সকল সুখ দুঃখ বিনষ্ট হয়। মন নটের ন্যায় সকল বিষয়েই ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক বিষাদ এবং ক্ষণিক প্রসন্নতা অনুভব করে। নির্ম্মল বুদ্ধি যোগে এখন যদি মনের চিকিৎসা করা না যায় তাহা হইলে ইহার পর আর তাহার প্রতিকার করিবার সময় পাইবে

নহি, জীব ও আমি নহি কারণ ইহারা চৈতন্য কৃত বোধ্যমান হইয়া থাকে। জীবের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কেবল সাক্ষী মাত্র, অতএব আমি সেই অনন্ত আত্মা। যেমন মুক্তা-হারের সূত্র প্রত্যেক মুক্তাতেই গ্রথিত সেইরূপ এই ভগবান্ আত্মায় জীব সমুদয় গ্রথিত। সূত্রে ও মুক্তায় কোন সম্বন্ধ নাই, সেই প্রকার দেহে ও আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; দেহ জড় পদার্থ মাত্র, আমি অমর। মৃত্যুই বা কি, জীবিতই বা কে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র। আমি শব্দেই আত্মা ভিন্ন আর কিছু নহে, জ্ঞানের উদয় হইলেই ইহা জানা যায়।

বাহ্য জগৎ আমি নহি, অনিত্য দেহ আমি নহি, পঞ্চ প্রাণবায়ু আমি নহি, কারণ ইহারা অচেতন, আমি চেতন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আমি নহি, বাক্য, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রূপ, রস, এই সমস্তও আমি নহি, তবে আমি কে? আমি মনন শূন্য নির্ম্মল শান্ত বিশুদ্ধ চেতন স্বরূপ; আমি বাহ্য অভ্যন্তর সর্ব্ব স্থান-ব্যাপী, আমিই দীপবৎ সকল পদার্থ প্রকাশ করিতেছি, আমি সর্ব্বগামী আত্মা। যেমন অন্ধকারে দীপ সাহায্যে শাদা কাল দ্রব্যাদি চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ আমাতেই অর্থাৎ আমার আত্মাতেই সকল পদার্থের বস্তুত্ব প্রতিপন্ন হয়। দর্পণ যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্বের বিশ্রাম স্থান, সেই প্রকার আমিই সকল জাগ্রত পদার্থের অনুভব স্থল। আমিই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বগামী, চিন্ময় সেই আত্মা। আমার এই স্থাবর জঙ্গম বহু শরীর। 'ইহার পরিমাণ যে কত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।।

কোন্ সময়ে হইয়াছে এবং কত কাল থাকিবে তাহারও সীমা নাই, ইহা কতদূর ব্যাপী তাহারও নিরাকরণ নাই।

আমি স্বয়ংই স্বপ্রকাশ। আমি কুসুমে সৌরভ, বীজে বৃক্ষ, জলে শৈত্য, অগ্নিতে তেজ, সূর্য্যে কিরণ, দীপে আলোক, কান্তিতে রূপ, ও রূপে অনুভব হইয়া অবস্থান করিতেছি। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, জলে রস, তিলে তৈল, চিনিতে মিষ্টতা বিদ্যমান ; আমিও সেইরূপ নিখিল পদার্থে শক্তি রূপে বর্ত্তমান আছি। আমি আত্মা বলিয়াই কাহারও নিকট প্রার্থনা না করিয়া এই বিশাল জগৎ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি বা আমি এবং আমার ইত্যাদি ইহা সমস্তই মিথ্যা ভ্রম মাত্র।

মন—মন কোথাও কিছু পায় না বলিয়া দূর দূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনের বৃত্তি তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, মনের তেজ অগ্নি অপেক্ষা বেশী ; ইহাকে অতিক্রম করা, পর্ব্বত অতিক্রম অপেক্ষাও, কষ্টকর। মনকে বশ করা, সমুদ্র পান, সুমেরু পর্ব্বত উৎপাটন এবং অনল ভক্ষণ অপেক্ষাও কঠিন, মন ক্ষীণ অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইলে জগৎ নষ্ট হয়। এই যে শত শত সুখ দুঃখ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত হইতে অরণ্যের ন্যায়, মন হইতেই উৎপন্ন হয় ; বিবেকবশে মন ক্ষীণ হইলে সেই সকল সুখ দুঃখ বিনষ্ট হয়। মন নটের ন্যায় সকল বিষয়েই ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক বিষাদ এবং ক্ষণিক প্রসন্নতা অনুভব করে। নির্ম্মল বুদ্ধি যোগে এখন যদি মনের চিকিৎসা করা না যায় তাহা হইলে ইহার পর আর তাহার প্রতিকার করিবার সময় পাইবে

কোথায় ? মন, চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম ও দৈব ইহারা সংজ্ঞা রূপে কথিত হইয়া থাকে। মনের সত্তাতেই দৃশ্য দর্শন হইয়া থাকে, মনের উচ্ছেদ হইলে দৃশ্য দর্শনেরও উচ্ছেদ হয়। মনই জগৎ কর্ত্তা, মনই পুরুষ, মনের নিশ্চয়ে যাহা সম্পাদিত হয় তাহা মনের প্রতিবিম্ববৎ ; এই আকাশ বিস্তৃত এবং অনন্ত, মনও সেই প্রকার বিস্তৃত ; চিদাকাশ, এই বিস্তৃত মনের যে যে অংশ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রকাশিত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

মনের শক্তি এত প্রবল যে এক মনে যাহা করিবে তাহা নিশ্চয় সফল হইবে, এমন কি স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে পারা যায়। মন, চৈতন্য শক্তি হইতে চৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হয়। মন ও দেহ অভিন্ন, আত্মাই মন ও দেহ, মনদেহের সকল চেষ্টাই সফল হইয়া থাকে। মন যাহার অনুসন্ধান করে তাহা প্রাপ্ত হয়। মন দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পথে নিযুক্ত করিতে হয়। মন যাহার অনুসন্ধান করে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয় তাহাই স্পন্দন করে। মালিন্যযুক্ত চিত্তকে মন বলা যায়। মন ও চিত্ত আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, বাসনা চিত্তের অংশ মাত্র। মনই আপনার বিনাশ ক্রিয়া আপনিই সাধন করে, মন কেবল আপনার বিনাশের নিমিত্তই আত্মদর্শন করিয়া থাকে। মনের নাশই সকল দুঃখ নিবারণের মূল। বিবেক দ্বারা সংস্কৃত হইলে মনের নাশ হয়।

মন যে কতদূর শক্তি ধারণ করে তাহা সহজেই প্রত্যক্ষ

করা যায়। তোমার মন যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে তাহা হইলে ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ব্বন করিলেও তাহার কিছুই আস্বাদ পাইবে না। মন অন্য স্থানে আসক্ত থাকিলে দর্শন করা যায় না, শ্রবণ করা যায় না, দেহ পর্য্যন্ত যেন অকর্ম্মণ্য হইয়া স্থিরভাবে থাকে। মন ও চিত্ত পরস্পর সাহায্যে সাকার হওয়ায় উভয়েই সমান, তথাপি মন উৎকৃষ্ট, কেন না মন হইতে চিত্তের উৎপত্তি, চিত্ত হইতে মনের উৎপত্তি নহে। সুখকে দুঃখ জ্ঞান ও দুঃখকে সুখ অনুভব করা একমাত্র মনেরই কার্য্য। মন. দর্শন করে নাই এমন কোন বস্তুই নাই। যেমন অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, লতা, পত্র, পুষ্প, উৎপন্ন হয়, তেমনই মন হইতে এই জগৎ, স্বপ্ন, বাসনা, চিন্তা, বিলাস ইত্যাদি সমুদয় আবির্ভূত হয়। যেমন নাট্যালয়ে একজন নটই নানা প্রকার বেশ ধারণ করিয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করে সেই প্রকার আপনার মনই জাগ্রত ও স্বপ্নরূপে সমুদিত হইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার চিন্তা করে। মন নিজে নিরাকার হইলেও সাকার হইয়া চির অভ্যাসবশে জীব ভাবাপন্ন হইয়া জাত ও মৃত হইয়া থাকে। তিলে যেমন তৈল আছে মনেও তেমনই সুখ দুঃখ নিয়তই আছে; কাল বশতঃ কখন বৃদ্ধি কখন হ্রাস হইয়া থাকে। যাহার মন নিশ্চল, এক বিষয়গামী হইতে শিক্ষা করিয়াছে তিনিই পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমর্থ হইয়াছেন।

মন সংযমে সংসার বিলাসের শান্তি হইয়া থাকে। অনুদ্বেগ হইতে জীবের মনোজয় হয়। মনোজয় করিতে

পারিলে ত্রিলোক বিজয়ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মনোজয় আর কিছুই নহে কেবল স্ব স্ব ভাবে অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে অবস্থিতি মাত্র। চাপল্যই মনের রূপ; যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা, তেমনই মনের ধর্ম্ম চঞ্চলতা। যেমন স্পন্দন ব্যতিরেকে বায়ুর সত্তা উপলব্ধি হয় না সেইরূপ চাঞ্চল্য ব্যতিরেকে মনের অস্তিত্ব জানা যায় না। (চাঞ্চল্যহীন মনের অবস্থাকে মোক্ষ বলিয়া জানিবে। মনের নাশ হইলেই দুঃখের শান্তি হয়। মনের চাঞ্চল্যই অবিদ্যা ও বাসনা বলিয়া জানিবে, বিচারবলে বাসনা বিনাশ করিতে পারিলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সৎ ও অসতের মধ্যভাগ চিন্ময়ত্ব আর চিন্ময়ত্ব ও জড়ত্বের মধ্যভাগ অবস্থাকে মন বলিয়া জানিবে, জড়তার অভ্যাস বশে মন জড় হয়, বিবেকের অভ্যাসবশে মন চৈতন্য রূপ হয়। ভাবনাগ্রস্থ অস্থির মনকে বিবেক মন দ্বারা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিতে হয়। রাজা ব্যতীত অন্য কেহ রাজাকে পরাজয় করিতে পারে না; সেই প্রকার মন ভিন্ন মনকে আর কেহ জয় করিতে পারে না। আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য মন জয় করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মনই কর্ম্মফল ভোগ করে, মনেরই এই অনন্ত সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে, শরীরের কিছুই হয় না। জড় দেহ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে না, মনই কর্ত্তা সুতরাং মনকেই মানব বলিয়া জানিবে।)

মনের আদি ও অন্ত যখন বিনশ্বর তখন তাহার মধ্যভাগও অসৎ বলিতে হইবে। মনের এই অসৎরূপতা যিনি অবগত

নহেন তাঁহার দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। মন যাহা করে তাহা কৃত হয়; যাহা করে না তাহা কৃত হয় না। এই বিশ্ব, মনোবৃত্তিস্বরূপ। মনই সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব ও সকল আকার গতির বীজ স্বরূপ। সেই মনকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়, নিখিল দুঃখের ক্ষয় হয়, সমুদয় কর্ম্ম ও লয় প্রাপ্ত হয়।

কোষকার কীট যেমন আপনার অবস্থিতির জন্য কোষ নির্ম্মাণ করে মনও সেইরূপ স্বীয় অবস্থিতির জন্য এই শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। যেমন কোষকার কীটের কোষ, কোষকার হইতে অভিন্ন সেইরূপ মন ও শরীরের কোন পার্থক্য নাই, মনই শরীরের উপাদান, মনে সমস্তই সম্ভব। এমন কোন শক্তিই নাই যাহা মনে উদয় হয় না। মনই চিৎ প্রতিবিম্ব বশতঃ জীব হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালাত্মক জগৎ রূপ স্বকল্পিত এই বিশাল নগরের নির্ম্মাণ, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ করতঃ স্ফুরিত হইতেছে। তণ্ডুলের যেমন তুঁষ আবরক অবস্থিত, এই সংসারও সেইরূপ আবরক সত্য ব্রহ্মে অবস্থিত। এই জড় জগতের অস্তিত্ব নাই। দুঃখ হর্ষাদি আত্মারই কৃত পুনরায় আত্মার কর্ত্তৃত্বেই উহাদের লয় হয়।

মনই পুরুষ অতএব তাহাকে শুভ পথে নিয়োগ করিবে, চিৎ, প্রকৃতির স্বরূপ হয়, তাহা মনন ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইলে মন হয়, দর্শন বিশিষ্ট হইলে চক্ষু, শ্রবণশক্তি বিশিষ্ট হইলে শ্রোত্র হয়; এই জন্য মনকে কর্ম্ম বীজ বলা হয়। বর্ত্তমান শরীরেই

মন সর্ব্ব বস্তুতে আসক্ত হইয়া নর নামে অভিহিত হয়। মনই জীব, মনই আকার প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মলতা গুণে পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুষ্য মনোময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। (এই সংসারে মনই জন্মগ্রহণ করে, মনেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়; (প্রকৃতভাবে দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে মোক্ষও মনেরই হইয়া থাকে।) (মনই বাস্তবিক সংসারী, জরা ও মরণ প্রকৃতভাবে মনেরই হইয়া থাকে। এই মনই চিরদিন সকলের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। জ্ঞান উদয় হইলে সেই মনের নাশ/হয়) যেমন দর্পণ সন্নিহিত দ্রব্যের অপসরণে ছায়ার অভাব হয় সেইরূপ প্রাণশক্তির নিরোধ হইলে মনের নাশ হয় কারণ মন প্রাণেরেই রূপান্তর মাত্র। প্রাণই নিজ স্পন্দন শক্তি সাহায্যে দেশান্তরের দ্রব্য সমুদয় হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাহা অনুভব করিতে পারে, সেইজন্য মন সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যেমন শিলার কখন জ্বলন শক্তি হইতে পারে না সেইরূপ মনেরও কখন অনুভব শক্তি নাই। অনুভব শক্তি প্রাণ বায়ুর হইয়া থাকে, প্রাণ বায়ু ও আত্মার উভয় শক্তির সমাবেশকেই মন কহে। মনই কর্ত্তা, মনই যাহা সঙ্কল্প করে তাহাই হয়; (যেখানে মন সেই স্থানে আশা ও সেই স্থানেই সুখ দুঃখ সন্নিহিত থাকে। মন ধাতুর অর্থ মনন, সেই মন কল্পনাকারী বলিয়া মন নামে অভিহিত হইয়াছে।) মন জড় দৃষ্টি ও চেতনা দৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া জীব, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। (যে পর্য্যন্ত মনের লয় না হইবে তাবৎ বাসনা ক্ষয়ের সম্ভব নাই।)

চিত্ত—চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিষয়ানুরাগ। তীরস্থ বৃক্ষকে যেমন তরঙ্গ সঙ্কুল নদী গ্রাস করে, সেইরূপ বৃত্তিশালী চিত্ত মনুষ্যকে গ্রাস করিতেছে। জলপ্রবাহ যেমন সেতুর দ্বারা আবদ্ধ হয়, মনুষ্য চিত্ত কর্ত্তৃক সেই প্রকার আবদ্ধ হইতেছে। টাঙ্গান দড়ি যেমন ঊর্দ্ধ ও অধোগামী দুইই হয়, মনুষ্য সেই প্রকার চিত্ত ও মন দ্বারা কখন ঊর্দ্ধ কখন অধোগামী হয়। চিল যেমন সহসা লোভনীয় মৎস্য আহরণ করে, সেই প্রকার চিত্ত সহসা বিষয়ে আসক্ত হয়। চঞ্চল চিত্ত কোন একটি বিষয়ে একাগ্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধিস্থ আত্মাই চিত্ত, যখন চিত্তের বাসনা ক্ষীণভাবে থাকে তখন চিত্ত জীব নামে কথিত হয়; যখন ভ্রম বাহুল্য প্রাপ্ত হয় তখন দেহ; যখন চিত্তের কল্পনা শান্ত হয় তখন উহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

বিষয় বাসনা জড়িত চিন্মাত্রে অবস্থিত ঈষৎ বিকল্প কলুষিত চিৎ তত্ত্বই জীব নামে অভিহিত হন। এই দৃশ্যের প্রপঞ্চময়তাই চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ভোগাসক্ত চিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কোন কার্য্য না করিলেও সে তাহার কর্ত্তা হয়। চিত্ত হইতে এই সংসার আগত হইয়াছে, এই সংসার চিত্তময়, চিত্তেই এই সংসার অবস্থিত। চিত্ত যেরূপ হইবে, পুরুষও সেইরূপ হইয়া থাকে ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবে। আত্মাই চিত্ত; তিনি চিত্ত হেতু এবং সেই চিত্ত হইতে সমুদয় কর্ম্মময়ী বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি সঞ্চয় করেন, সমুদয় দৃশ্য করেন, উপভোগ দ্বারা ধারণ করেন, এবং উৎপাদন করেন। সমুদয় জীব ও

সমগ্র পদার্থ ব্রহ্ম হইতেই সতত উৎপন্ন হইতেছে। পরমাত্মা হইতে সমুদয় ভাব অবগত হইয়া আবার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের অন্তর্ভূত ভাবনায় ব্যথিত হন। কমলরূপ তরুবনের অঙ্কুর, ইচ্ছা বিকৃতি ঐ চিত্ত, স্বীয় উৎপত্তি হেতুভূত আত্মপদ বিস্মৃত হইয়া কল্পনা প্রসূত অনর্থের হেতু হয়। কোষকার বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত কোষকারে পরিণত হয়। শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ উহার অবয়ব স্বরূপ; ঐ চিত্তই জরা মৃত্যুরূপ শাখা পরিবৃত সংসার বিষবৃক্ষ। যেমন ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ অবস্থিত থাকে সেইরূপ আশাপাশ বিধানকারী ফলবিহীন এই নিখিল সংসার ঐ চিত্ত মধ্যে অবস্থিত থাকে। ঐ চিত্ত চিন্তারূপ অনলের শিখায় দগ্ধ, কোপরূপ অজাগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত ও কাম সমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া আত্মরূপ পিতামহকে (মূল কারণ) বিস্মৃত হইয়া যায়। শোকে বিলুপ্ত চৈতন্যও বিষয়ানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে থাকে। ঐ চিত্ত যখন স্বীয় নিবাস স্বরূপ এক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তদ্দেহ বিশেষের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হয়। বিষয়, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিচিত্র শত্রুগণ মধ্যে কেমন বিশ্বস্ত হইয়া বাস করে। এই দৃশ্য প্রপঞ্চময়তাই চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিবে ইহা ব্যতীত চিত্তের আর কোন স্বরূপ নাই। এই জগৎ প্রপঞ্চ সমস্তই একমাত্র আত্মা, এইরূপ বোধ না হইলে এই দৃশ্য জগৎ দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে আর বোধ হইলে ইহা মোক্ষ

সুখ প্রদান করে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী তাহাই চৈতন্য বলিয়া জানিবে।

যখন চিত্ত কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তখন উহা আপনার চিৎ স্বরূপ ভুলিয়া যায়, এবং জড়তা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। যেমন চিত্রিত রাজমূর্ত্তি কখন ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারে না, মৃতদেহ যেমন কোন স্থানে ধাবিত হইতে পারে না, শিলাখণ্ড যেমন মধুর গান করিতে পারে না, কৃত্রিম সূর্য্য হইতে যেমন কদাচ অন্ধকার নষ্ট হয় না সেইরূপ অলীক ভ্রমোৎপন্ন চিত্ত কোন কার্য্য করিতে পারে না। বাস্তবিক যাহা করে বলিয়া মনে হয় তাহা কেবল দেহ মধ্যবর্ত্তী প্রাণাদি বায়ু সমুদয়ের ক্রিয়া মাত্র। যেমন অন্ধকারে আলোক উপস্থিত হইলে অন্ধকার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার সময়ে চিত্তের অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া তথায় পৃথকরূপে চিত্তের প্রকাশ হয় না। আমি আত্মা, এই জীবই আমি, এই জ্ঞানের নামই চিত্ত, এই চিত্তই অনাদি অনন্ত দুঃখের বিস্তার করিয়া থাকে; যদি চিত্তের উপশম ইচ্ছা কর তবে অগ্রে সেই চিত্তের বৃত্তি সমুদয়কে ধ্বংস কর তাহা হইলে সহজেই চিত্ত ক্ষয় হইবে। ঘটের মধ্যে যেমন ঘটাকাশ সেইরূপ চিত্ত মধ্যেই সংসার। ঘট নাশে যেমন ঘটাকাশ থাকে না, সেইরূপ চিত্ত নষ্ট হইলে সংসার থাকে না। চিত্তের উচ্ছেদ নিমিত্ত পৃথক যত্ন করিতে হয় না, অজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই চিত্তের উচ্ছেদ হয়। যতদিন অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন থাকা যায় ততদিন চিত্ত ঘনীভূত হইয়া

থাকে। যখন হইতে অজ্ঞান অনুভব ধারণ করিতে থাকে, চিত্তও সেই সময় হইতে ক্ষীণ হইতে থাকে। উপদেশ দ্বারা চিত্তের কিছুই হয় না, চিত্ত মিথ্যা, যদি থাকে তাহাও বিচারে বিনাশী। চিত্ত যাহা করে তাহাই তুমি অনুভব কর, চিত্ত যাহা না করে তাহা তোমার অনুভব হয় না। চিত্তের যোগে আমরা স্বস্থান লাভে অসমর্থ হইয়া, পক্ষিগণ যেমন ভ্রান্তি বশতঃ জালে পতিত হয়, সেই প্রকার আমরাও চিন্তা জালে বিমুগ্ধভাবে নিপতিত হইতেছি।

বাসনা—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তরস্থিত মনোবৃত্তিই কর্ত্তৃত্ব, ইহাকেই বাসনা বলা যায়। পুরুষ কোন কার্য্য করুক বা না করুক, মনের যাদৃশ ইচ্ছা হইবে তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক ফল অনুভব হইবে। যিনি তত্ত্বজ্ঞাত হইয়াছেন তাহার বাসনা শিথিল হইয়াছে, তিনি প্রাপ্ত কর্ম্মফল সমুদয়কে আত্মা হইতে বভিন্ন অনুভব করেন। বাসনাতেই এই জগৎ জাল অবস্থিত। বাসনা আকৃষ্ট চিত্ত, অন্তরে কি না দর্শন করে? বাসনা যাহার হৃদয়ে কখন স্থান পায় না, তিনি ত্রিভুবনকে সামান্য তৃণ বলিয়া ববেচনা করেন। (বাসনা ক্ষয় না হইলে কিছুতেই চিত্তের উপশম হইতে পারে না। বাসনার নাশ যে পর্য্যন্ত না হইবে তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না, অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলেও বাসনার ক্ষয় হয় না; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান, চিত্তনাশ ও বাসনা ক্ষয়, ইহারা পরস্পরেই পরস্পরের প্রকাশে অসাধ্য হইয়া অবস্থান করিতেছে। বাসনাক্ষয়, চিত্তনাশ ও

তত্ত্বজ্ঞান ইহারা এক সময়েই ইষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে, যদি ইহাদের সকলের এক সঙ্গে উচ্ছেদ চেষ্টা করা হয়।

বুদ্ধি—বুদ্ধি জগৎ ব্যাপী নহে, নিশ্চয়ই কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি বস্তুবিশেষ, বুদ্ধি প্রত্যেকের ভিন্ন। বুদ্ধি কম বেশী সকলেরই আছে। যাহার বুদ্ধি কম তাহাকে লোকে নির্ব্বোধ বলে, এই জন্য বুদ্ধির স্থানব্যাপকতা শক্তি আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি যে সাকার তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বুদ্ধিই ভাল মন্দ বিচার করে, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পছন্দ করে এবং নানা প্রকার নূতন বস্তুর আবিষ্কার করিয়া থাকে। যদি বিদ্যাহীন হয় এবং বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে সে সকল কার্য্য করিতে পারে, আর যদি বুদ্ধি না থাকে, তাহার বিদ্যা হয় না, যদি অনেক কষ্টে কিছু পরিমাণে হয় তাহা বিশেষ কার্য্যকর হয় না। বুদ্ধি জীব শরীরে দর্পণস্বরূপ।

তৃষ্ণা—তৃষ্ণা মনুষ্যকে এত দগ্ধ করে যে অমৃত দ্বারাও সেই দাহ নিবারণ হয় না। তৃষ্ণাই মনুষ্যকে ভীত, দুঃখিত ও অন্ধ করিয়া রাখে। তৃষ্ণা অপ্রাপ্য বস্তুতেও আসক্ত হয়, অভাব না থাকিলেও বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, এবং এক স্থানে স্থায়ী নহে। (তৃষ্ণাই একমাত্র সংসার মধ্যে চির দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। অন্তঃপুরে যাহার অবস্থান তাহাকেও অতি দুর্গম স্থানে লইয়া যায়। (তৃষ্ণাই আত্মতত্ত্ব আবরণ পূর্ব্বক মানবের অজ্ঞানাধিক্য জন্মাইতেছে। তৃষ্ণাতেই মন গ্রথিত আছে,)

উভয়েই বিচিত্র বর্ণ, শূন্যাশ্রয়, বিবিধ বিষয় রাগে রঞ্জিত, নানা প্রকার রূপ বিশিষ্ট, শূন্য, অস্তিত্বহীন পদার্থ। (তৃষ্ণাই মোহ-রূপ হস্তীকে শৃঙ্খলের ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; তৃষ্ণাই জরা মরণ দুঃখের আকর।)

চিন্তা—চিন্তা ত্যাগ করিলেই মানব সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায়। চিন্তা অনন্ত সময় পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই আসক্ত থাকে। চিন্তাকে ছেদন করা দুঃসাধ্য হইলেও জ্ঞানি-গণ বিবেকরূপ শাণিত খড়গ দ্বারা তাহাকে ছেদন করেন। যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ চিন্তা যাইতে পারে না. অথচ চিন্তার শান্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইতে পারে না।) চিন্তার সহোদর অর্থ, কি প্রকারে ধনবান হইব, কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব, সেই চিন্তায় সকল মনুষ্যেরই দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। (চিন্তা চিরকালই অস্থির, একের পর আর এক চিন্তা কোথা হইতে আনয়ন করে তাহার কিছু ঠিক নাই, সেইজন্য চিন্তার শেষ নাই, চিন্তাশূন্য মনুষ্য নাই। এমন কোন দিন নাই যে সেই দিন কোন ব্যক্তি কোন্ প্রকার চিন্তা করে নাই। যিনি চিন্তা না করেন তিনিই মহাসুখী। চিন্তায় শরীর জীর্ণ হয়, চিন্তার শেষ হইলেই মুক্তির পথ সুগম হয়।)

মায়া—মায়া জগদুৎপত্তি করিয়া থাকে, বিবেক এই মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে। এই মায়া যে কি তাহা জানা যায় না। এই জগৎ অতি অদ্ভুত, বিচার করিয়া না দেখিলে মায়ার স্ফুরণ হয়,

বিবেক দৃষ্টিতে কিছুই থাকে না। এই মায়ার স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে ইহার মাহাত্ম্য অনুভূত হয় না। সংসার বন্ধন হেতু এই মায়া অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু এই মায়া নিতান্ত অসতী হইলেও অতি সত্যবৎ অনুভূত হইয়া থাকে। এই সংসার মায়া অত্যন্ত অভিন্ন, সেই পরমপদে বিস্তৃত ভেদ রচনা করিয়া থাকে। এই মায়ার পারমার্থিক সত্ত্বা নাই, সেই প্রকার প্রদীপ্ত ভাবনাবলে তুমি তত্ত্বচিত্ত হইয়া আত্মার বাস্তব স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সকল বিষয়ের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবে। মায়া কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এই প্রকার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, আমি এই মায়াকে কিরূপে বিনষ্ট করিব, এই বিষয় বিচার করা উচিত। যখন এই মায়া ক্ষীণপ্রায় হইয়া একেবারে হস্তগত হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে মায়া কোথা হইতে জন্মিল, ইহার আকৃতি কি প্রকার এবং কিরূপে নষ্ট হইল। বস্তুতঃ এই মায়া অসতী, দেখিতে গেলে ইহাকে পাওয়া যায় না। এই যে মায়া আকৃতি বিস্তার পূর্ব্বক সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা দোষ ব্যতীত কোন গুণের জন্য নহে, অতএব ইহাকে বল পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া তাহার পর ইহার তত্ত্ব অবগত হইবে। মায়া দ্বারা এই জীবসমূহ এই জগৎরূপ অতি মহৎ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে। যাবৎকাল মূঢ় হইয়া আত্মার দর্শনে সমর্থ না হয় তাবৎকাল জলে আবর্ত্তরাশির ন্যায় জীবগণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাক যখন আত্মদর্শনে সমর্থ হয় তখন অসৎ দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া

সত্যসংবিদ্ প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে মায়াপাশ কাটাইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

ঈদৃশ মায়াময় সংসারেও যাহাদের অসার সুখ ভাবনা, কাল তাহাদিগকেও ছেদন করিয়া থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন কোন বস্তু নাই যাহা কালের করালগ্রাসে পতিত না হয়। কাল কোথাও বা গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কোথাও বা কমনীয় বর্ণ, কোথাও বা তদ্বিবর্জ্জিত কার্য্য উৎপাদন করতঃ অবস্থিতি করিতেছে। কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অস্ত, কিছুই নাই। কেহ বুদ্ধির কৌশলে কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং সমুদয় জীব লোকের মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান।

লোকের দৃষ্টি রজোগুণে কলুষিত, তমোগুণ অনবরত বর্দ্ধিত হইতেছে, সত্ত্বগুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞান কাহার নাই। জীবন অস্থির, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈর্য্য বিফল, আসক্তি কেবল অসার বিষয় সুখে মত্ত, বুদ্ধি মূর্খতা দোষে মলিন; শরীর বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে যেন জড়াইতেছে, পাপ অনবরত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সৎসঙ্গ দূরপরাহত, সত্যের উদয় কোথাও নাই, অন্তকরণ মোহজালে আচ্ছন্ন, সন্তোষ দূরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জ্বল করুণাবৃত্তি উদিত হয় না, কেবল নীচতাই নিকটে আসিতেছে, ধীরতা অধীর হইয়াছে, সাধুসঙ্গ দুর্লভ হইয়াছে, বিষয় বাসনাই বন্ধনের হেতু হইয়াছে, মৃত্যু এই

জীবসমূহকে নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে। সিদ্ধগণও বিনষ্ট হন তবে আমাদের মত লোকের স্থায়িত্বে বিশ্বাস কি? ধ্রুবের জীবনও চিরস্থায়ী নহে, অমরকুলেরও মৃত্যু আছে, ব্রহ্মারও সমাপ্তি আছে, অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্ব্বাপিত হয়, হরিও সংহার দশা প্রাপ্ত হন, হরও অভাব প্রাপ্ত হন, কালের কাল নিয়তির বিলয় হয়, আকাশেরও বিনাশ হইয়া থাকে. সুতরাং মাদৃশ অসার লোকের প্রতি আস্থা কি। এমন এক বস্তু আছেন যাহা আপনিই আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন। ত্রিলোক মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার মধ্যে নাই; স্বর্গে দেবগণ, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভুজঙ্গগণ তাঁহারই কল্পমাত্র সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন অঙ্গে জল লাগিবে না এমন ভাবে ভাসা যায় না, তদ্রূপ সংসারে পড়িয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে না এরূপ ভাবে থাকা যায় না। অনলের যেমন দাহহীন শিখা নাই, সেইরূপ রাগ দ্বেষ শূন্য, সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত, সদনুষ্ঠানও সংসারে অসম্ভব। কেবল অস্তিত্বের অবসান তত্ত্ববোধ, যুক্তি ও উপাসনা ব্যতীত হয় না। (এই অসার সংসার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান নাশে ইহারও অবসান হয়।) জগতে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব পুরুষেরই আছে, আর সমস্তই অস্তিত্বহীন। অখণ্ড চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ এবং তিনি অদ্বিতীয়। পুরুষ শব্দে আত্মা—ব্রহ্ম, তিনিই

জীবরূপে অজ্ঞানবশে সংসার বদ্ধ হন; এবং অজ্ঞান ক্ষয়ে স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহা প্রণালী অনুসারে যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বস্তু তাহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতে যে ইন্দ্রত্বের এত গৌরব, কোন কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলে সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলে কমলাসনের ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বীয় কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে, এই কর্ম্মের এই ফল, এই প্রকার বাক্যই দৈব নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বতন কুকার্য্য যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা বিনাশ হইয়া শুভে পরিণত হয়, সেই জন্য যত্নপূর্ব্বক সৎকার্য্যে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

শরীরের মধ্যে যিনি কর্ত্তা হইয়া কার্য্য সম্পাদন করেন তিনিই কর্ম্মফল ভোগ করেন। যাহাকে দৈব বলে তাহা কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম মন, সেই মন পুরুষ অতএব পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন সকলই অনিত্য, সুতরাং দৈব নাই ইহা নিশ্চয়। জীবের এই সংসার হইতে উদ্ধার হইবার কেবল একমাত্র উপায় জ্ঞান। দান, তপস্যা, কঠোর ব্রত বা তীর্থ পর্য্যটন ইহারা উপায় নহে। এই সংসারে দুঃখই অনন্ত সুখ, অতএব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। বিবেক আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে পারিলে এই ঘোর সংসার নদী বা সাগর হইতে উদ্ধার হওয়া যায়।

ধন, মিত্র, বান্ধব, দেশান্তর গমন, কায়ক্লেশ, কাতরতা অথবা কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; কেবল একমাত্র মনোজয়েই ঐ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শম, সৎসঙ্গ, বিচার ও আনন্দ এই চারিটি মোক্ষের চারি দ্বারপাল। প্রথম বৈরাগ্য, দ্বিতীয় মুমুক্ষু, তৃতীয় উৎপত্তি, চতুর্থ স্থিতি, পঞ্চম উপশান্তি, ষষ্ঠ নির্ব্বাণ। যাহা প্রকৃত সত্য তাহার কারণ অর্থাৎ মূল নাই। যাঁহার কারণ নাই তিনিই পরমার্থ সৎ, সেই সৎ বস্তুই ব্রহ্ম। যেমন পদ্ম হইতে সরোবরের শ্রীবৃদ্ধি এবং সরোরর হইতে পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞান হইতে শম দমাদির বৃদ্ধি এবং শম দমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। আত্মার স্বরূপ আকাশবৎ নিরাকার এবং চৈতন্য স্বরূপ, তিনি জীবরূপী হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছেন। এই জগৎ দর্শন স্বপ্ন দর্শনের তুল্য। তুমি আমি ইত্যাদি রূপ প্রতীয়মান জগৎ সংসার স্বপ্ন উপমায় উপমেয়। জগৎ দর্শন সত্য কিন্তু জগৎ মিথ্যা, যেমন স্বপ্ন দর্শন সত্য কিন্তু স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় সমস্তই মিথ্যা। এই জগতে যে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বৃদ্ধি পায়, সেই নষ্ট হয়, সেই মুক্ত হয় এবং সেই স্বর্গ বা নরক ভোগ করে।

পরমাত্মার সহিত একতা সিদ্ধি, জ্ঞান যোগেই লাভ করা যায়, অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে তাহা হয় না। পরমাত্মা দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন, সুলভ নহেন, দুর্লভও নহেন, সেই পূর্ণানন্দ ব্রহ্মকে নিজ শরীরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত ইহার অন্য উপায় নাই। যিনি আত্মা যোগে

সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন তাঁহাকে আর মরণাদি আক্রমণ করিতে পারে না। কামাদি পরিত্যাগ ব্যতীত কিছু ফলদায়ী হয় না। রাগাদি বশীভূত হইয়া বঞ্চনা করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করা হয় তাহা দান করিলে পূর্ব্ব স্বামীই ফল ভাগী হয়। রাগাদির বশীভূত হইয়া কোন ধর্ম্ম কার্য্য করিলে তাহাতেও কিছু মাত্র ফল হয় না। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রথমে লোকে শাস্ত্রের অবিরোধী হইবে, যথা সম্ভব জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিবে, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিবে উদ্যোগী হইয়া সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলন করিবে। যে শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে তাহাই সৎশাস্ত্র।

পরমাত্মা অতি সন্নিকটে, আমাদের শরীর মধ্যেই চৈতন্য রূপে অবস্থিত আছেন। পূর্ণ স্বভাব ও নিত্য চেতন আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগৎ দর্শন নিবৃত্তি হইলে বহির্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী গতি উৎপন্ন হইলে, তাঁহার তৎকালীন যে পূর্ণাবস্থা প্রকাশ পায় তাহার নাম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার। সেই পরাৎপর ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন তাঁহার হৃদ্‌গ্রন্থি অর্থাৎ মায়া মোহ বিচ্ছিন্ন হয়, সমুদয় সন্দেহ দূর হয় এবং সঞ্চিত কর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত নিরোধ করিলে চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হয় না, একমাত্র দৃশ্য সকল মিথ্যা ভ্রান্তির পরিণাম এবং দৃশ্য মাত্রই মিথ্যা জ্ঞান হয়। যেমন রূপহীন আকাশে নীলাদি গুণ দেখা যায় তেমনই চিন্ময় ব্রহ্মে এই ভ্রম জগৎ দৃষ্ট হইতেছে।

এই জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি এই বোধের বিনাশ হইলে চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই যে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যাহা দেখা যাইতেছে ইহা কখন উৎপন্ন হয় নাই, ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্যেই কল্পিত অর্থাৎ তাঁহারই স্বরূপ। যখন এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই তখন ইহার অস্তিত্ব কোথায়? যেমন আকাশে কদাচ বৃক্ষের সম্ভব হয় না সেই প্রকার জগৎ কিছুই নহে। যিনি বাহিরে রাগ দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ ব্যবহার করিয়াও অন্তরে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ চিৎ স্বরূপ অবস্থান করেন তিনি জীবন্মুক্ত। যাহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না এবং শোক বা আনন্দ, যাঁহাকে আশ্রয় করে না তিনিও জীবন্মুক্ত। যেমন জল-প্রবাহ জল ভিন্ন আর কিছু নহে, স্পন্দন বায়ু হইতে ভিন্ন নহে, আকাশ শূন্য হইতে ভিন্ন নহে, আলোক তেজ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই ত্রিভুবনও সেই পরমব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যাঁহা হইতে দৃশ্য জগৎ দৃষ্ট হয়, কালের উৎপন্ন হয়, তেজের প্রকাশ, চেতনাদি যাহা কিছু জানিতেছ এই সকলই সেই ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু আর নহে। যাঁহার প্রভাবে জানিতেছ ও বোধগম্য হইতেছ সেই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

যেমন হিমের সহিত শৈত্যের পার্থক্য নাই, অগ্নির সহিত উষ্ণতার পার্থক্য নাই, আকাশের আকাশত্ব ব্যতীত পৃথক্ শূন্য পদার্থ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের পার্থক্য নাই। যে

জগৎ, কারণের অভাব বশতঃ অগ্রে ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, তাহার আবার নাশ কোথায়? সেই আদি কারণ ব্রহ্ম, তিনিই কার্য্যরূপে বিশ্বাকারে অবস্থিত আছেন। যদিও অজ্ঞান, বিশ্বের কারণ হইতেছে, কিন্তু উহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইতেছে না। স্বপ্নকালীন বস্তু দর্শনের ও কার্য্য করার ন্যায় এই জাগ্রত অবস্থায় জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। যেমন স্বপ্নে সমুদয় প্রত্যক্ষ হইলেও, সেই সকল কিছুই নহে সমস্তই ভ্রম, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎরূপ বস্তু না থাকিলেও অজ্ঞান বশতঃই দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই সমস্ত জগৎই পরমাত্মায় নিত্য অবস্থিত আছে, ইহা কখন উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। যেমন সলিল দ্রবভাবে, বায়ু স্পন্দন-রূপে, প্রকাশ প্রভার আকারে অবস্থান করে; সেই প্রকার ব্রহ্মও ত্রিভুবনাকারে অবস্থিত আছেন। যেমন স্বপ্ন দ্রষ্টার অন্তরে বিজ্ঞানই নগরাদি রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মাই ব্রহ্মে জগদাকারে শোভা পান। দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টা থাকে, এবং দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য থাকে, একটি থাকিলেই উভয়ের বন্ধন থাকে এবং একের অভাবে উভয়েই মুক্ত হয়। ভগবান আত্মভাব বিস্মৃত ও পরম্পদ ত্যাগ করতঃ সংসার উপাধি জীব ভাব প্রাপ্ত হন। এই দৃশ্য জগৎ চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। যেমন নির্ম্মল আকাশে মুক্তা ভ্রম হয়, সেইরূপ নির্ম্মল আত্মায় জগৎ ভ্রম হয়। এই জগৎ অজ্ঞান দৃষ্টিতে স্থূল হইলেও, গবাক্ষ ছিদ্রে নিপতিত সূর্য্য কিরণের সাহায্যে

পরমাণু সমষ্টির ন্যায়, জ্ঞানীর জ্ঞান দৃষ্টিতে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন গবাক্ষ দ্বার নিঃসৃত সূর্য্য কিরণের অভাবে পরমাণু নিচয় দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এই জগতের সূক্ষ্ম ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি এবং ক্রিয়া শক্তি, এই তিনটি, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের ধর্ম্ম। এই স্থূল শরীর ক্রিয়ার আশ্রয়, সূক্ষ্ম শরীর ইচ্ছার আশ্রয়, কারণ শরীর জ্ঞানের আশ্রয়। চিৎ বা চেতন ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্মের এই বিশাল শক্তি আকাশ হইতে সূক্ষ্ম। এই দৃশ্য জগতে, আকাশে যেমন সূর্য্যালোক প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জগৎ ও চিন্ময় ব্রহ্মে প্রকাশ পাইতেছে। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও আকাশ এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে চিদাকাশকে শূন্যতর জানিবে। ঐ চিদাকাশ কোষেই মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মার আত্মা অবস্থান করে। তথায় গমন করিতে পারিলে সমস্ত অনুভব হয়। নিমেষ সময় মধ্যে চিত্ত দুর হইতে দূর প্রদেশ গমন করে। চিত্তের সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহে সর্ব্বাত্মক পরমতত্ত্ব লাভ হয়। যেমন কল্পনা রচিত কোন বস্তু অন্য লোকে দেখিতে পায় না, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কেহ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না। জ্ঞান চক্ষু ফুটিলেই সমস্ত দর্শন হয়।

স্বপ্নে যেমন জাগ্রদ্দশার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, তেমনই মরণ হইলে পূর্ব্বস্মৃতি কিছুই মনে থাকে না। জীব ক্ষণকাল মিথ্যা

মরণ মোহ অনুভব করিয়াই প্রাক্তন সংসার বিস্মৃত হইয়া অন্য রূপ অবলোকন করে। তখন চিদাকাশে আকাশরূপী জীব বিবেচনা করে এই আমি আধেয় হইয়া এই আধারে রহিয়াছি। একমাত্র চিদাকাশই স্বপ্রভাবে জগদাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃশ্য পদার্থ কিছুই নাই বলিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য বোধ কিছুই নাই। যেমন জীবের মরণরূপ মোহের নিমেষ কাল মধ্যে ত্রিভুবনরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হয়, তাহার পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে অর্থাৎ জীব পূর্ব্বে যেমন কালক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল এবং পূর্ব্বে পিতা, মাতা, বন্ধু, ভৃত্য, বর্ণ, জ্ঞান, চেষ্টা, ক্ষয়, উদয় এই সমস্ত যেমন যেমন ছিল, চিৎ শরীরে জন্মলাভ করিয়া ঐ সমুদয় সেইরূপেই অনুভব করে। এই আমি জন্মিলাম, আমি বালক ছিলাম, ইনি আমার মাতা, ও ইনি পিতা, এই প্রকার বোধ তাহার পূর্ব্বস্মৃতিবলেই হইয়া থাকে এবং পরে পুষ্প হইতে ফলোৎপত্তির ন্যায়, যখন তাহার পূর্ব্বস্মৃতি হয়, তখন হরিশ্চন্দ্র যেমন এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বোধ করিয়াছিলেন, তাহারও সেইরূপ হয়। যেমন চক্ষুরুন্মীলন করিলে নানাপ্রকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার জীবের মরণ মূর্চ্ছার পরক্ষণেই অসংখ্য দৃশ্য জগৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দিক্, কাল, আকাশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও কল্পান্ত স্থায়ী অসংখ্য বস্তুনিচয় সেই চিদাত্মায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জীব যাহা কখন অনুভব করে নাই, দেখে নাই স্বপ্নে নিজ মৃত্যুর ন্যায় সেই সকলও তৎক্ষণেই স্মরণপথে উপস্থিত হয়। এই সংসারে

অত্যন্ত বিস্মৃতিই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, ঐ জ্ঞান জন্মিলে অসীম সংসারকে পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না।

তিনি একমাত্র হইয়া কার্য্য ও কারণের সারূপ্য আশ্রয় করতঃ চিদাকাশে অবস্থান করিতেছেন। অগ্রে সমাধি প্রভাবে স্থূল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচেত্য চিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অমলা হইলে তাহার পর মর্ত্ত্যবাসী জীব যেরূপ কল্পনাবলে অন্তরীক্ষে নগর দর্শন করে, সেইরূপ চিদাকাশস্থিত ব্যোমাত্মস্বরূপ সৃষ্টি দর্শন করে। এই প্রকার করিতে পারিলেই লোকে তখন স্বর্গ দেখিতে পায়। এই স্থূল দেহই সৃষ্টি দর্শনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ব্রহ্মই ব্রহ্মকে দেখিতে পান, যিনি ব্রহ্ম নহেন তিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান না। ব্রহ্মের এই স্বভাব যে তিনি নিজ কল্পিত সৃষ্টি জগদাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মে জগতের কার্য্য বা কারণের উদয় নাই। অভ্যাসযোগে যাবৎ তোমার ভেদজ্ঞান দূর না হইবে, তাবৎ তুমি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবে না। তুমি যখন নিজ দেহেই নিজের সংকল্পিত নগর দেখিতে পাইতেছ না, তখন কিরূপে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া অন্যের সংকল্পিত নগর দেখিতে পাইবে, সুতরাং এই দেহ ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ের স্বরূপ আশ্রয় কর, তাহা হইলে তুমি ঐ সঙ্কল্পিত নগর শীঘ্র দেখিতে পাইবে। সমাধিস্থ হইলেই নিজ দেহ এই স্থানে রাখিয়া, বিশুদ্ধ সত্য স্বরূপ চিত্ত মাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় যাইতে

হয়। দেব দেবীর আকার ও দেহ আকাশময় জানিবে। মূর্ত্তি শূন্য হইলেই আর কোন প্রতিবন্ধক হয় না। ঐ সকল দেহ শুদ্ধ সত্ত্ব গুণে নির্ম্মিত বলিয়াই চিৎ স্বরূপের প্রতিভাস মাত্র, সুতরাং পরমব্রহ্মের সহিত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যেমন গন্ধের সহিত বায়ু, জলের সহিত জল, অগ্নির সহিত অগ্নি, বায়ুর সহিত বায়ু মিলিত হয়, সেইরূপ তাহাদের মনোময় দেহ, অন্য মনোময় দেহের সহিত মিলিত হয়। মরণের পর জীবমাত্রেই আতিবাহিক দেহ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই আতিবাহিক দেহকে কেহই উৎপন্ন হইতে দেখিতে পায় না, লোকে কেবল মৃত জীবের স্থূল দেহই দর্শন করিয়া থাকে। যেমন স্বপ্ন দর্শন কালে গৃহে থাকিয়াই উজ্জ্বল নগর দর্শন করা যায়, সেইরূপ চিৎ পদার্থে এই সংসার অসৎ হইলেও সৎ ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন আকাশে বায়ু ও অনিলে সৌরভ অদৃশ্যভাবে থাকে, সেইরূপ মৃত্যুর পর জীব জীবাকাশ হইয়া গৃহাকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। অঙ্গুষ্ঠমাত্র আকাশেই অনেক রাজ্য অবস্থিত কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ উহা কোটী যোজনব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। পরমাকাশের আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; পরমাকাশ মহান্ আত্মায় অবস্থিত, ঐ নির্ম্মল আকাশের সীমা নাই। প্রমাণ বর্জ্জিত সেই পরমাকাশে এই বিশাল জগৎ এবং অণু প্রমাণ অপর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে।

চেষ্টা চিত্তের অনুগামী, চিত্ত চৈতন্যের অনুগামী। যাহার প্রকৃত আকার আকাশের সদৃশ কিরূপে তাহা অবরুদ্ধ হইতে

পারে। চিত্তাকৃতি আতিবাহিক দেহ, কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হইতে পারে না; জ্ঞান প্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চিত্ত শরীর এত সূক্ষ্ম যে তাহা ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুর মধ্যে বিলীন ও পল্লব মধ্যে রস রূপে অবস্থিতি করে, যথেচ্ছায় আকাশে যাইতে পারে এবং পর্ব্বতের জঠরেও যাইয়া থাকে; এই শরীর অনন্ত আকাশব্যাপী হইয়াও পরমাণু হইয়া থাকে। প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং প্রত্যেক চিত্তই পৃথক পৃথক জগদ্-ভ্রম ধারণ করে। এই জগতে মরণ মূর্চ্ছা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে, ঐ মূর্চ্ছা মহাপ্রলয়ের যামিনী স্বরূপ, সেই প্রলয় রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহার যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম্ম সে তদনুরূপ সৃষ্টি দর্শন ও অনুভব করে, প্রাক্তন সংস্কারই জন্ম মৃত্যুর কারণ। মরণ মূর্চ্ছার পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প সৃষ্টিভাব উদয় হয় তাহাই সৃষ্টির প্রকৃতি। সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর; অনেক কল্প পরে সেই আতিবাহিক দেহ, আমি স্থূল এই কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়; তখন স্থূল দেহাশ্রিত চক্ষুরাদির বশবর্ত্তিতা বশতঃ তত্তদ্দেশকালগত পদার্থ সকল, বায়ুর স্পন্দন ক্রিয়ার ন্যায় তাহারই অধীনে তাহাতেই মিথ্যা ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই প্রকার ভূবন ভ্রান্তি বৃথাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স্বপ্নে অঙ্গনা সম্ভোগের ন্যায় অনুভূত হইয়াও অসত্য হইয়া যায়। জীব যেখানে মরে সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ

তাহার উক্ত প্রকার জ্ঞান হয়, সুতরাং সেই স্থানেই ভুবন দর্শন ঘটিয়া থাকে। ঐ প্রকার আকাশসম সূক্ষ্ম জীব বাস্তব জন্মাদি শূন্য হইলেও আগন্তুক দেহাদি ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি জন্মিয়াছি, আমি জগৎ দেখিতেছি, এই প্রকার বিবিধ ভ্রম অনুভব করে।

এই স্থূল বিশ্ব মনন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি বল মন চঞ্চল স্বভাব আর স্থূল বিশ্ব স্থির স্বভাব, বিচার করিয়া দেখ ইহাও চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর। যাহাকে চিদাকাশ বলা হইয়াছে তাহাই মনন অর্থাৎ মনের আশ্রয়, যাহা চিদাকাশ তাহাই পরমপদ, যাহা জল তাহাই আবর্ত্ত, যাহা দৃশ্য তাহাই দ্রষ্টা। মিথ্যারূপী অনাদি মায়া চিদাকাশে অথবা চিত্তাকাশে নাম রূপাদি সম্পন্ন বিবিধ বস্তু দর্শনকারী জীব ভাবের স্ফুরণ করাইয়া থাকে, চিত্তের সেই সেই স্ফুরণ এক্ষণে জগৎ। একমাত্র আমি, এই জ্ঞান থাকিলেই জগৎ শব্দ পরমার্থ স্বরূপে অনুভূত হয় কিন্তু তুমি এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎ শব্দ আরোপিত বলিয়া বোধ হয়। চিদ্‌বস্তু সর্ব্বগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় আর তাহা আতিবাহিক ও সূক্ষ্ম ; অতএব এমন কোন বস্তু নাই যাহা দ্বারা তাদৃশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতোগামী আতিবাহিক দেহকে অবরোধ করিতে পারে।

এই জগৎ সমুদয় আত্মাই, ইহাতে দেহাদি কল্পনা কিরূপে হইতে পারে। যাহা কিছু দেখিতেছ সমুদয়ই আনন্দরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম। আধিভৌতিক জ্ঞান হইলে দেহও তূলাবৎ লঘুতা প্রাপ্ত

হয়। জ্ঞানোদয় হইলে এই স্থূল দেহ আকাশ গমন যোগ্য হইয়া থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রমের ন্যায় এই স্থূল দেহ অনুভব ভ্রান্তি মাত্র। যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু জাগরণের পর কোথায় যায় জানা যায় না সেইরূপ বিচারক্ষম জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিকট এই আধিভৌতিক দেহ অসত্য হইয়া যায়। স্বপ্ন ও জগৎ পদার্থ সমস্তই এক প্রকার এ বিষয় সন্দেহ নাই; জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত অসত্য হইয়া যায় সেইরূপ জ্ঞান হইলে এই স্থূল দেহাদি আকাশে পরিণত হয়।

আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে আধিভৌতিক দেহের অবস্থা কিছুই মনে থাকে না। যেমন পত্র পুষ্প ফলরূপে বৃক্ষ একই পদার্থ সেই প্রকার এই অসীম জগৎ সমস্ত পদার্থ সহিত একই ব্রহ্ম। যেমন আকাশের মধ্যে আকাশের শূন্যতা মিলিয়া থাকে যেমন তরঙ্গ জল হইতে পৃথক নহে, স্ফটিক শিলা হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে যুগপৎ যে পরব্রহ্মে ব্রহ্ম মাত্র স্বরূপের যে জ্ঞান তাহাই জগৎ ও আমি নানা প্রকারে ভাসমান হয়। স্ফটিক শিলা হইতে অভিন্ন এবং আলোক দীপ হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথক্ সন্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চিন্ময় পরমেশ্বর এই জগৎ ও আমি অভিন্ন হইলেও বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন জলে তরঙ্গ উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে, অথচ এই তরঙ্গ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ পরমেশ্বরে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা হইতে পৃথক্ কিছুই নহে। যেমন তেজ

ও আলোক অভিন্ন, কেবল প্রকার ভেদ মাত্র, সেই প্রকার চিদ্‌ব্রহ্মে প্রকার ভেদ এই বিশ্ব। যেমন হস্ত পদাদি দেহ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ ছাড়া নহে। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, আত্মার জ্যোতিঃ, মনের চঞ্চলতা, জীবত্বও সেইরূপ।

এই বিশ্ব দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে দর্শক যাহাকে পুরবাসী নরগণ বলিয়া জানে, তাহার নিকট ক্ষণকালের জন্য সে নর বলিয়া প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য, স্বপ্নাকাশের অন্তরে অবস্থিতি; সেই চৈতন্য, স্বপ্ন দ্রষ্টার বাসনা অনুসারে বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায়। সেই চৈতন্যের ঐক্য প্রভাবেই নরত্ব বোধ হয়। এই জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে, কেবল ভ্রান্তি মাত্র বিরাজ করে, এক ব্রহ্মই জগৎ তন্মধ্যে সৃষ্টি নামিকা এই ভ্রান্তিই রহিয়াছে। যেমন জলে তরঙ্গ তেমনই ব্রহ্মে সৃষ্টি। সূর্য্য উদয় হইলে ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বগামী ব্রহ্ম, যে স্থানে যেরূপ বাসনা উদিত হয় স্বপ্নলব্ধের ন্যায় তথায় সেইরূপ দৃশ্য হন। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান; দৃঢ় অভিনিবেশ বাসনায় যখন যে শক্তির উদয় হয় তখন তাহারই অনুরূপ দৃশ্য হন, অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন।

মনুষ্য ত্রিবিধ, মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিবান। অভ্যাসবশে

যাহারা ধারণানিষ্ঠ হইয়াছে ও যাহারা যুক্তিযুক্ত তাহারা সুখে দেহ পরিত্যাগ করে। যাহার ধারণা অভ্যস্ত হয় নাই ও যুক্তিযুক্ত নহে সেই মূর্খ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বাসনার আবেশে বশীভূত হইয়া মৃত্যুকালে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, দিক সকল অন্ধকারময় দেখে, চারিদিক গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন দেখে, দিবাতেও তাহার উদয় দেখে; তখন তাহারা মর্ম্ম ব্যথায় বসুধাকে আকাশের ন্যায় দেখে, আকাশ বসুধার ন্যায় দেখে; কখন আকাশে নীত, কখন অন্ধকূপে পতিত বোধ করে, কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাক্যের জড়তা বশতঃ কিছুই বলিতে পারে না, মনে করে অনবরত উর্দ্ধ হইতে পরিতেছি ও উঠিতেছি, স্বীয় নিশ্বাসধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হয়, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, পূর্ব্বাপর থাকে না।

যাহার এক বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ তাহার বিষম গতি হয়; এক বস্তুতে অত্যাসক্ত হইলে অন্য বিষয়ের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। মূঢ় ব্যক্তি কেবল ইহলোকের আত্ম নাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। যে ব্যক্তি স্বীয় আত্ম দর্শনে অসমর্থ, তাহার জীবন মরণ একই কথা। আত্মা সর্ব্বাত্মক, এই হেতু যখন উহার সাক্ষাৎ হয় তখন কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, যাহা কিছু সমুদয় সেই আত্মা, অপর কিছুই থাকে না। এই আত্মা পরমাকাশ ও সূক্ষ্ম বলিয়া ইহা লক্ষ্য হয় না, সর্ব্বাত্মক বলিয়া উহা কদাচ শূন্য হয় না, তথাপি নাই বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না, কারণ আছে কিম্বা

নাই ইহা যিনি বলেন বা বোধ করেন তিনিও সেই আত্মা। যেমন স্থবর্ণ হইতে যত প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, ততই ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে কিন্তু স্থবর্ণ একই। কোন প্রকার যুক্তি দ্বারা আত্মার অসত্তা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কর্পূর যেমন সিন্ধুক মধ্যে আবৃত থাকিলেও গন্ধ দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক রূপেতে আচ্ছন্ন থাকিলেও সর্ব্বময় আত্মা প্রত্যক্ষ গোচর হন। চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, তিনিই ইন্দ্রিয়গণের সার, অতএব তিনিই প্রত্যক্ষ, তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ। যাবৎকাল বলয় জ্ঞানের সত্তা থাকে, তাবৎকাল স্থবর্ণ জ্ঞান থাকে না; সেই প্রকার যাবৎকাল দৃশ্য জ্ঞান থাকে, তাবৎকাল দর্শন অর্থাৎ আত্মচৈতন্য জ্ঞান থাকে না। যেমন বলয় জ্ঞান নাশ হইলে স্থবর্ণ জ্ঞান, সেইরূপ দৃশ্য জালের তিরোহিত হইলেই সেই এক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হন। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ অতি সূক্ষ্ম আকাশ তুল্য সেইরূপ ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎ ও চিৎ অতি সূক্ষ্ম। এই বায়ুসম চঞ্চল জগৎ, চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, একমাত্র আত্মাই আভাস রূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন জগতে কোন পদার্থই নাই।

তিনি আপনাকে গোপন করিতে অসক্ত হইয়া চিদ্রূপে অণু বিস্তার পূর্ব্বক তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। হস্তী যেমন দূর্ব্বাক্ষেত্রে লুক্কাইত থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরমব্রহ্ম আকাশাত্মা কোন স্থলেই অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন

না। আকাশ সদৃশ শরীর বিহীন চিত্তই স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, চিত্তই অহঙ্কার রূপে দেহাদিতে ব্যাপ্ত আছেন। যাহা চিত্তের চিদ্ভাগ অর্থাৎ চৈতন্য ভাগ তাহাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার বীজ, যাহা জড় ভাগ তাহাই ভ্রান্তিময় জগৎ। চিন্ময় ব্রহ্ম যখন সর্ব্বময় তখন এই সমস্ত জড় পদার্থ উক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া চিন্ময় বলিতে হইবে। এই জীব সমুদয় ব্রহ্ম, ভ্রান্তি জ্ঞানে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। জীবদেহ পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার পরম পদেই বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে। যেমন তরু হইতে উৎপন্ন পুষ্প ও সৌরভ পরস্পর অভিন্ন, যেমন বৃক্ষে নানাবিধ পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপ ব্রহ্মাই সহস্র সহস্র জীব দেহের উৎপত্তি ও তাহাতেই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। যেমন বসন্তকালে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয়, সেইরূপ অদ্যাপি জীবসমূহ সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভুত হইতেছে এবং তাহাতেই বিলীন হইতেছে। যেমন বহ্নি ও উষ্ণতার পৃথক্ সত্তা নাই সেইরূপ জীব ও মনের পৃথক্ সত্তা নাই। যে স্থানে যাহার বাসনা যেরূপ আরোপিত হয়, তথায় সেইরূপ তাহা ফল রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বীজ মধ্যে ফল, পুষ্প, লতা, পত্র, শাখাদিসহ বৃক্ষ অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্ম মধ্যে এই জগৎ সমুদয় অবস্থিত। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গাকারে জলই আবর্ত্তিত আছে, যেমন সাগরে জল ব্যতীত আর কিছু নাই; সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা আর কিছু নাই। জ্ঞানাবৃত পরমব্রহ্মাই

চিত্ত ও জীব জানিবে, ব্রহ্মই জ্ঞানাবৃত হইয়া আপনাকে জীব রূপে প্রকাশ করিতেছেন।

মেঘের সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, শরীরের সহিত আত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। আত্মা কোথাও গমন করেন না, দেহ ক্ষয় হইলে অনন্ত আকাশে বিলীন হন, অর্থাৎ পরমাত্মায় অবস্থান করেন। দেহ কেবল মৃত্যুরূপ পট দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। আত্মার তিরোধানই মরণ শব্দে অভিহিত হয়। সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমা যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে, জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থার ক্রিয়াও তদ্রূপ চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। যেমন সমুদ্রের ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে কিছু নাই কেবল তাহার মধ্যভাগে জল থাকে তেমনই পরমব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। অব্যক্ত পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ সেই পরম পদের মধ্যভাগে এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। এই যে সৃষ্টি দেখিতেছ ইহা ব্রহ্মে ব্রহ্ম অবস্থিত করিতেছেন, এই সৃষ্টি সেই জন্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বৃক্ষ বীজ হইতে পৃথক্ আকার ধারণ করে, কিন্তু তাহা পদার্থ একই। সর্ব্ব প্রকার পদার্থময় এই বিশ্বকে সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, যেহেতু অনন্ত ব্রহ্মই সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বরূপে প্রতিভাত হন।

সমস্ত পদার্থের শক্তি; দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, মৃত্তিকায় ঘটের ন্যায়, সূত্রে তূলার ন্যায় ও বীজে বৃক্ষের ন্যায়, আত্মাতে অবস্থিত আছে। ঐ শক্তি সমুদয় ক্ষীরাদি হইতে ঘৃতাদির ন্যায় আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহার দশা প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ

বাস্তবিক বিরচিত নহে, জলতরঙ্গবৎ উহা স্বতঃ সম্ভূত। এই জগতের কেহই কর্ত্তা ভোক্তা বা বিনাশয়িতা নাই। আত্মা কেবল সাক্ষী মাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যেমন প্রদীপ থাকিলেই আলোক উদ্ভূত হয়, সূর্য্যোদয় হইলে দিবস আবির্ভাব হয়, এবং পুষ্প থাকিলে সৌরভ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ জগৎও স্বতঃ সম্ভূত। আলোকাদি প্রকাশে দীপাদির যেমন কোন চেষ্টাই নাই, সেইরূপ এই জগৎ সম্পাদনে ঈশ্বরের কোন চেষ্টাই নাই ; যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদয়ই আভাস মাত্র, উহা সমীরণের স্পন্দনবৎ সৎও নহে অসৎও নহে। যেমন আকাশে তারকারূপ কুসুমরাশি কখন প্রকাশিত, কখন অপ্রকাশিত ও কখনও অল্প প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার যাহা আত্মায় আত্মস্বরূপ তাহা কিরূপে নষ্ট হইবে।

এক ব্রহ্ম হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বা অসংখ্য এই জীব পূর্ব্বে কতই জন্মিয়াছে, এখনও জন্মিতেছে, পরেও জন্মিবে। ঐ জীবসমূহ নিজ বাসনা দশার আবির্ভাবে বিবশ ও অতি বিচিত্র বিবিধ দশায় আপনিই নিপতিত হইয়া নিরন্তর চতুর্দ্দিক, দেশে দেশে ও জলে স্থলে, জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে ও বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই জীবসমূহের কেহ কেহ একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেহ কেহ এক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, কেহ কেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কেহ সহস্র কল্প কেবল বারংবার জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ কেহ এক যোনিতেই অবস্থিত, কেহ বা অন্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ

কেহ নারকী হইয়া দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতেছে, কেহ বা মর্ত্ত্য হইয়া কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতেছে ; কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ এবং কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর হইয়া রহিয়াছেন, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র হইয়া রহিয়াছে, কেহ চণ্ডাল, কেহ কোল, কেহ ভিল, কেহ নাগা হইয়া রহিয়াছে, কেহ তৃণ, কেহ ফল, কেহ পতঙ্গ, কেহ কীট হইয়া জলে স্থলে রহিয়াছে, কেহ কেহ শাল, কদম্ব, জম্বীর, তাল ও তমাল বৃক্ষ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে ; কোন কোন জীব বিভবশালী, কেহ ভূপতি, কেহ মন্ত্রী, কেহ সামন্ত হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ চীরাম্বরধারী মৌনাবলম্বী মুনি হইয়া অবস্থিত, কেহ নাগ, কেহ অজাগর সর্প, কেহ কৃমি, কেহ পিপীলিকা হইয়া রহিয়াছে ; আবার কেহ সিংহ, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ হরিণ, কেহ মহিষ, কেহ গাভী, কেহ ঘোটক, কেহ হস্তী, কেহ ছাগ, কেহ মৃগ হইয়া রহিয়াছে ; কেহ বায়ু, কেহ আকাশ হইয়া রহিয়াছে ; কেহ কেহ জীবন্মুক্ত হইয়া পরম কল্যাণভাজন হইয়া বিচরণ করিতেছেন, কেহ চিরন্মুক্ত, কেহবা পরমাত্মায় পরিণত হইয়াছে, কাহারও মুক্তি লাভের অনেক বিলম্ব, কোন কোন জীব বিষয় লম্পট, কেহ বা আত্মার মুক্তির প্রতি দ্বেষ করিতেছে ; কেহ কেহ বিশাল দিক্ হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ মহা বেগবতী নদী হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে। এই সকল স্বীয় জীব বাসনাবলেই আবদ্ধ ও বিবশ হইয়া এই প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। এই

জীবসমূহ বাসনারূপ শরীরাদি ধারণ করতঃ আশা পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পক্ষিগণের ন্যায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনাগমন করিতেছে।

কেহ কেহ আত্ম দর্শনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও তুচ্ছ বুদ্ধিতে বিফল মনোরথ হইয়া অধোগামী হয় এবং তাহার পর নরকে গমন করে; কেহবা ঐ শক্তিবলে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জীবগণ যাদৃশ ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য জীব তাদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। সেই পরমব্রহ্ম হইতে অসংখ্য জীবরাশি অনবরত নির্গত হইতেছে। এই জীবরাশি দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সূর্য্য হইতে মরীচির মত, উত্তপ্ত লৌহ হইতে কণার ন্যায়, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, কাল হইতে ঋতু বিভাগের ন্যায়, কুসুম হইতে সৌরভের ন্যায়, বর্ষা জলপ্রবাহ হইতে তুষারের ন্যায় এবং সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, সেই পরমপদ হইতে অবিরত উৎপন্ন হইতেছে এবং দেহ পরম্পরা ভোগ করতঃ যথাকালে আবার সেই পরমপদে লীন হইতেছে।

এই জগৎ এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন; দেখিতে গেলে উহা ভ্রান্তি দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইবে। যাহার অজ্ঞান নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে এবং বাসনাসমূহও বিগলিত হইয়াছে, তাদৃশ প্রবুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি এই সংসার স্বপ্ন দেখিতে গেলে দেখিতে পায় না। মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হওয়ার পরেও

জীবগণের স্বভাব কল্পিত এই সংসার পরমাত্মায় সর্ব্বদা সূক্ষ্মরূপে বিলীন থাকে। নিখিল জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম স্বরূপ, ইহাতে আবার সুখ দুঃখ কি, যাহা অসৎ তাহার আবার বৃদ্ধি কি প্রকার? বৃদ্ধি যখন নাই তখন হ্রাসেরও কারণ নাই। অতীতে ও ভবিষ্যতে যাহার অস্তিত্ব নাই বর্ত্তমানেও তাহা সেইরূপ অস্তিত্ব বিহীন। মৃত্তিকারাশিতে যেমন ভাবী ঘট বিদ্যমান, বীজে যেমন বৃক্ষ বিদ্যমান, সেইরূপ পরমব্রহ্মেও আরও কত ভাবী জীব অবস্থিত রহিয়াছে। বৃষ্টি যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, এই সৃষ্টি সমুদয়ও সেইরূপ পরমব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। এই সংসার মনেরই বিকাশ মাত্র যেমন চন্দ্র হইতে উৎপন্ন চন্দ্র কিরণ। সঙ্কল্প দৃঢ় করাই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়, এই জগৎ সঙ্কল্প ব্যতীত আর কিছু নহে, দুঃখ ব্যতীত ইহাতে সুখ কদাচ নাই। সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পকে এবং মন দ্বারা মনকে ছেদ করিয়া কেবল স্ব আত্মাতে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে এই নিখিল সংসার দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইবে। সঙ্কল্প, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা ও জীব একই পদার্থ, কেবল নামমাত্র প্রভেদ।

সকল পদার্থে যখন বাধা বিদ্যমান, তখন ভাবনা কোথায় থাকিবে? সত্য বলিয়া যাহার উপর আস্থা ছিল, তাহা যদি অসত্য হইল, তবে বাসনা কি প্রকারে থাকিবে? ভাবনা ক্ষয় হইলে আত্ম লাভ সিদ্ধি হয়। অভ্যাস বলে যখন দৃশ্য পদার্থের প্রতি অবহেলা দৃঢ়তর হইবে, তখন জানিবে সকলই

অসৎ। পরমাত্মা উদাসীন ও ইচ্ছা বিহীন বলিয়া কিছুই ভোগ করেন না আবার সকলেরই প্রকাশকারী বলিয়া, ভোগও করেন এবং ক্রিয়াও করেন, আত্মাই আত্মাকে জানেন। বাসনা ক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। যাঁহার মন বাসনা শূন্য হইয়াছে তাঁহার প্রাণায়াম কর্ম্ম, সমাধি বা জপ কিছুই প্রয়োজন নাই। আত্ম সাক্ষাৎকার ভিন্ন জগতে এমন কোন সুখ নাই যাহাতে একেবারে দুঃখ নাই। বহ্নিশিখার প্রান্তে যেমন কজ্জল অবস্থিত সেইরূপ সকল সুখের অন্তে দুঃখ অবস্থিত।

তুমি যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ ইহা সেই পরমব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে। মনোময় দেহই সুখ দুঃখের আকর, মাংসময় দেহ নহে। জগতের উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই, উহা ভ্রান্তি মাত্র। প্রাণিগণেরই আত্মা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাতেও দেহ কারণ নহে, অর্থাৎ দেহ উহার কিছুই প্রাপ্ত হয় না। আত্মাই জীব ভাব প্রাপ্ত হইলে আত্মাতেই দেহ ভাব প্রকাশ হইতে থাকে, বিচার করিয়া দেখিলে আত্মাতে পৃথক্ দেহ প্রকাশ পায় না। চিৎশক্তির সর্ব্বগামিত্ব আছে বলিয়া অপর মনোময় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কদলী বৃক্ষের আবরণ কোষের ন্যায়, জগৎসমূহ বিরাজমান আছে। ব্রহ্ম বাহ্য ও অন্তর অখিল জগৎপুঞ্জের অদূরবর্ত্তী, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান আছেন। ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ পত্রসমূহ দ্বারা কদলী স্তম্ভ যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া লক্ষিত হয়,

ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ জগৎসমূহ দ্বারা প্রকাণ্ড। যেমন কদলী তরু ও তাহার পত্রসমূহে কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিসমূহে কোন পার্থক্য নাই; যেমন একমাত্র বীজই জল সেকে বৃক্ষাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বীজরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞান বশতঃ মনোরূপে পরিণত হইয়া পরে জ্ঞানবলে পরব্রহ্ম রূপে পরিণত হইয়া থাকে। সরস বৃক্ষ বীজ, যেমন বীজগত রসের সাহায্যে ফল রূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীবই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। বীজ বীজকার পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ ও ফল ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম স্বকীয় আকৃতি ত্যাগ না করিয়া জগদ্ভাব ধারণ করেন। বীজ ফলাকারে বিদ্যমান থাকে, বীজের আকৃতি অনুসারে সমুদয় অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্মের কোন প্রকার আকৃতি নাই. সুতরাং বীজের সহিত ব্রহ্মপদের তুলনা হইতে পারে না।

চিৎ স্বপ্নকালে স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ সত্যরূপে অনুভব করে, চিদাণুর মধ্যে সূক্ষ্ম জগদাকার বাসনা অবস্থিত, যেমন বীজের মধ্যে পত্র, লতা, পুষ্প ও ফলের অণু বিদ্যমান থাকে। চিৎ ও জগৎ পরস্পর পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট জীবের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম, আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিত ; সুতরাং জীবের উদরগত জগতেও অনেক প্রকার জীব থাকিতে পারে। যাহাতে স্থির প্রতীতি থাকে তাহাই জাগ্রৎ, যাহাতে অস্থির প্রতীতি থাকে তাহাকেই স্বপ্ন কহে। যে জাগ্রৎ দৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী তাহা স্বপ্ন, আর যে

স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ কালান্তর স্থায়ী তাহা জাগ্রৎভাবে পরিচিত। স্থিরত্ব ও অস্থিরত্ব ব্যতীত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশার ভেদ নাই। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন সমস্ত অনুভবই সমান। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণ সৌম্য ভাবাপন্ন হয়। আত্মজ্ঞানেই অশেষবিধ সুখ দুঃখ দশার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। অচঞ্চল আত্মাতে চঞ্চল চিত্তই চমৎকার প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই চিৎ শক্তির চমৎকারিত্বই জগৎ স্বরূপে বোধগম্য হইতেছে। অন্তরে যাবৎ-কাল চিৎজ্যোতিঃ অহঙ্কার মেঘে আবৃত থাকে তাবৎকাল পরমার্থ কুমুদ্বতী বিকাশ পায় না। অহঙ্কার মেঘ চৈতন্য সূর্য্যকে আবরণ পূর্ব্বক অবস্থিত থাকিলে জড়তারই প্রাদুর্ভাব হয়, কোনক্রমেই আলোক প্রকাশ পায় না। এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎ সত্ত্বাই আত্মাতে বিদ্যমান, আমিও নাই, এবং অন্য কেহও নাই, ইহাই স্থির জানিবে। বাসনা বিহীন হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে, বিবেক বলে বাসনা ত্যাগ কর। কলুষিত চিৎতত্ত্বই জীব নামে অভিহিত হয়। সর্ব্বগামী স্বচ্ছ একমাত্র আত্মা বিদ্যমানে এই দেহই আমি ইত্যাকার যে ভাবনা তাহাই বন্ধন শব্দে অভিহিত জানিবে।

সংসার অপেক্ষা দুঃখের স্থান আর কিছু নাই। এমন মূর্খ কে আছে যে শ্মশান পতিত শবের সহিত আলাপ করে। কোন বিষয় সন্দেহ হইলে মূর্খকে কেহই জিজ্ঞাসা করে না। দেহীর দেহ মধ্যে নানা প্রকার কীটাদি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, এবং সেই দেহীর ত্যাজ্য বিষ্ঠাতে ও নানাবিধ কীটের জন্ম হয়,

এইরূপে জীবের নানা অবস্থায় জন্ম ও কষ্ট ভোগ ব্যতীত আর কিছু নাই। অজ্ঞান ভাবে দিন না কাটাইয়া সর্ব্বদা বিচার চর্চ্চা কর্ত্তব্য। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সহিত পশুদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কারণ পশুরা রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, আর অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবশ চিত্তই বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা হইতে পৃথক হইয়া চিত্ততা লাভ করিলেই, মনের উৎপত্তি হয় এবং যদি তাহার পৃথক্ জ্ঞান না হয় তবে মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি আত্মা, জীব নহি, যখন এই জ্ঞানের প্রকাশ হয় তখন চিত্তের শান্ত অবস্থা বলিয়া জানিবে। যেমন কাষ্ঠ সংযোগে অনলের বৃদ্ধি হয় সেইরূপ চিন্তা করিলেই চিন্তার বৃদ্ধি হয়। কাষ্ঠ অভাবে অনল নির্ব্বাণ হয়, চিন্তার অভাবে চিন্তা নষ্ট হয়। বিষয় চিন্তাকেই চিত্তের বৃত্তি কহে, ঐ চিন্তা ব্যাপারে চিত্ত আশার সহিত প্রকাশ পায়, সুতরাং আশা ত্যাগ করিলেই চিত্ত নাশ হয়। আশাই জীবের বন্ধন সাধন করে, সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে কোন ব্যক্তি মুক্তি লাভ না করিয়া থাকে।

এই জগতে মোক্ষ নামে একটি দেশ আছে ভগবান আত্মাই তথাকার রাজা, এবং মনই তাঁহার মন্ত্রী, যেমন মৃত্তিকা মধ্যে ঘট এবং ধূমের মধ্যে মেঘ সেইরূপ ঐ মনের মধ্যে এই বিশ্ব বাসনারূপে পরিণত হইয়াছে। সেই মনকে জয় করিতে পারিলেই সমস্ত জয় করা হয় ও সমস্তই পাওয়া যায়। সেই মনকে দুর্জ্জয় বলিয়া জানিবে, কেবল যুক্তিতে উহার বিনাশ হয়

এবং বিষয়ে অনাস্থা, ইহাই মনোজয়ের যুক্তি। এই দৃশ্যমান বিষয়ের বৈরাগ্য ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। সকলে মোক্ষ ইচ্ছা করে কেন, কে তাহাদের বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? কেহই বদ্ধ নহে অথচ মোক্ষের ইচ্ছা ইহাই আশ্চর্য্য। যে বদ্ধ নহে তাহার আবার মোক্ষ কি? জ্ঞান উদয় হইলেই দেখিবে কেহই বদ্ধ নহে। ধ্যান করিয়া কি ফল আর ধ্যান না করিয়াই বা কি ফল? মনুষ্য মৃতও নহে জীবিতও নহে; এই জগৎ কাহার নহে, কোন বস্তুই কাহার নহে এবং মনুষ্যও জগতের নহে, কোথাও কাহার কিছুই নাই। বায়ু যেমন পুষ্প সৌরভ গ্রহণ করে, জীবের সেই প্রকার আত্মায় অবস্থান করা উচিত। আত্ম দর্শন লাভ করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে হয় না, আপনার দেহ মধ্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। প্রণবের উচ্চারণ দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি ক্ষণকাল মধ্যেই সম্মুখবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যাবৎ আত্মার অজ্ঞান তাবৎ দেহ।

অজ্ঞানই পাপ বলিয়া কথিত হয়, ঐ পাপ বিচারবলে বিদূরিত হয়, অতএব পাপ মূলচ্ছেদকারী বিচারকে কখন পরিত্যাগ করিবে না। হরি নিখিল জীবের আত্মা, সেই আত্মায় যখন যাহা প্রতিবিম্বিত হয়, জীব তখনই তাহা দর্শন বা মনন করিয়া থাকে। তুমি এই জগৎকে মহা ভ্রম দর্শন করিতেছ, বাসনা বশতঃ তুমি ইহার তত্ত্ব দর্শনে অসমর্থ, ইহা চিত্ত ভাবাপন্ন আত্মারই রূপ। বীজে বৃক্ষের ন্যায় স্বীয় চিত্ত মধ্যে

সমস্তই বিদ্যমান আছে। যেমন অঙ্কুর হইতে বহির্গত হইয়া বৃক্ষ পত্রাদি সহিত বাহিরে স্বীয় ভাব ধারণ করে সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে; প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী আদি চিত্ত মধ্যেই অবস্থিত। যেমন ভূমিতল হইতে উৎপাটিত বৃক্ষের আর পত্রাদি ফুল ফল হয় না সেইরূপ বাসনা বিমুক্ত জীবেরও আর জন্ম হয় না। অগাধ জলে রত্ন পতিত হইলে প্রকাশমান সেই রত্নই অর্থাৎ সেই রত্নের প্রভাতেই সেই রত্ন দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, প্রশান্ত, একমাত্র ব্রহ্ম; এক ব্রহ্ম ব্যতীত কস্মিন্‌কালেও অপর কিছুরই সত্তা নাই। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মার দ্বারা বিবেকবলে আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে; যাহাতে আর জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই আত্মার উদ্ধার হইল।

সর্ব্বদা সঙ্গী এক মাত্র মনের সহিত বিচারে আত্মার উদ্ধার হয়। যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ হইলে স্বয়ং আলোক দর্শন হয় সেইরূপ কেবলমাত্র অহম্ভাব দূরীভূত হইলে আপনিই আত্মার দর্শন হয়। আমি আমার এই ভাব ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ করিলে আত্ম দর্শন হয়। পুরাতন রথ ভাঙ্গিয়া গেলে সারথির ক্ষতি কি? জলের সহিত পাষাণের সম্বন্ধ কি? পাষাণের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ কি? এই ভোগ বিষয়ের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বত থাকিলে তাহার সহিত সমুদ্রের সম্বন্ধ কি? সেইরূপ

পরমাত্মা ও সংসারে সম্বন্ধ কি? এই শরীর পরমাত্মার কে? যেমন কাষ্ঠ ও সলিলের পরস্পর আঘাতে উচ্চ জলের ছিটা উৎপন্ন হয় সেইরূপ দেহ ও আত্মার সংযোগে চিত্তবৃত্তি উদিত হয়। যেমন জলের নিকট কাষ্ঠ লইয়া গেলে জলে প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ প্রতিবিম্ব রূপে পরমাত্মায় এই শরার দর্শন হইতেছে। যেমন জলে বা দর্পণে নিপতিত বস্তুর প্রতিবিম্ব সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, আত্মাতেও শরীর এইরূপ জানিবে। যেমন কাষ্ঠ, পাষাণ, জল পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগ হইলে কাহার কোন প্রকার সুখ দুঃখ হয় না সেইরূপ দেহাদি আকারে পরিণত এই পঞ্চ ভূতের পরস্পর যোগ বা বিয়োগ হইলে কোন ক্ষতি হয় না। অজ্ঞান দুর হইলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। দর্পণ ও প্রতিবিম্বের যে সম্বন্ধ, দেহ ও আত্মার সেই সম্বন্ধ কিন্তু যেখানে দেহ সেইখানে আত্মা, যেমন যেখানে পুষ্প সেইখানে সৌরভ। সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের যেমন কোন সম্পর্ক নাই, সেইরূপ দেহাদির সহিত আত্মারও কোন সম্পর্ক নাই। অন্ধকারের সহিত আলোকের যেরূপ সম্বন্ধ হয় না সেইরূপ দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কোনরূপেই হয় না। শীতের সহিত উষ্ণের সম্বন্ধ হয় না, জড় দেহের সহিত চেতন আত্মার সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না। যেমন দাবানলে সমুদ্র আছে একথা অসম্ভব সেইরূপ দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অতি অসম্ভব। মৃত দেহে আত্মা থাকে না বলিয়া স্পন্দন হয়

না সুতরাং আত্মা ও দেহে সম্বন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রম। প্রাণাদি বায়ুর সম্পর্কেই দেহের স্পন্দনাদি হয় ও অন্নাদি বস্তুর সামর্থ্যে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং সেই আত্মার সহিত দেহের কোন সম্পর্কই নাই। কার্পাসে ও পাষাণে যেরূপ পার্থক্য, পরমাত্মায় ও শরীরে সেই পার্থক্য।

দেহ বায়ুবশে চলিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, উঠিতেছে, বসিতেছে এবং বায়ুর বলেই শব্দ করিতেছে। যেমন বাদ্য যন্ত্রে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ বাহির হয়, দেহের কণ্ঠাদি স্থান হইতে বায়ুর ক্রিয়াতেই এবং মন ও চিত্তের চালনাতে কবর্গ চবর্গ ইত্যাদি শব্দ সমুদয় নিঃসৃত হয়, আর চক্ষু স্পন্দন হেতু তারার স্পন্দন ও বায়ু হইতে সম্পন্ন হয়, এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়কার্য্য বায়ু দ্বারা চিত্তেরই হইতেছে। দর্পণ মধ্যে প্রতিবিম্বের মত চিত্তেই সমস্ত অনুভব হইয়া থাকে, এই চিত্তের আবাস শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বাসনাবলে যথায় গমন করে, তথায় আত্মা অনুভূত হইয়া থাকেন। যেমন দীপ যেখানে, আলোকও সেইখানে থাকে, সেইরূপ যেখানে চিত্ত সেই স্থানে আত্মা বিদ্যমান থাকেন। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইয়াও চিত্ত মধ্যে দৃষ্ট হন। যেমন ভূতলে নিম্নস্থান জলের আশ্রয় হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ আত্মার আধার হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রভা যেরূপ আলোক বিস্তার করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণ বিম্বিত আত্মা এই সত্যাসত্য জগৎ বিস্তার করিয়া থাকেন।

দেহ ক্ষয় হইলে দেহীর ধ্বংস হয় না কারণ ঐ আত্মা বাসনাপন্ন হইলে তখন বাসনায়, ও বাসনা বিহীন হইলে অন্তরীক্ষে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। জীবকে দেশ এবং কালে অন্তর্হিত হইয়া পুনঃপুনঃ দেহান্তর গ্রহণ করিতে হয়। বাসনাবলে এইরূপ জীবকে চিরদিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইয়া থাকে, জীবগণ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অতি জীর্ণ হইলেও, নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে, এবং নানা প্রকার দেহান্তর দ্বারা চিরদিন কষ্ট ভোগ করে। যেমন শিলাময় পুত্তলিকা সকল পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হয় না, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, ইহারাও পরস্পর স্নেহবান নহে। আত্মার আদি নাই বলিয়া জন্মবিহীন এবং জন্মশূন্য বলিয়াই ক্ষয় নাই।

এই দেহ মধ্যে যাবতীয় নাড়ীতে যে বায়ু উভয় পার্শ্বে চালিত হইয়া থাকে তাহাই প্রাণ সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যখন ভ্রূর মধ্যস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থান হয় তখনই পরমেশ্বরকে আত্ম-স্বরূপে অবগত হওয়া যায়, সেই সময় ঐ প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে। প্রাণ স্পন্দনকেই মনের রূপ বলিয়া জানিবে, উহা হইতেই সংসার ভ্রম উৎপন্ন হইতেছে, উহার উপশম হইলেই সংসার ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে। যাহাতে সমস্ত, যাহা হইতে সমস্ত, যিনি সমুদয় ও সমুদয় হইতে যিনি, অথচ যাহাতে কিছু নাই, যাহা হইতে কিছু নহে, যে পরমাত্মার সদৃশ দৃষ্টান্ত কিছুতেই হয় না তথাপি জ্ঞানী লোকে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারেন। তুমি সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া আত্মা হইতে

নিতান্ত পৃথক্‌ভাবে আছ। যেমন আকাশে কুসুম হয় না সেইরূপ আত্মারও কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আকাশে মৃত্তিকা সম্পর্কের ন্যায় আত্মায় কোন প্রকার কল্পনা স্পর্শ করিতে পারে না। অন্তরীক্ষের অবয়বের ন্যায় আত্মার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। অন্ধকার নাশক প্রভাসম্পন্ন দীপ দ্বারা যেমন বস্তুকে সম্পূর্ণ দেখা যায় সেইরূপ অন্ধকার নাশক বিচার দ্বারাও শীঘ্রই সেই বিমল ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সূর্য্যদেব প্রভা বিস্তার করিলে যাবৎ অন্ধকারের ধ্বংস হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে তাবৎ দুঃখেরই ধ্বংস হইয়া থাকে। সূর্য্য উদয় হইলে যেমন ভূতলে আলোক প্রকাশ হয় সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন কেহ নিজ মাংস আস্বাদন করিতে চাহে না সেইরূপ তিনি যাবৎ পদার্থেই অভিলাষ শূন্য হন। স্থির মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায়, যে ভগবান মনুষ্যকে মনের মত গঠন করিয়া তাঁহার নিজের সমস্ত শক্তি তাহাতে প্রদান করিয়া মনুষ্য শরীরের ভিতরে ও বাহিরে মাখামাখি হইয়া রহিয়াছেন।

সমাপ্ত।

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পুস্তকাবলী।

১। "মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ও তত্ত্বোপদেশ"— ২য় সংস্করণ, ৩০৪ পৃঃ সম্পূর্ণ। বিষয় স্চী দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন জীবন্মুক্ত স্বামীর উপদেশ জ্বলন্ত সত্য। বেদ বেদান্ত না পড়িয়া এই উপদেশানুসারে চলিলে মুক্তি করতলগত।

বিষয় ঃ—(১) ঈশ্বর। (২) সৃষ্টি। (৩) সংসার। (৪) গুরু ও শিষ্য। (৫) চিত্তশুদ্ধি। (৬) ধর্ম্ম। (৭) উপাসনা। (৮) পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম। (৯) আত্মবোধ। (১০) তন্ময়ত্ব। (১১) কয়েকটী সার কথা। (১২) তত্ত্বজ্ঞান।

এতদ্ব্যতীত মহাপুরুষের অভাবনীয় জীবন কথা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন।

২। আপ্তবাক্য মহাত্মা স্বামীর "মহাবাক্য রত্নাবলী ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ"।—আর্য্যধর্ম্ম ও দর্শন মন্থন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত। মহাপুরুষের স্বহস্ত লিখিত টীকা দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে এ সংস্করণে উহা সন্নিবেশিত হয় নাই। উহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই উহা জগতে প্রকাশিত হইবে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি মহাপুরুষের উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইবেন।

বিষয় ঃ—(১) সার্ধান্তিক বিধিবাক্য। (২) বন্ধ-মোক্ষবাক্য। (৩) অবিদ্বন্নিন্দাবাক্য। (৪) জগন্মিথ্যাবাক্য। (৫) উপদেশ বাক্য। (৬) জীবব্রহ্মবাক্য। (৭) মনন বাক্য। (৮) জীবন্মুক্তি বাক্য। (৯) স্বানুভূতি বাক্য। (১০) সমাধি বাক্য। (১১) নানালিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। (১২) পুংলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। (১৩) স্ত্রীলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য।

(১৪) নপুংসকলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। (১৫) আত্ম স্বরূপ বাক্য। (১৬) সর্ব্ব স্বরূপ বাক্য। (১৭) ব্রহ্ম স্বরূপ বাক্য। (১৮) অবশিষ্ট বাক্য। (১৯) ফল বাক্য। (২০) বিদেহ মুক্তি বাক্য।

৩। "তত্ত্ববোধ"—অবতার নিজের কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য যে শিষ্য মণ্ডলী রাখিয়া যান তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষায় অঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্বে ও ভাষার পূততায় ইহা যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা সুধী মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

বিষয় ঃ—(১) বিশ্ব বা জগৎ। (২) আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ। (৩) অহংতত্ত্ব। (৪) দর্শন। (৫) ত্রিবেণী। (৬) কাল (৭) ব্যোম বা আকাশ। (৮) শব্দ বা নাদ। (৯) বাক্য। (১০) প্রকৃতি। (১১) শক্তি। (১২) মায়া। (১৩) প্রাণ। (১৪) মন। (১৫) বুদ্ধি। (১৬) চিত্ত। (১৭) সারতত্ত্ব। (১৮) কুমার দেবব্রত। (১৯) সিদ্ধাশ্রম। (২০) ব্রহ্মচর্য্য। (২১) সন্ন্যাস ও আনন্দ। (২২) স্বাধীন ও পরাধীন। (২৩) সত্য। (২৪) চৌর্য্য। (২৫) শরীর। (২৬) ব্যাধি। (২৭) জরা। (২৮) মৃত্যু। (২৯) শ্মশান।

প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

১১০ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

☞ উক্ত ৩ খানি পুস্তক একত্র লইলে ডাক মাশুলাদি লাগিবে না।